দয়া ও ভালোবাসার অনন্য বিশ্ব নবী

[বাংলা]

رحمةٌ للعالمين : محمد رسول اللهﷺ

[اللغة البنغالية]

লেখক : আবু আব্দুর রাহমান

تأليف: أبو عبد الرحمن

অনুবাদ : কতিপয় বিশিষ্ট আলেম

ترجمة: جماعة من العلماء

সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

مراجعة : عبد الله شهيد عبد الرحمن

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। ক্ষমা প্রার্থনা করি তাঁরই কাছে। আমাদের প্রবৃত্তির খারাবি ও কর্মের অসাধুতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার ও তার সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর অসংখ্য রহমত বর্ষিত হোক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . (الأنبياء : ١٠٧)

“আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।” [১]

তিনি শুধু মানুষের জন্য নন। তিনি জিন ও মানব, মুমিন ও কাফের সকলের প্রতিই রহমত রূপে প্রেরিত হয়েছেন। বিশ্বের সকল জীব-জন্তুর জন্যও তিনি রহমত। সকলকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِّ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللهِّ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِّ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. (الأعراف : ١٥٨)

[১] সূরা আল-আম্বিয়া , আয়াত ১০৭

“তুমি ঘোষণা করো, ‘হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যে সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তার সেই বার্তা বাহক উম্মী নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। যিনি আল্লাহতে ও তাঁর কালামে বিশ্বাস রাখেন। তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায় তোমরা সরল-সঠিক পথের সন্ধান পাবে।”[1]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. (الأحقاف : ٢٩)

“আর যখন আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার (নবীর) নিকট উপস্থিত হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগল, ‘চুপ করে শোন।’ যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো, তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে।”[2]

তিনি জগৎসমূহের জন্য রহমত। সকল সৃষ্টি জীবের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিরাট দান। ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. (آل عمران : ١٦٤)

[1] সূরা আল-আরাফ : ১৫৮
[2] সূরা আল-আহকাফ : ২৯

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনায় ও তাদের পবিত্র করে। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিখায়। যদিও তারা ইতিপূর্বে পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে ছিল।”[1]

আবু নদরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়ামে তাশরীকে যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবা শুনেছে তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা এক। অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব শুধুই তাকওয়া ভিত্তিক।’[2]

মানুষের মধ্যে তাকওয়া ব্যতীত পরস্পরে কোন পার্থক্য নেই। এ নীতির পক্ষে এ বাণী এক স্পষ্ট প্রমাণ। তাকওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ যত অগ্রগামী হবে, সে আল্লাহর কাছে ততই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। বর্ণ ও গোত্রের এ ক্ষেত্রে আদৌ কোন মূল্য নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সকল দিক থেকে তাকে করেছেন শ্রেষ্ঠ। তার নান্দনিক চরিত্রমাধুরি দেখে কত মানুষই না ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। সুন্দর চরিত্রের এমন কোন দিক নেই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বে পূর্ণতা পায়নি। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে ঘিরে সুশোভিত হয়েছে সকল প্রকার নান্দনিক গুণাবলি। দান, বদান্যতা, ভদ্রতা, ক্ষমা, মহানুভবতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, নম্রতা, সবর, বন্ধুত্বসুলভ আচরণ, বিনয়,

[1] সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪
[2] মুসনাদ আহমাদ, ২২৬/১২

ন্যায়পরায়ণতা, দয়া-করুণা, অনুগ্রহ, সাহসিকতা, বীরত্বসহ সকল দিক থেকে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণতার অনন্য দৃষ্টান্ত।

সীরাত পাঠকারী ব্যক্তিমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, সকল অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের ধারক, বাহক। দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণের পশ্চাৎগত কারণ হল, প্রথমত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফজল ও করম, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র মাধুর্যের আকর্ষণ। কত মানুষ যে তার চরিত্র দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার হিসাব মেলানো দুষ্কর বৈকি।

দেখুন, সুমামা বিন উসাল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষমার চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি যে বক্তব্য দিলেন তা ছিল, 'হে রাসূল! আল্লাহর শপথ! ভূ-পৃষ্ঠে আপনার চেহারার চেয়ে অপছন্দনীয় চেহারা আমার কাছে অন্য আরেকটি ছিল না। আর এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সমধিক প্রিয়। আপনার ধর্মের চেয়ে অপছন্দনীয় ধর্ম আমার নজরে ছিল না। আর এখন আপনার ধর্মই আমার কাছে সকল ধর্মের চেয়ে প্রিয়তম। ভূ-পৃষ্ঠে আপনার দেশ ছিল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। আর এখন সকল দেশের চেয়ে আপনার দেশ আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[১]

শুনুন সেই বেদুইনের বক্তব্য, যে মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষমায় মুগ্ধ হয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদকে অনুগ্রহ করুন, আমাদের ব্যতীত অন্য কারোর প্রতি আপনি অনুগ্রহ করবেন না।' তার এ বক্তব্য শুনেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন ধমক দিলেন না, কটু কথা বললেন না। একজন স্নেহময়ী কল্যাণকামী শিক্ষক হিসেবে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি ব্যাপক-বিস্তৃত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে।'[২]

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৩৭২, সহীহ মুসলিম ১৭৬৪
[২] সহীহ আল - বুখারী ৬০১০

অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হল ব্যাপক-বিস্তৃত। যা সকল মানুষ তো বটেই, সকল সৃষ্টি জীবের উপর বর্ষিত হয়। আর তুমি প্রার্থনায় তা শুধু আমার ও তোমার মধ্যে সীমিত করে দিলে।

মুআবিয়া ইবনুল হাকামের বিষয়টি দেখুন। তাকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বে-নজীর ভাল বাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। মুআবিয়া নিজেই বলেন, 'আমার পিতা - মাতা তার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার-মত শিক্ষক কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম! (আমি অন্যায় করা সত্ত্বেও) তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, প্রহার করলেন না, গালি দিলেন না।'[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বকরির বিশাল এক পাল দান করে দিলেন। সে তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে দান করেন যে, দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবনে কখনো দারিদ্রতাকে ভয় করবে না।'[২]

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার প্রতি তাকিয়ে দেখুন, সে ছিল কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের শীর্ষ স্থানীয় নেতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক'শ বকরী দান করলেন। এরপর আবার এক'শ বকরী দিলেন। এরপরে আবারো এক'শ। তখন সাফওয়ান বললেন, 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ আমাকে যা দিলেন কেউ আমাকে এত পরিমাণ কখনো দান করেনি। তিনি ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। তিনি আমাকে দান করতেই থাকলেন। ফলে তিনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন।' সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বদান্যতা।[৩]

[১] সহীহ মুসলিম ৫৩৭)
[২] সহীহ মুসলিম ২৩১২
[৩] সহীহ মুসলিম ২৩১৩

আরেকজন মুশরিক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য তরবারি উত্তোলন করেছিল। কিন্তু হত্যা করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[১] পরবর্তীতে সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল, ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিল। তার দাওয়াতে তার গোত্রের বহু লোক ইসলামে প্রবেশ করল।[২]

বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সাল্লামের প্রতি লক্ষ করুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করলে তিনি তার সাথে দেখা করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি তাকে দেখার জন্য লোকদের সাথে এলাম। যখন আমি তার চেহারার দিকে তাকালাম, আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। প্রথম যে কথাটি আমি তার মুখ থেকে শুনলাম তা হল, 'হে মানবমণ্ডলী! সালামের প্রচলন করো, মানুষকে খাবার দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো, আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর। তাহলে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৩]

যায়েদ ইবনে সাইয়া নামক এক ইহুদী পণ্ডিতের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য এল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর উমর রা. কে নির্দেশ দিলেন তাকে কিছু উপহার দেয়ার জন্য। যায়েদ বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারার দিকে তাকিয়েই নবুওয়তের আলামতসমূহ দেখতে পেলাম। হে উমার! তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, 'আমি প্রতিপালক

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৯১০, সহীহ মুসলিম ৮৪৩
[২] ফাতহুল বারী
[৩] তিরমীজি ২৫৮৫, ইবনে মাজা ৩২৫১

হিসেবে আল্লাহর প্রতি, ধর্ম হিসাবে ইসলামের প্রতি ও নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি রাজী হয়ে গেলাম।'[১]

অন্য এক ইহুদীর কথা শুনুন, যে মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছিল, যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন তার কসম, আমরা আমাদের গ্রন্থে আপনার গুণাবলি পেয়েছি। দেখেছি আপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ। তাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর আপনি আল্লাহর রাসূল।'[২]

ইথিওপিয়ার সে সময়ের খ্রিস্টান সম্রাট নাজ্জাশীর কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করতেই হয়। যখন সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধির কাছে তার দাওয়াত ও ঈসা আ. সম্পর্কে তার মন্তব্য শুনলেন, যে তিনি বলেছেন, 'ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল', তখন নাজ্জাশী বলে উঠল, তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি, আর অভিবাদন জানাচ্ছি তাকেও যার পক্ষ থেকে তোমরা এসেছ। শুনে রাখ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ অবশ্যই আল্লাহর রাসূল, যার সম্পর্কে ঈসা আ. আমাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আমার যদি বাদশাহীর দায়িত্ব না থাকতো তাহলে আমি তার কাছে যেয়ে তার জুতা চুম্বন করতাম।'

রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবু সুফিয়ান যখন তার দরবারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলল, 'সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। সে এক আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়। তার সাথে শিরক করতে নিষেধ করে। প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করে। সালাত আদায় করতে বলে। সততা অবলম্বন করতে বলে। শালীনতার নির্দেশ দেয়।' তখন রোমান সম্রাট আবু সুফিয়ানকে বলল, 'তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয়, তাহলে সে তো আমার রাজ্যের মালিক হয়ে যাবে। আমি জানতাম তার আবির্ভাব হবে, কিন্তু সে যে তোমাদের জাতি থেকে হবে, তা আমার ধারণা ছিল না। আমি যদি তার কাছে যেতে পারতাম, তবে কষ্ট করে হলেও তার

[১] আল-ইসাবা ফি তামীযিস সাহাবা
[২] আহমাদ ৪১১/৫

সাথে সাক্ষাৎ করতাম । আমি যদি তার কাছে থাকতাম তাহলে তার দু পা ধৌত করে দিতাম ।’[১]

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

“তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী”[২]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন, ‘সুন্দর চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে ।’[৩]

আয়েশা রা. কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘তার চরিত্র হল আল-কুরআন ।’[৪]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ইসলামের একটি মূল বিষয় । সকল মুসলিম নর-নারীকে তার সম্পর্কে জানতে হবে । কবরেও তার পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে । এ দিকে লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ে সংক্ষেপে বইটি লিখেছি । বইটির নাম দিয়েছি : রাহমাতুললিল আলামীন : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এতে আমি আলোচনা করেছি তার বংশ পরিচয়, শৈশব, চরিত্র, শারীরিক ও চারিত্রিক গুণাবলি, তার মুজিযা, রেসালাতের সার্বজনীনতা, উম্মতের জন্য তার উপদেশ, তার প্রতি উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

আমি এ বইটিকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলিতে বিন্যস্ত করেছি

[১] সহীহ আল - বুখারী-৭
[২] সূরা আল-কলম : আয়াত ৪
[৩] বাইহাকী ১৯২/১০, আহমদ ৩৮১/২
[৪] সহীহ মুসলিম ৭৪৬

আল্লাহর তাআলার কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন এ অতি সামান্য আমলে বরকত দান করেন। তার সন্তুষ্টির জন্যই কাজটা করার তাওফীক দান করেন। আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর এ দ্বারা যেন উপকৃত হতে পারি। তিনিই উত্তম কর্ম-বিধায়ক, তার কাছেই সকল প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা তার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি ও তার সাহাবা এবং তাদের অনুসারীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত সালাত-রহমত বর্ষণ করুন।

আবু আব্দুর রহমান

২৯-০১-১৪২৭ হিজরী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহানবীর বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ

এখানে তার পিতৃপুরুষগণের নাম উল্লেখ করা হল। আরবী ভাষায় 'বিন' শব্দের অর্থ ছেলে। বিন শব্দের পূর্বে যার নাম তিনি হলেন ছেলে। বিন শব্দের পরে যার নাম তিনি হলেন পিতা। এ নিয়মেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ-পরিক্রমা উল্লেখ করা হল।

তিনি হলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কাআব বিন লুআই বিন গালেব বিন ফেহার বিন মালেক বিন নদর বিন কেনানাহ বিন খুযাইমা বিন মুদরেকা বিন ইলিয়াস বিন মুদার বিন নাযার বিন মুইদ বিন আদনান।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বংশ পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্য থেকে কেনানাহকে নির্বাচন করেছেন। কেনানাহ থেকে নির্বাচন করেছেন কুরাইশকে। কুরাইশ থেকে নির্বাচন করেছেন বনু হাশেমকে, আর বনু হাশেম থেকে নির্বাচন করেছেন আমাকে।'[২]

রাসূলুল্লাহ কুরাইশ বংশের, কুরাইশ হল আরবদের অন্তর্ভুক্ত। আর আরব হল নবী ইবরাহীম আ. ছেলে ইসমাঈল আ. এর বংশধর।[৩]

তিনি মক্কায় প্রচলিত হস্তী সনের রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন ৫৭১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪] তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। নবুওতের পূর্বে চল্লিশ বছর আর নবুওত লাভের পর তেইশ বছর, এই তেষট্টি বছর সময়কাল তিনি পৃথিবীতে কাটান। তিনি তেইশ বছর নবুওয়ত ও রেসালাতের দায়িত্ব পালন করেন। সূরা আল-আলাক নাযিল

---

[১] সহীহ আল - বুখারী, মাবআসি ন্নবী অধ্যায়

[২] সহীহ মুসলিম -২২৭৯

[৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, সীরাতে ইবনে হিশাম, যাদুল মাআদ

[৪] দেখুন আর-রহীকুল মাখতুম

করে তাকে নবুওয়তের দায়িত্বে ভূষিত করা হয়, ও সূরা মুদ্দাসসির নাযিলের মাধ্যমে তাকে রেসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মক্কা তার জন্মভূমি। মদীনা হিজরতের স্থল। শিরক থেকে সতর্ক করা ও তাওহীদের দাওয়াতের উদ্দেশে তাকে প্রেরণ করা হয়। প্রথম দশ বছর তিনি একত্ববাদের দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করেন। দশ বছর এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হয়। এ সময় থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। মক্কাতে তিনি তিন বছরকাল নামাজ আদায় করেছেন। মোট তেরো বছর মক্কায় কাটান। এরপর মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ আসে। হিজরত পরবর্তী সময়ে মদীনায় কর্তৃত্ববান হলে ইসলামী শরীয়তের অন্যান্য বিধান তার উপর অবতীর্ণ হতে শুরু করে। যেমন, যাকাত, সিয়াম, হজ, জিহাদ, আজান, সৎকাজের আদেশ, অন্যায় কাজ হতে বারণ। মদীনা-জীবনের দশ বছর কাটানোর পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তার প্রচারিত দীন থেকে গেছে অজর-অক্ষয় রূপে, থাকবে অবিকৃত আকারে চিরকাল। মঙ্গল ও কল্যাণের সকল বিষয়ে তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যা কিছু অনিষ্টকর, অশিষ্ট, অন্যায়-কর্ম ও ক্ষতির কারণ সেসব থেকে তিনি সতর্ক করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তার তিরোধানের মাধ্যমের নবুওত ও রেসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তার পরে আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করবেন না, আগমনের প্রয়োজনও হবে না। আল্লাহ তাআলা তাকে সকল মানুষের কাছেই পাঠিয়েছেন। তিনি সকল মানব ও জিনের জন্য তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে না তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[১]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষণীয় বিষয়:

১- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বংশ পরিচয়, চারিত্রিক গুনমাধুরি, ও উত্তম আদর্শের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি অতীত ও বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক

[১] ফাতহুল বারী ২২৪/৭

আলোচিত ব্যক্তিত্ব। সকল নবীর চেয়ে তার অনুসারীদের সংখ্যা বেশি হবে কেয়ামত দিবসে।

২- প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি নিন্দনীয় বেদআত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনে কখনো এ ধরনের উৎসব পালন করেননি, তার সাহাবায়ে কেরামগণও কখনো মীলাদুন্নবী পালন করেননি, তাদের পর অনুসরণীয় কোন যুগে এর আমল দেখা যায় না।

অপরদিকে রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে তার জন্ম হয়েছে বলে ধরে নেয়া ঠিক নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ ধর্মে নতুন কিছুর প্রচলন করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।'[১]

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার উপর আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।'

৩- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়িত্ব কর্তব্য ছিল, মানুষকে তাওহীদের পথে আহ্বান করা ও শিরকের অন্ধকার থেকে মানুষকে বের করে তাওহীদের আলোতে নিয়ে আসা। পাপাচারের অন্ধকার পথ থেকে আল্লাহর আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসা, অজ্ঞতা ও মুর্খতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞান ও শিক্ষার দিকে নিয়ে আসা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শৈশব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি ছিলেন নিঃস্ব। মহান আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করলেন। তার পিতা আব্দুল্লাহ যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তিনি তার মায়ের গর্ভে। আবু লাহাবের দাসী

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৬৯৭

সুআইবা শুরুতে তাকে কয়েকদিন দুধ পান করিয়েছেন।[১] এরপর হালীমা সাদীয়া তাকে দুধ পান করান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় প্রায় চার বছর বনু সাআদ গোত্রে কাটিয়েছেন। তখন তার বক্ষ বিদারণ করা হয়। সাহাবী আনাস রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথে খেলছিলেন। তখন জিবরীল এসে তাকে নিয়ে যান। তার হৃদপিন্ড বের করে সেখান থেকে একটি রক্তের চাকা ফেলে দেন। এ সময় জিবরীল বলেন, 'এটি হল শয়তানের অংশ।' হৃৎপিণ্ড বের করে তা একটি স্বর্ণের তশতরিতে ধৌত করলেন।[২] ধৌত করলেন যমযমের পানি দিয়ে। এরপর তা যথাস্থানে স্থাপন করলেন ও তাকে তার জায়গায় রেখে দিলেন। অপরদিকে তার সাথিরা দৌড়ে এসে মা হালীমাকে খবর দিল যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে। সকলে তার দিকে ছুটে গেল। তারা তাকে গায়ের রং পরিবর্তিত অবস্থায় পেল।[৩]

আনাস রা. বলেন আমি তার বুকে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি। এ ভয়াবহ ঘটনার পর হালীমা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাকে তার মাতা আমেনা বিনতে ওহাবের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

মা আমেনা তাকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য সন্তানকে তার মামাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। মদীনার কাজ শেষে তিনি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স মাত্র ছয় বছর তিন মাস দশ দিন।[৪]

মায়ের ইন্তেকালের পর তার দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। তার বয়স যখন আট বছর তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুকালে তিনি আবু তালেবকে অসীয়ত করে গেলেন তার লালন

[১] সহীহ আল - বুখারী- ১২৪/৯
[২] সহীহ আল বুখারী-৪৬০/১
[৩] শরহু সহীহ মুসলিম : নববী
[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

পালনের দায়িত্ব নিতে। আবু তালেব ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতা আব্দুল্লাহর সহোদর ভাই।

আবু তালেব শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আজীবন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর-যত্নে, স্নেহ-মমতায় আগলে রেখে লালন পালন করে গেলেন। মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের ভাল বাসায় তিনি ছিলেন অটল, অবিচল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআতে তার শাস্তি হালকা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'সে (আবু তালেব) এখন অগ্নির কিনারায় রয়েছে। আমি যদি না থাকতাম তাহলে তার অবস্থান হত জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কেয়ামতের দিন আমার শাফাআত তার কাজে লাগবে। তারপরেও তাকে রাখা হবে অগ্নির কিনারায়। অগ্নি তার পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করবে। এর ফলে তার মগজ ফুটতে থাকবে।'[১]

তিনি তার চাচা আবু তালেবের সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া সফর করেন। তার বয়স তখন বারো বছর। নিঃসন্দেহে এটা তার প্রতি আবু তালেবের মমতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি মনে করেছিলেন, তাকে যদি মক্কায় রেখে যাই তাহলে কে তাকে আদর-যত্ন করবে। এ সফরে আবু তালেব ও তার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনেক অলৌকিক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণে তার প্রতি আবু তালেবের আদর-যত্ন আরো বেড়ে যায়।

আবু মূছা আল-আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালেব তাকে নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাদের কাফেলায় ছিল কুরাইশদের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি। যখন তারা খ্রিস্ট ধর্মের এক যাজকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন সে নিজেই কাফেলার কাছে এলেন। তবে ইতিপূর্বে তিনি এভাবে কখনো কোন কাফেলার কাছে আসেননি। কোন কাফেলার প্রতি নজর দিয়ে দেখেননি। তাকে দেখে গোটা কাফেলা দাঁড়িয়ে গেল। তিনি সকলকে দেখতে লাগলেন।

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৮৮৩, ৩৮৮৪, ৩৮৮৫, সহীহ মুসলিম ২০৯

যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন, তখন তার হাত ধরলেন। বললেন, এ তো সকল বিশ্ববাসীর নেতা, জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। কুরাইশের প্রবীণ লোকগুলো বলল, 'আপনি তা জানলেন কীভাবে?' তিনি বললেন, 'তোমরা যখন পর্বতের ঘাঁটিগুলো অতিক্রম করেছিলে আমি দেখতে পেলাম, প্রতিটি গাছ ও পাথর তাকে সেজদা করছে। আর এরা কোন নবী ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করে না। আমি তার পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তে সীল দেখে চিনতে পেরেছি। যা দেখতে আপেলের মত . . . . ।' (আল-হাদীস)

এ বর্ণনায় আরো এসেছে, সফরকালে মেঘ তাকে ছায়া দিত। আর বৃক্ষসমূহ তাকে ছায়া দিতে ঝুঁকে পড়ত।

খ্রিস্টান এ ধর্ম যাজক আবু তালেবকে বললেন, 'মক্কায় ফিরে যাওয়ার পথে ইহুদীরা যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে না ফেলে, কেননা ইহুদীরা দেখলে তার ক্ষতি করবে।' তাই আবু তালেব তাকে মক্কাতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এরপর খাদিজা বিনতে খুআইলিদ নিজ কর্মচারী মাইসারার সাথে তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য তাকে সিরিয়ায় পাঠালেন। এ ব্যবসায় খাদিজা খুবই লাভবান হলেন। মাইসারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা কিছু দেখেছে তার সবই খাদিজাকে খুলে বলল। খাদিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করলেন। তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আর খাদিজার বয়স চল্লিশ ।[১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শৈশব থেকেই তাকে সকল প্রকার জাহেলী অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি কখনো কোন প্রতিমাকে সম্মান দেখাননি। কাফেরদের কোন উৎসবে উপস্থিত হননি। উপস্থিত হতে বললেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহই তাকে রক্ষা করেছেন।

[১] যাদুল মাআদ

তিনি কখনো মদ্য-পান করেননি। কখনো কোন অশ্লীল কাজ করেননি। কখনো আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেননি। কোন অসার মজলিসে অংশ গ্রহণ করেননি। তার সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে সকল অন্যায় ও অপকর্ম করতো, তিনি তা থেকে সর্বদা দূরে থাকতেন। তিনি এমন সমাজে লালিত পালিত হয়েছিলেন যেখানে পাপাচার, অন্যায় অপকর্ম আর অশ্লীলতার ছিল ছড়াছড়ি। কোন অপকর্মটি ছিল না সে সমাজে? আল্লাহর সাথে শিরক, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে প্রার্থনা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা, জুলুম-অত্যাচার, জুয়া, মদ্য-পান, ডাকাতি, পতিতাবৃত্তি, গণব্যভিচার, ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যভিচার, জোর-জবরদস্তি করে বিবাহ, রক্তপাত, মানহানী, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস সবই ছিল সে সমাজে। ইসলাম-পূর্ব এ সমাজে এগুলো চলতো অবাধে। কেহ এসবের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করত না। কোন দল এর বিরুদ্ধে লড়াই করত না। এর সাথে সাথে তারা দারিদ্রতার ভয়ে কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দিত। কন্যা সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য লজ্জা ও অপমানের বিষয় মনে করত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল বিষয়ে কখনো কোনভাবে জড়িত হননি। তার প্রভু তাকে শিষ্টা-চার শিক্ষা দিয়েছেন, তার শিষ্টা-চার উত্তম হয়েছে। তার সম্প্রদায় তাকে ভালভাবে চিনত বলেই তাকে উপাধি দিয়েছিল 'আল-আমীন' বা সত্যবাদী।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরাইশগন কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণে হাত দিল। যখন হাজারে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপনের সময় আসল, তখন তাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। কোন গোত্রের লোকেরা এটি যথাস্থানে স্থাপন করার সৌভাগ্য ও কৃতিত্ব অর্জন করবে তা-ই ছিল বিবাদের মূল কারণ। এ নিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধার মত অবস্থা সৃষ্টি হল। তারা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল; যে ভোর বেলায় সেখানে প্রথম প্রবেশ করবে সে এ বিষয়ে ফয়সালা দেবে। দেখা গেল ভোর বেলায় সবচেয়ে প্রথমে যিনি আসলেন তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকলে খুশি হল। বলে

উঠল, 'এসেছে আল-আমীন।' তাকে সকলেই বিচারক হিসাবে মেনে নিল। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ সেখানে রেখে বললেন, 'প্রত্যেক গোত্রের একজন করে চাদরের কিনারা ধরে হাজরে আসওয়াদ বহন করে যথাস্থানে নিয়ে যাবে।' সকলে তাই করল। এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রাখলেন। বিবাদ মিটে গেল। সকলেই খুশি হল।

এরপর আল্লাহ তার কাছে নির্জনতা অবলম্বন প্রিয় করে দিলেন। তিনি আল্লাহর ইবাদতের জন্য মানুষদের থেকে অনেক দূরে চলে যেতেন। হেরা পর্বতের এক গুহায় যেয়ে তিনি ইবরাহীমি ধর্ম অনুসারে ইবাদত-বন্দেগী করতে লাগলেন। এমনি করে যখন তার বয়স চল্লিশ বছরে পৌঁছল তখন তাকে আল্লাহ নবুওয়ত দানে ধন্য করলেন। এতে কারো দ্বিমত নেই যে, সোমবার দিন তাকে নবুওয়ত দেয়া হয়েছিল। অধিকাংশের মতে মাসটি ছিল হস্তী বর্ষের একচল্লিশ সনের রবিউল আউয়াল মাস।[১]

জিবরীল ফেরেশতা হেরা গুহায় আসলেন। তিনি তাকে বললেন, 'পাঠ কর!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' তিনি আবার বললেন, 'পাঠ কর!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' এরপর জিবরীল তাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। তিনি আবার তাকে বললেন, 'পাঠ কর!' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' তিনি বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

[১] যাদুল মাআদ

"পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এক রক্তপিণ্ড থেকে। পড় মহান প্রভুর নামে, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জান তো না।"[১]

এ সূরার মাধ্যমেই তিনি নবী হিসেবে দায়িত্ব পেলেন।

তিনি এ ঘটনার পর খাদিজার কাছে গেলেন। তিনি ভীষণ ভয় পেলেন। খাদিজাকে বললেন 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও!' তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। তার ভয় যখন কিছুটা কেটে গেল তখন খাদিজাকে সকল ঘটনা শুনালেন। খাদিজা ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে কখনো অসম্মান করবেন না। আপনিতো আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন। অসহায়কে সাহায্য করেন। সম্বলহীনকে দান করেন। অতিথিকে মেহমানদারী করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে সহযোগিতা করেন।'[২]

এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আল-মুদ্দাস্সির নাযিল করার মাধ্যমে তাকে রাসূল হিসাবে দায়িত্ব দিলেন। আল্লাহ বললেন,

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

"হে কম্বল আবৃতকারী! উঠে দাঁড়াও। সতর্ক কর। তোমার প্রতিপালকের মহত্ত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাক পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা বর্জন কর।"[৩]

এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে ওহী আসতে শুরু করল। এ সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। অগ্রবর্তীগণ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলেন। যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন তিনি হলেন খাদিজা রা.,

[১] সূরা আল-আলাক- ১-৫
[২] সহীহ আল - বুখারী -৩, সহীহ মুসলিম ১৬০
[৩] সূরা আল-মুদ্দাসসির : ১-৫

তারপরে ইসলাম গ্রহণ করেন যায়েদ বিন হারেসা, এরপর আবু বকর রা. অতঃপর এক জনের পর একজন করে মক্কার অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে আদেশ করলেন। তিনি বললেন :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

"তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর। এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সে সকল মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হও। তারা যদি তোমার অবাধ্য হয় তবে তুমি বলো, তোমরা যা কর তা থেকে আমি মুক্ত।"[১]

তিনি তাদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গোত্রের নাম ধরে ধরে সকলকে একত্রিত করলেন। যখন সকলে জমায়েত হল, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আমি যদি বলি যে এ উপত্যকার পিছনে একটি বাহিনী আছে যা তোমাদের উপর হামলা করবে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

সকলে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, কারণ আমরা তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি।'

তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের একটি কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি।' [২]

কুরাইশ নেতারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হল। কিন্তু তারা কেহ তাকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে পারল না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. (الشعراء : ٣٣)

[১] সূরা আশ-শুআরা : ২১৪-২১৬

[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৯৭১, সহীহ মুসলিম ১৯৪

"তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এ যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।"[১]

তারা তাকে এমন কোন গালি দেয়নি যাতে বুঝে আসে তিনি বিগত চল্লিশ বছরে খারাপ ছিলেন। এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ায় তারা তাকে 'পাগল' বলেছে, 'জাদুকর' বলেছে, 'কবি' বলেছে। সকলে জানে এগুলো এমন বিশেষণ যা স্বভাবগত নয় বা চরিত্রের অংশ নয়। তার দাওয়াতের কারণে ছেলে-পিতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে।

তিনি বিভিন্ন মৌসুম বা পর্বকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে দাওয়াতি কর্মসূচী চালিয়েছেন। বাজারে দাওয়াত দিয়েছেন। তায়েফে গিয়েছেন দাওয়াত দিতে। তায়েফ থেকে ফেরার পথে জিনদের একটি দল তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। দাওয়াত দিতে যেয়ে তিনি নির্যাতন-নিপীড়ন, দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। ধৈর্য ধারণ করেছেন। এরপর আল্লাহ তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়েছেন। মিরাজে নিয়েছেন। মিরাজ গমনের পূর্বে জিবরীল এসে তার বক্ষ বিদারণ করেছেন। যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজর বলেন, 'জীবনে তিনবার তার বক্ষ বিদারণ করা হয়েছে। প্রথমবার ছোট বয়সে, দ্বিতীয়বার নবুওয়তের সময়, তৃতীয়বার ইসরা ও মিরাজে গমনের প্রাককালে।'[২]

মিরাজে তিনি সপ্তম আকাশে গমন করেন। সেখানে নামাজ ফরজ করা হয়। নবীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি দু' রাকাআত নামাজও আদায় করেছেন। সকাল হওয়ার পূর্বেই তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। তিনি তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। হিজরতে পূর্বে মক্কায় তিনি তিন বছরকাল নামাজ আদায় করেন। যখন কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতন বেড়ে যায়, এবং আল্লাহর একত্ববাদ-কেন্দ্রিক তেরো বছরের দাওয়াতী জীবন শেষ হয়, তখন তিনি মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার অনুমতি পান। মদীনা-

[১] সূরা আশ-শুআরা :৩৩

[২] ফতহুল বারী

জীবনের দশ বছর সময়কালে তার কাছে ইসলামী শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারিত্রিক ও শারীরিক গুণাবলি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন স্বভাব ও দৈহিক অবয়ব, উভয় দিক থেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন নম্র, বিনয়ী, সৌরভমন্ডিত, বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে পরিপূর্ণ, এবং আচার-আচরণের বিবেচনায় সুন্দরতম মানুষ। তিনি ছিলেন আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। আল্লাহ-ভীতি অবলম্বনে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে।

সাহসিকতায় তিনি ছিলেন সবার থেকে নির্ভীক। মহানুভবতায় শ্রেষ্ঠতম। দানশীলতায় সকলের উর্ধ্বে। ন্যায় বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ। আচার-আচরণে উদারতম। তিনি ছিলেন আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী চর্চায় অধিক পরিশ্রমী। যুলুম-নির্যাতন বরদাশ্‌ত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল। সৃষ্টি-জীবের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াশীল। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জার অধিকারী। ব্যক্তিগত ইস্যুতে তিনি কখনো প্রতিশোধ নিতেন না, কাউকে শাস্তি দিতেন না, কারো প্রতি রাগ করতেন না। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে তিনি রাগান্বিত হতেন, প্রতিশোধ নিতেন। তিনি যখন আল্লাহর স্বার্থে রাগ করতেন, তখন তার ক্রোধের সাথে অন্য কারো ক্রোধের তুলনা হত না। অধিকার ও সম্মানের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, নিকট-পর, স্ব-বংশীয়-পরবংশীয় সকলে তার কাছে ছিল সম-মর্যাদার। কোন খাবার অপছন্দ হলেও তিনি তাতে খুঁত ধরতেন না। খাবার অপছন্দ হলে তিনি তা ত্যাগ করতেন। হালাল খাদ্য যা পেতেন, খেতেন। তিনি উপহার গ্রহণ করতেন। উপহারের বিনিময়ে উপহার দিতেন। নিজ বা পরিবারের জন্য দান-ছদকা গ্রহণ করতেন না। জুতা ও পোশাক নিজেই পরিষ্কার করতেন। পরিবার-পরিজনকে তাদের কাজ-কর্মে সাহায্য করতেন। তিনি বকরীর দুধ দোহন করতেন। নিজের কাজ

নিজে করতেন। তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী ছিলেন। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্র সকলের আহ্বানেই তিনি সাড়া দিতেন। তিনি দরিদ্রদের ভাল বাসতেন। রোগ-শোকে তাদের সেবা করতেন, খোঁজ-খবর নিতেন। তাদের মৃতদের দাফন-কাফনে অংশ নিতেন। দারিদ্রতার কারণে তিনি কাউকে অবজ্ঞা করতেন না। রাজত্বের কারণে কাউকে অত্যধিক সম্মান দিতেন না। তিনি ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট সবকিছুর পিঠে আরোহণ করতেন। আরোহণের সময় সাথে অন্যকে বসাতেন। এ সকল বিষয়ে তিনি নিজের মান-সম্মানের দিকে তাকিয়ে কখনো সংকোচ বোধ করতেন না। তিনি রুপার আংটি পরিধান করতেন ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুলে। কখনো কখনো বাম হাতেও পরিধান করতেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বাঁধতেন। অবশ্য পরে আল্লাহ তাকে পার্থিব সকল সম্পদ দান করেন। কিন্তু তিনি আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক দীর্ঘকায় ছিলেন না আবার বেটেও ছিলেন না। তিনি অতি সাদা ছিলেন না আবার বাদামি ছিলেন না। তার চুলগুলো খুব কোঁকড়ানো ছিল না আবার একে বারে সোজাও ছিল না। তার পদ-যুগল ছিল মাংসল, চেহারা ছিল সুন্দর।[১] তার চেহারা ছিল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়।[২] তার বক্ষ ছিল প্রশস্ত। কানের লতি অবধি দীর্ঘ কেশমালার অধিকারী ছিলেন তিনি, কখনো কখনো তা বৃদ্ধি পেয়ে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেত আবার কখনো তা থাকত কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত। দাড়ি ছিল ঘন। হাত ও পায়ের অঙ্গুলি ছিল পুষ্ট। মাথা ছিল বড় আকারের। বুকের সরু কেশমালা ছিল পাতলা। যখন হাঁটতেন সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। তার মুখমণ্ডল ছিল বড়। চোখের পলক ছিল লম্বা। তার চেহারা ছিল খুবই সুন্দর। পিছনে দু চুটের মধ্য খানে ছিল নবুওয়তের সীল-মোহর। তা ছিল কবুতরের ডিম আকৃতির লাল রংয়ের। তিনি মাথার কেশ বিন্যাস করতেন, তেল ব্যবহার করতেন।

---

[১] সহীহ আল - বুখারী-৫৯০৮

[২] সহীহ মুসলিম -২৩৪০

দাড়ি অকর্তিত অবস্থায় রেখে দিতেন। দাড়িতে চিরুনি ব্যবহার করতেন।

তার দাড়ি ও চুলে কম সংখ্যক সাদা কেশ ছিল। যখন তেল ব্যবহার করতেন তখন এ সাদা চুলগুলো দেখা যেত না। তিনি পাগড়ি ব্যবহার করতেন ও লুঙ্গি পড়তেন। তিনি সুগন্ধি ভাল বাসতেন। তিনি বলতেন, 'পুরুষদের জন্য উত্তম সুগন্ধি হল যার গন্ধ পাওয়া যায়, রং দেখা যায় না। আর মেয়েদের জন্য উত্তম সুগন্ধি হল যার রং প্রকাশিত হয় গন্ধ গোপন থাকে।'[১]

তিনি ঈদের সময় সাজ-সজ্জা অবলম্বন করতেন। কোন মেহমান আসলে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময়ও সাজ সজ্জা গ্রহণ করতেন। তিনি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তার সম্মানে কেউ দাঁড়াবে এটা তিনি পছন্দ করতেন না। সাহাবায়ে কেরাম তার সম্মানে কখনো দাঁড়াতেন না। তারা রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপছন্দের কথা জানতেন।[২]

তিনি সর্বদা মেছওয়াক করা পছন্দ করতেন। যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, যখন রাতে জাগ্রত হতেন, যখন অজু করতেন তখন মেছওয়াক করতেন। তিনি রাতের বেলায় তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন। শেষ রাতে দীর্ঘ সময় সালাতে কাটাতেন। দীর্ঘক্ষণ নামাজে থাকার কারণে অনেক সময় তার পা ফুলে যেত। তিনি বেতর নামাজ আদায় করতেন রাতের সকল নামাজের শেষে ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে। তিনি অন্যের কণ্ঠে কুরআন পাঠ শুনতে ভাল বাসতেন।

তার রয়েছে বিভিন্ন নাম। যেমন তিনি বলেছেন, 'আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আমাকে দিয়ে আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি হাশের (জমায়েতকারী) কারণ মানুষ আমার

[১] মুখতাছার শামায়েলুত তিরমিজী, ১৮৮

[২] আহমদ ১৩৪/৩

পিছনে জমায়েত হবে। আমি আকেব (সর্বশেষ) কারণ আমার পরে কোন নবী বা রাসূল নেই।'[১]

তিনি আরো বলেন, 'আমি মুকাফফি (ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী) আমি তাওবার নবী, রহমতের নবী।"[২]

তার উপনাম আবুল কাসেম।[৩]

তাকে চারিত্রিক উৎকর্ষতার পূর্ণতা দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে তার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

"মুহাম্মাদ তো কেবল আল্লাহর রাসূল, তার পূর্বে রাসূলগণ অতিবাহিত হয়েছেন।"[৪]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।"[৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৫৩২, সহীহ মুসলিম ২৩৫৪

[২] সহীহ মুসলিম ২৩৫৫

[৩] সহীহ আল - বুখারী ৩৫৩৭, সহীহ মুসলিম ১৬৮২/৩

[৪] সূরা আলে ইমরান : ১৪৪

[৫] সূরা আল-আহযাব :৪০

“যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, এবং আরো ঈমান এনেছে তার প্রতি যা মুহাম্মাদের উপর নাযিল হয়েছে, আর এটাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য।”[১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

“মুহাম্মাদ হল আল্লাহর রাসূল।”[২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈসা আ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেন,

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

“আমি একজন রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি যে আমার পরে আসবে, তার নাম হল আহমাদ।”[৩]

তিনি অধিক পরিমাণে জিকির করতেন। সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করতেন। দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন। খুতবা সংক্ষেপ করতেন। তিনি মুচকি হাসতেন। কখনো কখনো প্রয়োজনে এমন হাসতেন যে তার দাঁত দেখা যেত।

সাহাবী জরীর রা. বলেন, ‘আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দূরে রাখেননি। তার চেহারায় আমি সর্বদা মুচকি হাসি দেখেছি। আমি তার কাছে আমার অক্ষমতার অভিযোগ করে বললাম, ‘আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না।’ তিনি আমার বুকে থাপর দিয়ে দুআ করলেন, ‘হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখো, তাকে সঠিক পথ অবলম্বনকারী ও সঠিক পথের প্রদর্শক বানাও।’[৪]

---

[১] সূরা মুহাম্মাদ : ২

[২] সূরা আল-ফাতহ : ২৯

[৩] সূরা আস-সাফ : ৬

[৪] সহীহ আল - বুখারী ৩০৩৫, ৩৮৮২, ৬০৯০

তিনি হাসি- তামাশা করতেন তবে তা সত্য কথার মাধ্যমে। কাউকে কথার দ্বারা খাটো করতেন না। কেহ কোন ওজর-আপত্তি পেশ করলে তা গ্রহণ করতেন। তিনি তিন আঙুল দ্বারা খেতেন, আঙুল চেটে খেতেন। পানি খাওয়ার সময় পাত্রের ভিতরে শ্বাস ছাড়তেন না। তিনি অতি সংক্ষেপে কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় কথা বলতেন। কথা বলতেন স্পষ্ট ও যথেষ্ট বোধগম্য ভাষায়, যাতে শ্রোতাদের কথা স্মরণ রাখতে সহজ হয়। বুঝানোর জন্য একটি কথা তিন বার বলতেন। প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলতেন না। তিনি বিনয়-নম্রতার জন্য নির্দেশ দিতেন। উগ্রতা ও চরমপন্থা অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন। ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, ধীরস্থিরতা, উত্তম চরিত্র অবলম্বনে উৎসাহ দিতেন। তিনি সর্বদা ডান পন্থা অবলম্বন করতেন। অর্থাৎ সকল কাজ ডান দিকে দিয়ে শুরু করতেন। এমনকি, জুতা পরিধান, কেশবিন্যাসের ক্ষেত্রেও। বাম হাত দিয়ে শৌচ কর্ম ও পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পাদন করতেন। যখন শুতেন ডান কাতে শুতেন, ডান হাত ডান গালের নীচে রাখতেন। তার বৈঠক ছিল জ্ঞান চর্চার পাঠশালা। যাতে অনুশীলন হত সহনশীলতা, লজ্জা, আমানতদারী, ধৈর্য, প্রশান্তি, সহমর্মিতা, অন্যকে সম্মান ও মর্যাদা দান, তাকওয়া, বিনয়, বড়কে সম্মান করা, ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মমতা, অভাবীকে তার প্রয়োজন পূরণে অগ্রাধিকার, ভাল কাজের আদেশ, সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ, ক্ষুধার্তকে অন্য দান, ইয়াতীম-অনাথকে আশ্রয় দান, অসুস্থকে সেবা দান, দরিদ্রকে পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়গুলো। তিনি মাটির উপরে বসতেন, মাটির উপর বসে পানাহার করতেন। বিধবা, অসহায়, দাসদের সাথে বের হতেন তাদের সাহায্য করার জন্য। খেলাধুলারত শিশুদের কাছে আসতেন তাদের সালাম দিতেন। আপনজন ছাড়া অন্য নারীদের সাথে করমর্দন করতেন না। নিজের সাথিদের সর্বদা খোঁজ খবর নিতে, কাউকে না দেখলে তার খোঁজে বের হতেন। সকল সম্প্রদায়ের নেতাদের সম্মান করতেন। অধীনস্থদের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। সাহাবী আনাস রা. বলেন, ‘আমি দশ বছর তার কাজ করেছি। তিনি কখনো আমার প্রতি বিরক্ত হননি, কখনো বলেননি এটা কেন করেছ, এটা কেন করলে না? তিনি স্বর্ণ

ব্যবহার করতেন না, রেশমী কাপড় পরিধান করতেন না। তার ঘামের চেয়ে সুগন্ধময় কোন সৌরভ ছিল না।[১]

কখনো অশ্লীল কাজ বা আচরণ করতেন না। অশ্লীলতা পছন্দ করতেন না। খারাপ কাজের প্রতিকার খারাপ দিয়ে করতেন না, বরং ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা খারাপ কাজের প্রতিকার করতেন। কখনো কোন কর্মচারী, স্ত্রী, শিশুদের প্রহার করেননি। তবে যুদ্ধ ও বিচারের বিষয়টি আলাদা। দুটো বিষয় বা কাজের মধ্যে যেটি সহজতর সর্বদা সেটিকে বেছে নিতেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল উত্তম স্বভাব, চমৎকার আচরণ, সুন্দর চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন শুধু তারই সত্বায়। দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি ও সফলতার উপাদান পাওয়া যাবে শুধু তারই চরিত্রে। বিশ্বের অন্য কোন মানুষের চরিত্রে এগুলো একত্রে কখনো পাওয়া যায়নি আর যাবেওনা। তিনি ছিলেন নিরক্ষর, পড়তে ও লেখতে জানতেন না। তার কোন মানব শিক্ষক ছিল না। তিনি পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিনের নিকট প্রেরিত ও তাদের কল্যাণে নির্বাচিত। তার প্রতি অগণিত সালাত ও সালাম নিবেদিত হোক মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে। আল-কুরআনই হল তার চরিত্র।

আমাদের জন্য করণীয় হল তার অনুসরণ করা জীবনের সকল ক্ষেত্রে- সকল কথা ও কাজে, সকল চিন্তা ও চেতনায়, সকল দৃষ্টিভংগি ও ভাবনায়। তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি তা থেকে ফিরে থাকবে। আর যা আদেশ করেছি সাধ্য মত তা অনুসরণ করবে।[২]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইবাদত ও জিহাদে সংগ্রাম

[১] সহীহ আল - বুখারী- ৬০৩৮, সহীহ সহীহ মুসলিম ২৩০৯

[২] সহীহ আল - বুখারী ৭২৮৮, সহীহ সহীহ মুসলিম ২৬১৯

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আদর্শ, অনুসরণযোগ্য ইমাম যাকে যাকে সর্বদা অনুসরণ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

"তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ। যে আল্লাহ ও আখেরাতকে চায় ও বেশি বেশি স্মরণ করে আল্লাহকে।"[১]

২- তিনি রাতে এগারো রাকআত নামাজ আদায় করতেন। অনেক সময় তের রাকআত নামাজ আদায় করতেন।[২]

দিনের হিসাবে দিনে তিনি মোট বার রাকআত, কখনো দশ রাকআত আদায় করতেন। চাশতের নামাজ হিসাবে তিনি চার রাকআত, কখনো তার বেশি আদায় করতেন।[৩] তিনি রাতের তাহাজ্জুদ এত দীর্ঘ সময় আদায় করতেন যে, এক রাকআতে পাঁচ পারার মত পাঠ করা যেত।[৪]

তিনি দিনে রাতে প্রায় চল্লিশ রাকআত নামাজ আদায় করতেন, এর মধ্যে ফরজ হল সতের রাকআত।[৫]

৩- রমজান মাস ব্যতীত তিনি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন।[৬] সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।[৭]

অল্প কয়েক দিন ব্যতীত তিনি শাবান মাস জুড়ে রোযা রাখতেন।[৮]

[১] সূরা আল-আহযাব : ২১

[২] সহীহ আল - বুখারী ১১৪৭, সহীহ মুসলিম ৭৩৭

[৩] সহীহ মুসলিম ৭৯১

[৪] সহীহ মুসলিম ৭৭২

[৫] কিতাবুস সালাত : ইবনুল কায়্যিম

[৬] সহীহ মুসলিম ১১৬০

[৭] তিরমিজী ৭৪৫, নাসায়ী ২০২/৪

[৮] সহীহ আল - বুখারী ১৯৬৯, সহীহ মুসলিম ১১৫৬

শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখতে উৎসাহ দিতেন।[১] কখনো এমন ভাবে রোযা রাখতে থাকতেন মনে হতো তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনো রোযা পরিহার করতেন মনে হতো তিনি আর নফল রোযা রাখবেন না।[২] তিনি আশুরাতে রোযা রাখতেন।[৩] জিলহজ মাসের নবম তারিখেও তিনি রোযা রাখতেন।[৪] তিনি বিরতিহীন ভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন আমার উম্মত আমার মত নয়। আমাকে আমার প্রতিপালক পানাহার করিয়ে থাকেন।[৫]

আল্লাহর কাছে সালাত ও মুনাজাত ছিল তার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তাই তো তিনি বেলালকে বলতেন, 'হে বেলাল! সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দাও।'[৬]

তিনি আরো বলতেন, 'সালাতের মধ্যে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে।'[৭]

৪- তিনি বেশি করে ছদকাহ করতেন। তিনি ছিলেন সকল সৃষ্টি জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দানশীল। তিনি মানুষকে এমনভাবে দান করতেন যে, দান গৃহী তা কখনো অভাব বোধ কর তো না। যেমন তিনি এক ব্যক্তিকে বকরীর বিশাল এক পাল দান করলে সে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় দানশীল যে, সে কাউকে দান করলে জীবনে সে দারিদ্রতাকে ভয় করে না।'[৮]

তিনি যেমন ছিলেন সুন্দরতম মানুষ, তেমনি ছিলেন সকলের চেয়ে দানশীল। সকল মানুষের চেয়ে বেশি সাহসী, সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র,

[১] সহীহ মুসলিম ১১৬৪
[২] সহীহ আল - বুখারী ১৯৭১, সহীহ মুসলিম ১১৫৬
[৩] সহীহ আল - বুখারী ২০০০, সহীহ মুসলিম ১১২৫
[৪] সহীহ নাসায়ী ২২৩৬
[৫] সহীহ আল - বুখারী ১৯৬১-১৯৬৪, সহীহ মুসলিম ১১০২-১১০৩
[৬] আবু দাউদ ৮৫৪৯
[৭] নাসায়ী ৬১/৭
[৮] সহীহ মুসলিম ১৮০৬

সকলের চেয়ে বেশি বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল, নম্র, ক্ষমাশীল, সহনশীল, লজ্জাশীল ও সত্যের প্রতি অটল, অবিচল।

৫- তিনি সকল জিহাদের ময়দানে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ করেছেন। কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করেছেন। এর চারটি স্তর রয়েছে এগুলো হল : দীনের বিষয়াবলী শিক্ষা, সে মোতাবেক আমল করা, জেনে বুঝে তার দিকে মানুষকে আহ্বান করা, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুলুম-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য অবলম্বন।

শয়তানের সাথে জিহাদ করার স্তর হল দু টো : শয়তান যে সকল সংশয় - সন্দেহ সৃষ্টি করে সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা, যে সকল কুমন্ত্রণা দেয় তা প্রতিরোধ করা।

কাফেরদের সাথে জিহাদ করার স্তর হল চারটিঃ অন্তর দিয়ে জিহাদ, মুখ বা বাকশক্তি দিয়ে জিহাদ, সম্পদ দিয়ে জিহাদ ও হাত দিয়ে জিহাদ।

যালেমদের বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর হল তিনটি : হাত দিয়ে অতঃপর মুখ দিয়ে এরপর অন্তর দিয়ে।

এ হল জিহাদের মোট তেরোটি স্তর। এ সবকটি স্তরে জিহাদ করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ জন্য তিনি বিশ্বের মানব সমাজে সর্বকালের সব চেয়ে বেশি আলোচিত ব্যক্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে এ সম্মান দান করেছেন।

তিনি তাওহীদ- আল্লাহর একত্ববাদ বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সরাসরি। এ সকল যুদ্ধের সংখ্যা হল সাতাশ। এর মধ্যে মাত্র নয়টিতে লড়াই সংঘটিত হয়েছিল। আর যে সকল অভিযান তাঁর নির্দেশে হয়েছে, কিন্তু তিনি সরাসরি তাতে অংশ নেননি, এমন অভিযানের সংখ্যা হল ছাপ্পান্ন।[১]

৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে মুআমালা- লেনদেনের ক্ষেত্রে ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি একদিন

[১] ফাতহুল বারী

এক ব্যক্তি থেকে একটি উট ধার নিয়েছিলেন। কথা ছিল এর পরিবর্তে অন্য একটি সমমানের উট তাকে দেয়া হবে। সময় মত যখন উটের পাওনাদার উট নিতে আসল, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সে কথা-বার্তায় কঠোর আচরণ করল। সাহাবায়ে কেরাম রাগ হয়ে তাকে বুঝাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও! তার কথার প্রতিবাদ করনা। পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে। তার উটের মত উট তাকে দিয়ে দাও।' সাহাবীগণ বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার উটের চেয়ে ভাল উট আছে, কিন্তু সমমানের উট নেই। তিনি বললেন, 'সেটাই তাকে দিয়ে দাও!' লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনি আমার অধিকার পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে আদায় করেছেন। আল্লাহ আপনাকে সুন্দরভাবে দান করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে সুন্দর বিচার করে সে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম।'[১]

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. কে বললেন, 'আমি তোমার উটটি কিনব, সে উট নিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উটের দাম দিলেন ও উট ফেরত দিয়ে বললেন, 'নাও! তোমার উট ও তার মূল্য।'[২]

৭- চরিত্রের দিকে দিয়ে তিনি সকল মানুষের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। যেমন আয়েশা রা. বলেন, 'তার চরিত্র ছিল আল-কুরআন।'[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন, 'আমাকে উত্তম চরিত্রের উৎকর্ষতাকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।'[৪]

৮- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যাহেদ-দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খেজুরের চাটাইতে

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৩০৫, সহীহ মুসলিম ১৬০০
[২] সহীহ আল - বুখারী ৩২০/৪, সহীহ মুসলিম ৭১৫
[৩] সহীহ মুসলিম ৫২৩/১
[৪] বায়হাকী ১৯২/১০

শয়ন করতেন। শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেত। একদিন উমার রা. তার কাছে আসলেন। তিনি তার শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে বললেন, 'যদি আপনি বিছানা ব্যবহার করতেন তাহলে শরীরে দাগ পড়তোনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, 'দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমার আর এ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল, এক সওয়ারী, যে গরমের দিন পথ চলতে গিয়ে বিশ্রামের জন্য গাছের তলায় একটু শুয়ে নিল। তারপর আবার চলতে শুরু করল।'[১]

তিনি আরো বলতেন, 'যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকতো তাহলে আমি তা তিন দিন আমার কাছে থাকুক তা পছন্দ করতাম না। তবে দ্বীনের জন্য কিছু রাখলে তা হত অন্য কথা।'[২]

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে তার পরিবার কখনো তিন দিন পেট ভরে খাবার গ্রহণ করতে পারেনি।'[৩]

অর্থাৎ একাধারে তিনদিন তারা পেট ভরে খেতে পারেননি। কারণ খাদ্যের অভাব। তাদের কাছে কোন খাদ্য-খাবার আসলে অভাবী মানুষকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়ে তাদের দান করে দিতেন। তারা নিজেরা না খেয়ে তা অন্যকে দিয়ে দিতেন।[৪]

আয়েশা রা. বলেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেলেন কিন্তু জীবনে কখনো পেট ভরে আটার রুটি খেলেন না।'[৫]

তিনি আরো বলেন, 'তিনটি নতুন চাঁদ আমরা দেখতাম, দু মাস অতিবাহিত হত কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহসমূহে চুলায় আগুন জ্বলতো না।' উরওয়া (আয়েশা রা. এর বোনের

[১] সুনানে তিরমিজী ২৮০/২
[২] সহীহ আল - বুখারী ২৩৮৯, সহীহ মুসলিম ৯৯১
[৩] সহীহ আল - বুখারী ৫১৭/৯
[৪] সহীহ আল - বুখারী, ৫৪১৬
[৫] সহীহ আল - বুখারী ৫১৭/৯

ছেলে) জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনারা কি খেয়ে জীবন কাটাতেন।' তিনি বললেন, 'দুটি কালো বস্তু ; খেজুর ও পানি।'[১]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা ছিল গাছের আশ দিয়ে তৈরি চট।'[২]

৯- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি পরহেযগার-সতর্ক, তিনি বলেন, 'আমি যখন ঘরে আসি তখন অনেক সময় বিছানায় বা ঘরের কোথাও দেখতে পাই যে, খেজুর পড়ে আছে। আমি তা খাওয়ার জন্য উঠিয়ে নেই। কিন্তু পর ক্ষণে চিন্তা করি, হতে পারে এটি ছদকার খেজুর (যা আমার জন্য বৈধ নয়) পরে তা ফেলে দেই।'[৩]

তার নাতি হাসান ইবনে আলী রা. একবার ছদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর মুখে দিলেন। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'ছি! ছি! ফেলে দাও! তুমি কি জান না, আমরা ছদকা খাই না?'[৪]

১০- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি ও বড় বড় কাজ করা সত্ত্বেও বলতেন, 'তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করো। জেনে রাখ! আল্লাহ বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা কাজ করতে করতে বিরক্ত হও। আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল হল যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।' আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ও পরিজনেরা যখন কোন আমল করতেন, তার উপর অবিচল থাকতেন।[৫]

---

[১] সহীহ আল - বুখারী ৬৪৫৯
[২] সহীহ আল - বুখারী ৬৪৫৬
[৩] সহীহ মুসলিম ১০৭০
[৪] সহীহ মুসলিম ১০৬৯
[৫] সহীহ আল - বুখারী ১৯৭০, সহীহ মুসলিম ৭৮২

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সালাত আদায় করতেন তা অব্যাহত রাখতেন।[১]

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকজন সাহাবী তার ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তারা বলছিলেন, ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা কোথায় আর আল্লাহর নবী কোথায়? আমাদের ইবাদতের সাথে তার ইবাদতের কোন তুলনা হয়? অথচ আল্লাহ তার পিছনের ও সামনের সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বলল, আমি রাতব্যাপী নফল সালাত আদায় করব। আরেক জন বলল, আমি সর্বদা রোযা রাখব কখনো রোযা ত্যাগ করব না। অন্য একজন বলল, আমি কখনো নারী স্পর্শ করব না ও বিবাহ করব না। আরেক জন বলল, আমি কখনো গোশ্‌ত খাব না। তাদের এ আলোচনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনছিলেন। তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, 'তোমরাই তো এ রকম কথা-বার্তা বলছিলে, তাই না? সাবধান! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি ও তোমাদের চেয়ে বেশি মুত্তাকী-পরহেযগার। কিন্তু দেখ, আমি রোযা রাখি আবার তা পরিত্যাগ করি। আমি নামাজও পরি আবার নিদ্রা যাই। আমি নারীদের বিবাহ করি। অতএব যে আমার সুন্নাতে অনীহা দেখায় সে আমার থেকে নয়।'[২]

এখানে সুন্নাত দ্বারা তার আদর্শ ও জীবন যাপন পদ্ধতি উদ্দেশ্য। তিনি এত কঠিন, কঠোর ও অত্যধিক আমল করার পরও বলতেন, 'সহজ করো, ধীরে সুস্থে কাজ করো, তোমরা জেনে রাখো, কেহ আমলের বিনিময়ে মুক্তি পাবে না।' সাহাবীগন বলল, হে রাসুল! 'আপনিও কি আমলের বিনিময়ে মুক্তি পাবেন না?' তিনি বললেন, 'আমিও নই, তবে আল্লাহ যদি নিজ অনুগ্রহে আমার প্রতি রহম করেন, আমার প্রতি দয়া করেন।'

---

[১] সহীহ আল - বুখারী ১৯৭০
[২] সহীহ আল - বুখারী ৫০৬৩, সহীহ মুসলিম ১৪০১

তিনি এ বলে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, 'হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর অটল রাখেন।'[১]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সৃষ্টিকুলের জন্য করুণা

প্রথমত : তিনি মানবকুল, জিন, মুমিন, কাফের জীবজন্তু সকলের জন্য করুণা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . (الأنبياء : ١٠٧)

"আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।"[২]

যারা ঈমান এনেছে তারা এ রহমত-অনুগ্রহকে গ্রহণ করেছে। এ জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেছে। কিন্তু অন্যেরা প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহর এ অনুগ্রহকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করেছে। আল্লাহর নেআমাত ও রহমতকে অস্বীকার করেছে।[৩]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনল, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য রহমত-করুণা লিখে দিলেন। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনল না তারা অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ন্যায় শাস্তি ও দুর্যোগ ভোগ করবে।'[৪]

[১] তিরমিজী ৩৫২২

[২] সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭

[৩] তাইসীরুল কারীম আর-রাহমান ফি তাফসীরি কঠলামিল মান্নান

[৪] তাফসীরু জামিইল বয়ান : আত-তাবারী

ইমাম তাবারী রহ. বলেন, 'উপরে উল্লেখিত দু'টো বক্তব্যের মধ্যে প্রথম বক্তব্যটি অধিকতর সঠিক, যা ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে ও সৃষ্টিকুলের জন্য করুণা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মুমিন ও কাফের সকলের জন্য। মুমিনগনকে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ এর মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করলেন। তাদের ঈমানে প্রবশে করালেন, আমলের তাওফীক দিলেন। ফলে তারা জান্নাত লাভ করবে। আর যারা তাকে অস্বীকার করল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণে তাদের উপর আল্লাহর গজব ও শাস্তি বিলম্বিত হয়েছে। এদিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ হলেন কাফিরদের জন্য রহমত। কেননা অন্যান্য নবী ও রাসূলগনকে অস্বীকার করার শাস্তি সংশ্লিষ্ট নবী রাসূলদের জীবদ্দশায় হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের জন্য রহমত হিসেবে আসার কারণে কাফেরদের উপর শাস্তি বিলম্বিত হয়েছে।'[১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রহমত ছিল সার্বজনীন ও ব্যাপক। যেমন আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, 'হে রাসূল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে দুআ করুন!' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি। আমাকে রহমত- দয়া ও করুণা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।'[২]

সাহাবী হুজাইফা রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমি যদি রাগ করে আমার উম্মতের কাউকে গালি দেই বা লা'নত করি তবে তোমরা জেনে রাখ আমি একজন মানব সন্তান। তোমরা যেমন রাগ করে থাকো আমিও তেমনি রাগ করে থাকি। কিন্তু আমাকে তো সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত-করুণা

[১] জামেউল বয়ান : আত-তাবারী ৫৫২/১৮

[২] সহীহ মুসলিম ২৫৯৯

হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। কেয়ামত দিবসে আমার এ গালি বা লানতকে তাদের জন্য রহমতে পরিণত করে দেব।'[১]

তিনি আরো বলেছেন, 'আমি মুহাম্মাদ, আহমদ, আল-মুকাফফী, আল-হাশের, তাওবার নবী ও রহমত-করুণার নবী।'[২]

দ্বিতীয়ত : এ প্রসঙ্গে বাস্তব ঘটনাবলী ও তার প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার : তার শত্রুদের প্রতি দয়া ও করুণা

প্রথম দৃষ্টান্ত : নিজ শত্রুদের জন্য তার রহমত ও করুণা :

তার রহমত- করুণা থেকে তার শত্রুরাও বঞ্চিত হয়নি। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধ, লড়াই ও জিহাদ করার সময়েও তাদের প্রতি দয়া-রহমত ও করুণার প্রমাণ দিয়েছেন।

ইসলামে আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যাপারে মূলনীতি রয়েছে। যারা জিহাদে নিয়োজিত থাকে তাদের এ সকল মূলনীতি অবশ্যই মানতে হবে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা সীমা লঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা ললনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৩]

এ আয়াতের আলোকে জিহাদে যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ তা হল : মৃত দেহে কোন রকম আঘাত করা বা কাটা, সম্পদ আত্নসাত-লুট-পাট, নারী শিশু বৃদ্ধদের হত্যা করা, যে সকল বৃদ্ধরা যুদ্ধে কোন ভূমিকা রাখে না তাদের হত্যা করা। এমিনভাবে পাদ্রী, ধর্ম যাজক, অসুস্থ, অন্ধ, গির্জা, চার্চ, মন্দিরের অধিবাসীদের হত্যা করা নিষেধ। যদি তারা যুদ্ধে অংশ নেয় তখন ভিন্ন কথা।[৪]

---

[১] সহীহ সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪/৩
[২] সহীহ মুসলিম ২৩৫৫
[৩] সূরা আল-বাকারা : ১৯০
[৪] আল-মুগনী : ইবনে কুদামা ১৭৫-১৭৯/১৩

এমনিভাবে প্রাণী হত্যা, গাছ-পালা বৃক্ষ নষ্ট করা, শস্য ক্ষেত্র ফল-ফলাদির বাগান নষ্ট করা, নলকূপ, পুকুর, পানির ব্যবস্থা ও গৃহ ধ্বংস করা নিষিদ্ধ।[১]

কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক নারীর লাশ দেখতে পেলেন। তখনই তিনি যুদ্ধের সময় নারী ও শিশুদের হত্যা নিষিদ্ধ করে দিলেন।[২]

এ কারণে যখন তিনি কোন অভিযান প্রেরণ করতেন, তখন তার সেনাপতিকে নির্দেশ দিতেন সকল বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে, অধীনস্থদের সাথে ভাল আচরণ করতে। অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে লড়াই করবে। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ করবে কিন্তু বাড়াবাড়ি করবে না, লুট-পাট করবে না, মৃত দেহ বিকৃত করবে না, শিশুদের মারবে না। যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন তাদের তিনটি বিষয়ে আহ্বান করবে . . .।[৩]

অতঃপর তিনি বিষয় তিনটি বললেন,

(ক) ইসলাম ও হিজরতের প্রতি আহ্বান করবে অথবা হিজরত ব্যতীত শুধু ইসলামের দিকে আহ্বান করবে। শুধু ইসলাম গ্রহণ করলে তারা বেদুইন মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হবে।

(খ) যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে তখন তাদের জিযিয়া কর দিতে বলবে।

(গ) যদি এ দুটোর কোনটা না শুনে তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবে ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[৪]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : নিজ শত্রুদের সাথে প্রতিশ্রুতি পালন

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসীর : ২২৭/১
[২] সহীহ আল - বুখারী ৩০১৪ম ৩০১৫
[৩] সহীহ মুসলিম , জিহাদ অধ্যায়
[৪] সহীহ মুসলিম , জিহাদ অধ্যায়

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির একটি হল ওয়াদা রক্ষা করা খেয়ানত না করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

"যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা করো, তবে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।"[১]

যদি কাফের ও মুসলিমদের মধ্যে কোন চুক্তি থাকে বা নিরাপত্তা দেয়ার কথা থাকে, তখন আক্রমণ করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্যই মুসলিমগন চুক্তি রক্ষা করবে। যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয় তখন মুসলিমগণ তাদের এ বিষয়ে সংবাদ দেবে যে, 'তোমরা যদি চুক্তি ভঙ্গ করতে চাও আমরা তাহলে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেব।'

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যদি কাফের বা শত্রুদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের ভয় না থাকে তাহলে মুসলিমদের জন্য চুক্তি রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে যাবে।[২]

তাইতো আমরা দেখতে পাই, সালীম ইবনে আমের বলেন, মুআবিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে চুক্তি ছিল। তিনি রোমের দিকে এ উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যে, যখন চুক্তি শেষ হয়ে যাবে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবেন। তখন দেখা গেল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আল্লাহু আকবর, চুক্তি রক্ষা করা উচিত, ভঙ্গ করা নয়।' লোকেরা তার দিকে তাকাল, দেখা গেল সে আমর ইবনে আবাসা রা.। মুআবিয়া রা. তার কাছে লোক পাঠিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলতেন, 'যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি থাকে তবে তার গিঁট শক্ত করবে না ও খুলেও ফেলতে চাবে না। যতক্ষণ না তার মেয়াদ শেষ হয়ে

[১] সূরা আল-আনফাল : ৫৮

[২] তাফসীর ইবনে কাসীর ৩২১/২

যায় অথবা উভয় পক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করে।' এ কথা শুনে মুআবিয়া রা. তার বাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেন।[১] কেননা এ ধরনের তৎপরতা চুক্তি ভঙ্গের চেষ্টা করার নামান্তর।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত : নিজ শত্রুদের উপর শাস্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

এ বিষয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত হল, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকরা প্রস্তর আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল তখন পাহাড়-পর্বত সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তা এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনার জাতির কথা শুনেছেন, যা তারা আপনাকে বলেছে। আমি হলাম পাহাড়ের দায়িত্বশীল। আমার প্রতিপালক আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে যে কোন নির্দেশ দিতে পারেন। যদি আপনি চান আমি দু আখবাশ একত্র করে তাদের পিষে দেই।' (আখবাস হল মক্কার দু পাশের দু পাহাড়। যার মাঝে মক্কা নগরী অবস্থিত) এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের ফেরেশতাকে বললেন, 'আমি আশা করি এদের থেকে আল্লাহ তাআলা এমন প্রজন্ম বের করবেন যারা এক আল্লাহরই ইবাদত করবে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।'[২]

চতুর্থ দৃষ্টান্ত : রাসূলুল্লাহর উদার মানসিকতা ও ইহুদীদের কল্যাণ কামনা

এর সুন্দর দৃষ্টান্ত হল আনাস রা. এর হাদীস, তিনি বলেন, 'এক ইহুদী যুবক ছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ তাকে দেখতে এলেন। তার মাথার কাছে বসলেন। তাকে বললেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।' এ কথা শুনে সে তার বাপের মুখের দিকে তাকাল। বাপ তাকে বলল, 'আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলে তা শোনো।' সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করল। (নাসায়ীর বর্ণনায় সে ঘোষণা দিল, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর

[১] আবু দাউদ, ১৫৮০ জিহাদ অধ্যায়

[২] সহীহ আল - বুখারী ৩২৩১, সহীহ মুসলিম ১৭৯৫

রাসূল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে বের হওয়ার সময় বললেন, 'প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি ছেলেটাকে আগুন থেকে মুক্তি দিলেন।'[১]

দ্বিতীয় প্রকার : মুমিনদের প্রতি তার করুণা-রহমত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল। যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়। সে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ন।"[২]

আল্লাহ এ নবীকে পাঠিয়েছেন সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য আর বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য। যারা তাকে চিনে, তার থেকে উপকার নিতে জানে। তিনি মুমিনদের কল্যাণ কামনা করেন সর্বদা। তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালান। তাদের উপর কোন বিপদ আসলে তিনিও তাতে আহত হন। তাদের ঈমানের দিকে পথ চলাতে সর্বদা আগ্রহী থাকেন। তাদের জন্য যে কোন ধরনের ক্ষতি তিনি অপছন্দ করেন। পিতা-মাতারা সন্তানকে যেভাবে ভালবাসে তিনি ঈমানদারদেরকে তার চেয়ে বেশি বেশি ভালোবাসেন। এ জন্যই তার হক সকলের চেয়ে বেশি। উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাকে সম্মান করা। তাকে সাহায্য করা।[৩]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

[১] সসহীহ আল - বুখারী ১৩৫৬

[২] সূরা আত-তাওবা ১২৮

[৩] তাইসীরুল কারিম আর-রাহমান

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার স্ত্রীরা তাদের মাতা।"[১]

তাই নিজের চেয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি ভালোবাসতে হবে। যদি নিজের কোন সিদ্ধান্তের সাথে নবীর সিদ্ধান্ত বিরোধী হয় তখন নিজের মতামত বাদ দিয়ে নবীর মতামত বা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ لِنْتَ لهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهَّ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ

"অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; আর তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয় তারা তোমার সঙ্গ হতে দুরে সরে যেত অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করো ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কার্য সম্পর্কে তাদের সাথে পরামর্শ করো; যখন তুমি সংকল্প করো তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। যারা তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি মুমিনদের অতি নিকটবর্তী তাদের নিজেদের চেয়েও। অতএব যে ইন্তেকাল করে ও তার উপর ঋণ থাকে, সেই ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যদি সে সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারদের প্রাপ্য।"[৩]

[১] সূরা আল-আহযাব : ৬

[২] সূরা আল-আলে ইমরান : ১৫৯

[৩] সহীহ আল - বুখারী ৬৭৩১, সহীহ মুসলিম ১৬১৯

তৃতীয় প্রকার: তার করুণা ও ভালোবাসা সকল মানুষের জন্য

১- সাহাবী জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।'[১]

২- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন 'হতভাগ্য ব্যতীত অন্য করো থেকে রহমত-দয়ার চরিত্র উঠিয়ে নেয়া হয় না।'[২]

৩– সাহাবী আমর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা অন্যের প্রতি দয়া-করুণা করে দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া-রহমত হল দয়াময় আল্লাহর নৈকট্য, যে এতে পৌছতে পারল সে আল্লাহর কাছে পৌছে গেল, আর যে এটা কেটে ফেলল সে তার সাথে সম্পর্ক কেটে ফেলল।'[৩]

চতুর্থ প্রকার : শিশুদের প্রতি তার দয়া ও মমতা

১- আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, এক বৃদ্ধ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসল, লোকেরা তাকে জায়গা করে দিতে দেরি করল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা দেখায় না ও প্রবীণদের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৪]

২- আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে

[১] সহীহ মুসলিম ২৩১৯
[২] তিরমিজী ১৯২৩
[৩] তিরমিজী ১৯২৪
[৪] তিরমিজী ১৯১৯

ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতার আচরণ করে না, আমাদের বড়দের সম্মান বুঝে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[১]

পঞ্চম প্রকার : কন্যা সন্তানদের প্রতি তার দয়া-মমতা :

১- আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোন ব্যক্তির তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা বা দুটি বোন থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[২]

২- আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুটি কন্যা বা তিনটি কন্যা লালন-পালন করবে, অথবা দুটি বোন বা তিনটি বোন লালন-পালন করবে বিবাহ দেয়া পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত। সে ব্যক্তি ও আমি জান্নাতে এক সঙ্গে থাকব।'[৩]

ষষ্ঠ প্রকার : ইয়াতীমদের প্রতি তার দয়া ও ভালোবাসা

১- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এমনভাবেই থাকব।' একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছেন।[৪] (অর্থাৎ একত্রে থাকব)

২- আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে নিজ অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও, অভাবীকে আহার দাও।'[৫]

সপ্তম প্রকার : নারী ও দুর্বলদের প্রতি তার দয়া-মমতা:

[১] তিরমিজী ১৯২০
[২] আবু দাউদ ৫১৪৭, তিরমিজী ১৯১২
[৩] আহমাদ ১২৪৯৮
[৪] সহীহ আল - বুখারী ৬০৫ সহীহ মুসলিম ২৯৮৩
[৫] আহমদ ৫৫৮/১৪

১- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ ! আমি দুই দুর্বলের অধিকারের ব্যাপারে ভয় করি ; ইয়াতীমের অধিকার ও নারীর অধিকার ।'[১]

২- আমের ইবনুল আহওয়াছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিদায় হজে অংশ নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সানা ও প্রশংসা করলেন, ওয়াজ করলেন, স্মরণ করিয়ে দিলেন। অতঃপর এক পর্যায়ে বললেন, 'আমি নারীদের সাথে সুন্দর আচরণের জন্য তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি। তারা তোমাদের জীবন সাথি। তোমরা এ (সাহচর্য) ছাড়া তাদের আর কিছুর মালিক নও।'[২]

৩- আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে নিজের স্ত্রীদের ও উম্মে সুলাইমের ঘর ছাড়া অন্য কোন নারীর ঘরে প্রবেশ করতেন না। তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি তার প্রতি দয়া-মমতার কারণে তাকে (উম্মে সুলাইমকে) দেখতে যাই। কারণ তার ভাই আমার সাথে থেকে নিহত হয়েছে।'[৩]

অষ্টম প্রকার : ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়া-মমতা

১- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিধবা ও অভাবী লোকদের জন্য যে প্রচেষ্টা চালায়, সে মর্যাদায় আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের ন্যায় অথবা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত সালাতে কাটায় ও দিবসে রোযা রাখে।'[৪]

২- আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে জিকির করতেন। অনর্থক বিষয়

[১] আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল হাদীস ৩৬১/১
[২] সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ২৯৮/২
[৩] সহীহ আল - বুখারী ২৮৪৪
[৪] সহীহ আল - বুখারী ৫৩৫৩, সহীহ মুসলিম ২৯৮২

পরিহার করতেন। সালাত দীর্ঘ করতেন। খুতবা সংক্ষেপ করতেন এবং বিধবা ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণে বের হতে দেরি করতেন না।'[১]

উল্লেখিত হাদীসগুলো পাঠ করে আমরা দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহায্য করতে তাদের প্রয়োজন পূরণে কতটা দয়ার্দ্র ও মমতাময়ী ছিলেন।

নবম প্রকার : জ্ঞান অন্বেষনকারী ছাত্রদের প্রতি রাসূলুল্লাহর দয়া ও স্নেহ

১- আবু সায়ীদ খুদরী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জনের জন্য তোমাদের কাছে অনেক সম্প্রদায় আসবে। যখন তোমরা তাদের দেখবে স্বাগত জানিয়ে বলবে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশক্রমে তোমাদের স্বাগত জানাই।' এবং তাদের শিক্ষা দেবে। শিক্ষায় সাহায্য করবে।'[২]

২- মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা, বলেন, 'আমরা সমবয়সী কয়েকজন যুবক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আসলাম। বিশ দিন বিশ রাত কাটালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আমাদের প্রতি খুবই দয়ার্দ্র ও স্নেহময়ী। যখন তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠেছি, তখন তিনি আমাদের সকলের কাছ থেকে জেনে নিলেন আমরা বাড়িতে কাদের রেখে এসেছি। তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও। তাদের কাছে অবস্থান করো। তাদের শিক্ষা দাও। . . .আর আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় আসবে তোমাদের একজন আজান দেবে, তোমাদের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।'[৩]

[১] সহীহ সুনানে নাসায়ী ১৪১৫
[২] তিরমিজী ২৬৫০, ইবনে মাজা ২৪৭
[৩] সহীহ আল - বুখারী ৬২৮, ৬৩১

দেখুন জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত ছাত্রদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দয়ালু ও স্নেহময়ী ছিলেন ।

দশম প্রকার ঃ বন্দি ও কয়েদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর দয়া ও মমতা

আবু মূছা আল-আশআরী রা. বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বন্দিদের মুক্ত করে দাও । ক্ষুধার্তকে আহার দাও । অসুস্থদের সেবা করো ।'[১]

এ হাদীসে মুসলিম বন্দিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়া ও রহমতের প্রমাণ আমরা পাই । তিনি বন্দিদের মুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন । আর ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে ও রোগীর সেবা করতে আদেশ করেছেন ।

একাদশ প্রকারঃ রোগীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়া ও মমতা -

১- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'মুসলমানদের প্রতি মুসলমানদের ছয়টি অধিকার রয়েছে ।' জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রাসূল সেগুলো কি?' তিনি বললেন, 'যখন দেখা হবে সালাম দেবে । যখন সে তোমাকে দাওয়াত দেবে, তুমি সাড়া দেবে । যখন সে পরামর্শ চাবে তাকে পরামর্শ দেবে । যখন সে হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বলবে তার উত্তর দেবে । যখন সে অসুস্থ হবে তখন তার দেখাশুনা করবে এবং যখন সে মৃত্যু বরণ করবে তখন তার দাফন কাফনে অনুগামী হবে ।'[২]

২- আলী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যখন কোন মুসলমান এক অসুস্থ মুসলমানকে সকাল বেলায় সেবা করতে আসে

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩০৪৬
[২] সহীহ আল - বুখারী ১২৪০, ২১৬২

তখন সত্তর হাজার ফেরেশ্তো সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দুআ করতে থাকে । আর যখন রাতের বেলা সেবা করতে আসে তখন সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করে থাকে । আর জান্নাতে তার জন্য একটি বাগান তৈরি করা হয় ।'[১]

৩- ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুপথ যাত্রী নয় এমন রোগীকে দেখতে যাবে এবং তার কাছে বসে সাত বার যদি এ দুআটি পড়ে

أسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

(আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের প্রভু তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন ।) তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সুস্থ করে দেবেন ।'[২]

এ সকল হাদীস আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতি কত বড় দয়ালু-মেহেরবান ছিলেন । শুধু তিনি দয়ালু ছিলেন তাই নয় । বরং তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন রোগাক্রান্ত মানুষকে সেবা করার জন্য, তাদের প্রতি দয়া-করুণা প্রদর্শন করার জন্য ।

দ্বাদশ প্রকার : জীবজন্তু, পাখ-পাখালী ও পোকা-মাকড়ের প্রতি রাসূলুল্লাহর দয়া -

১- আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি দেখল একটু কুকুর পিপাসায় কাঁদা খাচ্ছে, । লোকটি কুকুরটিকে পানি পান করাল । পানি পান করে সে আল্লাহর শোকর আদায় করল । এ কারণে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করালেন । এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জন্তু জানোয়ারের ব্যাপারেও আমাদের জন্য পুরস্কার আছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রতিটি

[১] তিরমিজী ৯৬৯
[২] সহীহ সুনানে আবু দাউদ ৩১৬০

আদ্র কলিজার অধিকারী (প্রাণী) র প্রতি দয়া-মমতায় তোমাদের জন্য পুরস্কার আছে।'[১]

২- আবু হুরাইরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, 'এক ব্যভিচারী নারী পিপাসার কারণে মৃত মুখে পতিত এক কুকুর দেখতে পেল। সে নিজের পায়ের মোজা খুলে তাতে নিজের ওড়না লাগিয়ে কূপ দিয়ে পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পান করাল। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।'[২]

৩- আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জনৈক মহিলা একটি বিড়ালকে বেধে রেখেছিল। ফলে সে না খেয়ে মারা গেল। আল্লাহ এ কারণে মহিলাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। কেন সে বিড়ালটিকে খাবার না দিয়ে আটকে রাখল? সে তাকে ছেড়ে দিত, যমীন থেকে সে খাবার সংগ্রহ করে নিত।'[৩]

৪- আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করে, কোন শস্য চাষ করে। অতঃপর তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ অথবা কোন জন্তু-জানোয়ার খাবার খায়, তাহলে এটা তার জন্য ছদকাহ হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণ করা হয়।'[৪]

৫- ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বকরী জবেহ করার জন্য শুইয়ে দিল। তারপর চাকু ধারালো করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি কি বকরীটিকে কয়েকবার মৃত্যুর কষ্ট দিতে চাও? কেন তাকে শোয়ানোর পূর্বে চাকু ধারালো করলে না?'[৫]

[১] সহীহ আল - বুখারী ১৭৩, ২৪৯৯, সহীহ মুসলিম ২২৪৪
[২] সহীহ আল - বুখারী ৩৩২১
[৩] সহীহ আল - বুখারী ২৩৬৫, সহীহ মুসলিম ২২৪৩
[৪] সহীহ আল - বুখারী ২৩২০, সহীহ মুসলিম ১৫৫২
[৫] হাকেম ২৩৩/৪

৬- শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ সকল কিছুর ব্যাপারে সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যখন তোমরা কোন কিছু হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে তা সম্পাদন করবে। যখন কোন কিছু খাওয়ার জন্য জবেহ করবে, তখন সুন্দরভাবে তা করবে। তোমরা চাকু ধারালো করে নিবে। জবেহ করা জন্তুটিকে প্রশান্তি দেবে।'[১]

৭- ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে যথাযথ কারণ ব্যতীত কোন পাখিকে হত্যা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার হিসাব নেবেন।' জিজ্ঞেস করা হল, 'হে রাসূল! যথাযথ কারণ বলতে কি বুঝায়?' তিনি বললেন, খাওয়ার জন্য জবেহ করা। এমন যেন না হয় যে অযথা জবেহ করে ফেলে দিলে।'[২]

৮- একবার ইবনে উমার রা. কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন ছেলেকে দেখলেন তারা একটি পাখি বা মুরগীকে বেঁধে তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছে। তারা যখন ইবনে উমার রা. কে দেখল তখন সরে পড়ল। ইবনে উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এমন কাজ করেছে? যারা এ রকম কাজ করে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যার প্রাণ আছে, এমন কোন কিছুকে যে লক্ষ্যস্থল করে (তীর বা গুলির জন্য) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিসম্পাত করেছেন।'[৩]

৯- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা একটা প্রয়োজনে দুরে গেলাম। দেখলাম একটি লাল পাখি তার সাথে দুটো বাচ্চা। আমরা বাচ্চা দুটো কে ধরে নিয়ে আসলাম। তখন মা পাখিটি চলে আসল। বাচ্চা দুটোর কাছে আসার জন্য পাখিটি মাটির কাছে অনবরত উড়তে লাগল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[১] সহীহ মুসলিম ১৯৫৫
[২] নাসায়ী ৪৪৪৫
[৩] আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : মুনজিরী

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন। তিনি এ অবস্থা দেখে বললেন, 'কে এ বাচ্চা এনে তাদের মাকে কষ্ট দিচ্ছে? বাচ্চা তার মায়ের কাছে রেখে এসো।' তিনি দেখলেন, আমরা এক পিঁপড়ার ঝাঁককে পুড়িয়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কে এদের আগুন দিয়ে পুড়েছে? উত্তরে বললাম, 'আমরা পুড়েছি।' তিনি বললেন, 'তোমাদের এটা উচিত হয়নি। আগুন দিয়ে শাস্তি দেবেন শুধু আগুনের স্রষ্টা।'[১]

১০- জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার মুখমণ্ডলে লোহা পুড়ে দাগ দেয়া ছিল। তিনি বললেন, 'যে লোহা দিয়ে দাগ দিয়েছে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'

১১- জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তু জানোয়ারের মুখমণ্ডলে আঘাত করতে ও লোহা দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন।[২]

১২- আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে পিছনে বসালেন। আমাকে নিয়ে তিনি এক আনসারী সাহাবীর আঙিনায় প্রবেশ করলেন। সেখানে একটি উট ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে ঢুকরে কেঁদে উঠল ও তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল। উটটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘাড়ে হাত বুলালে সে কান্না থামাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এ উটটির মালিক কে?' এক আনসারী যুবক এসে বলল, 'উটটি আমার ইয়া রাসূলাল্লাহ!' তিনি বললেন, 'তুমি কি জন্তু জানোয়ারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে না, যিনি তোমাকে এর

[১] সহীহ সুনানে আবু দাউদ ১৪৬/২

[২] সহীহ মুসলিম ২১১৬

মালিক বানিয়েছেন? উটটি আমার কাছে নালিশ করছে তুমি তাকে কষ্ট দাও ও সাধ্যের চেয়ে বেশি কাজ চাপিয়ে দাও।'[১]

এগুলো হল কয়েকটি নমুনা মাত্র। যাতে দেখা গেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শত্রুদের প্রতি, বন্ধুদের প্রতি, মুসলমানের প্রতি, অমুসলিমের প্রতি, পুরুষের প্রতি, নারীর প্রতি, ছোটদের প্রতি, বড়দের প্রতি, জন্তু-জানোয়ারের প্রতি, পাখিদের প্রতি, পিঁপড়া ও পোকা মাকড়ের প্রতি কীভাবে দয়া, করুণা, মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। যতদিন রাত দিবস আবর্তিত হতে থাকবে, ততদিন আল্লাহ তার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। আমাদের পক্ষ থেকে হাজারো সালাত ও সালাম তার জন্য নিবেদিত হোক।

ত্রয়োদশ প্রকার : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরের কোমলতা ও বিভিন্ন সময়ে কান্নাকাটি করা-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করতেন না। যেমনিভাবে তিনি অট্টহাসি হাসতেন না। কিন্তু কান্নার সময় তার চোখে অশ্রু দেখা যেত ও বুকের মধ্যে মৃদু আওয়াজ অনুভূত হতো। কখনো তিনি কেঁদেছেন মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে, কখনো কেঁদেছেন তার উম্মতের প্রতি ভয় ও তাদের প্রতি স্নেহ মমতার কারণে। কখনো কেঁদেছেন আল্লাহ তাআলার ভয়ে। আবার কখনো কেঁদেছেন আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত শুনে। আর সে ক্রন্দন ছিল আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর মহত্ত্ব অনুভবে।

যে সকল অবস্থায় তিনি ক্রন্দন করেছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত :

১- রাতের তাহাজ্জুদ নামাজে আল্লাহ তাআলার ভয়ে কান্নাকাটি করেছেন অনেক সময়। বেলাল রা. বলতেন, 'হে রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' তিনি

[১] সহীহ সুনানে আবু দাউদ ১১০/২ , আহমাদ ২০৫/১

বললেন, 'আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? রাতে আমার উপর একটি আয়াত অবতীর্ণ হলো, দুর্ভাগ্য তার, যে তা পাঠ করলো কিন্তু তাতে চিন্তা করলো না। আয়াতটি হল :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনা বলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।"[১]

২- সালাত আদায়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম, দেখলাম তিনি সালাত আদায় করছেন, আর তার বুক থেকে ধুকে ধুকে কান্নার আওয়াজ বের হচ্ছে।[২]

৩- কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় রাসূলের কান্না : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'তুমি আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও।' আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কুরআন শুনাবো অথচ কুরআন আপনার উপর নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অন্যের থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে।'

ইবনে মাসউদ বলেন, 'আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত শুরু করে দিলাম। যখন এ আয়াতে পৌঁছে গেলাম

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

[১] সূরা আলে ইমরান ১৯০, সহীহ ইবনে হিব্বান ৬২০
[২] আবু দাউদ ৯০৪, ও সহীহ মুখতাছার শামায়েলে তিরমিজী ২৭৬

"যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত দাঁড় করাবো তখন কী অবস্থা হবে?"[১]

দেখলাম তার দু চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।[২]

৪- প্রিয়নজনকে হারানোর বেদনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদেছেন। নিজ সন্তান ইবরাহীমের ইন্তেকালে তিনি কেঁদেছেন। তার দু চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়েছে। আব্দুররহমান ইবনে আউফ তা দেখে বললেন, 'হে রাসূল! আপনিও কাঁদছেন?' তিনি বললেন, 'হে আউফের ছেলে! এটা হল দয়া-মমতা . . . চোখ অশ্রু প্রবাহিত করে, অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়, কিন্তু আমরা এমন কথাই বলবো যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! তোমাকে হারানোর বেদনায় আমরা দুঃখে ও শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছি।'[৩]

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ে- উসমান রা. এর স্ত্রী- উম্মে কুলসূম রা. এর ইন্তেকালের কারণে কেঁদেছেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের কাছে বসলেন, দেখলাম তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝড়ছে।[৪]

৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আরেক মেয়ের মৃত্যুতে কেঁদেছেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একটি মেয়ে যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তাকে কোলে তুলে নিলেন। তার কোলেই সে ইন্তেকাল করল। উম্মে আইমান চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহর রাসূলের কাছে বসে চিৎকার করে কাঁদছো!' সে বলল, 'আমি কি আপনাকে কাঁদতে দেখছি না?' তিনি

[১] সূরা আন-নিসা : ৪১
[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৫৮২, সহীহ মুসলিম ৮০০
[৩] সহীহ আল - বুখারী ১৩০৩, সহীহ মুসলিম ২৩১৫
[৪] সহীহ আল - বুখারী ১২৮৫

বললেন, 'আমি আসলে তোমার মত কাঁদছিনা। বরং এটা হল দয়া-মমতার প্রকাশ।'[১]

৭- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক নাতীর ইন্তেকালে কেঁদেছেন। উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার মেয়ের মাধ্যমে খবর পাঠালাম যে, আমার ছেলে মৃত্যু শয্যায়, আপনি আমাদের কাছে একটু আসুন। তিনি আমাকে সালাম পাঠিয়ে বললেন, 'যা আল্লাহ নিয়েছেন তা তাঁরই, তিনি যা দিয়েছেন তাও তাঁর। সকল বিষয়ে তাঁর কাছে রয়েছে একটি নির্ধারিত মেয়াদ।' এরপর তিনি আসলেন। তার সাথে ছিল সাআদ বিন উবাদা, মুআজ বিন জাবাল, উবাই বিন কাআব, যায়েদ বিন সাবেত ও অন্যান্য অনেক সাহাবী। ছেলেটিকে তার কোলে দেয়া হল, তিনি কোলে বসালেন। এমন সময় সে হেঁচকি দিয়ে উঠল, মনে হল সে বিদায় নিল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হল। সাআদ বিন উবাদা দেখে বলে উঠলেন, 'হে রাসূল! এটা কী? (কাঁদছেন কেন) তিনি বললেন, 'এটা হল রহমত-দয়া। যা আল্লাহ মানুষের মধ্যে যাকে চান তার হৃদয়ে দিয়ে থাকেন। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়াশীল তিনি তাদের প্রতি দয়া করেন।'[২]

৮- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গী-সাথিদের ইন্তেকালে কেঁদেছেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান ইবনে মাজঊন ইন্তেকাল করার পর রাসূলুল্লাহ তাকে চুমো দিলেন। আমি দেখলাম তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।' তিরমিজীর বর্ণনায় এসেছে, উসমান ইবনে মাজঊন মৃত্যু বরণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চুমো দিলেন ও কাঁদলেন। তার দু চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।[৩]

[১] আহমদ ২৬৮/১

[২] সহীহ আল - বুখারী ১২৮৪, সহীহ মুসলিম ৯২৩

[৩] সহীহ সুনানে আবু দাউদ ২৮৯/২, তিরমিজী ৯৮৯, ইবনে মাজা ১৪৫৬

৯- মুতার যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য কেঁদেছেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ও জাফরের প্রশংসা করেছেন, তাদের শাহাদাতের খবর আসার পূর্বেই। তিনি বললেন, 'যায়েদ ইবনে হারেসা পতাকা হাতে নিল সে আক্রান্ত হলো। এরপর জাফর পতাকা তুলে নিল সেও আক্রান্ত হল। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে তুলে নিল সেও আক্রান্ত হল- কথাগুলো বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল- শেষে আল্লাহর এক তরবারি সাইফুল্লাহ পতাকা হাতে তুলে নিল, বিজয় হল।'[১]

১০- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কবর যিয়ারতের সময় ক্রন্দন করেছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কবর যিয়ারত করলেন, তখন কাঁদলেন। তার সাথে যারা ছিল তারাও কাঁদল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম, অনুমতি পাওয়া যায়নি। তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম, অনুমতি দেয়া হল। তোমরা কবর যিয়ারত কর, তা তোমাদের মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'[২]

১১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাআদ বিন উবাদার মৃত্যু শয্যায় অসুস্থতা দেখতে যেয়ে কেঁদেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'সাআদ বিন উবাদা রা. রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। তার সাথে আরো ছিলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। যখন তার কাছে পৌছলেন দেখলেন তার পরিবার-পরিজন তার খেদমতে ব্যস্ত।

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪২৬২

[২] সহীহ মুসলিম ১০৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্তেকাল হয়ে গেছে নাকি?' তারা বলল, না, হে রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে শুরু করলেন। অন্যেরা তার কান্না দেখে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তিনি বললেন, 'তোমরা শুনে রাখো! আল্লাহ তাআলা চোখের অশ্রুর কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু তিনি শাস্তি দেবেন এর কারণে।' এ বলে তিনি, মুখের দিকে ইশারা করলেন।[১]

১২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের নিকট কেঁদেছেন। এ ব্যাপারে বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি কবরের কিনারায় বসলেন। অতঃপর তিনি এত কাঁদলেন যে মাটি পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেল। তারপর বললেন, 'হে আমার ভ্রাতাগণ! তোমরা এ কবরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।'[২]

১৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের রাত্রিতে নামাজ পড়ে প্রভুর সাথে গোপন আলাপ ও দু'আ করতে করতে সকাল পর্যন্ত কেঁদেছেন। এ ব্যাপারে আলী বিন আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধে ছিলাম, আমি দেখলাম যে, আমাদের সকলে ঘুমন্ত কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে সকাল পর্যন্ত নামাজ পড়ছেন আর কেঁদেছেন।[৩]

১৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য গ্রহণের নামাজে কেঁদেছেন। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে সূর্য গ্রহণ লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। তারপর সেজদা করলেন। অতঃপর তিনি তখনও মাথা উত্তোলন করেননি এর মধ্যে তিনি ফুঁক দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, নামাজ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু

[১] সহীহ আল - বুখারী ১৩০৪, সহীহ মুসলিম ৯২৪

[২] ইবনে মাজাহ ৪১৯৫

[৩] ইবনে খুযাইমা ২,৮৯৯, আহমাদ ১২৫/১

আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, স্তুতি গাইলেন। অতঃপর বললেন যে, জাহান্নাম আমার সামনে পেশ করা হল তখন আমি তাতে ফুঁক দিতে লাগলাম এবং আশংকা করলাম যে, তা তোমাদের গ্রাস করে নেবে। এ ব্যাপারে আরো বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেন হে প্রভু! তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তুমি তাদের শাস্তি দেবে না।'[১]

১৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দিদের মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে কেঁদেছেন। এ বিষয়ের হাদীস আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. উমার বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন তারা বন্দিদের কয়েদ করল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রা. ও উমার রা. কে বললেন তোমরা এদের ব্যাপারে কি বল? আবু বকর বলল, 'হে আল্লাহর নবী! তারা তো আপনার চাচার বংশধর ও আপনার গোত্রের লোক, তাই আমি মনে করি যে, আপনি তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে নেন। যা দিয়ে আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগাব। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ইসলামের হেদায়েত দান করবেন।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে উমার! তোমার মতামত কি? তিনি বললেন যে, 'আমি বললাম 'না, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর যে মতামত দিয়েছে আমি তার সাথে একমত নই। তবে আমি মনে করি যে, আপনি আমাকে সুযোগ করে দেবেন, আর আমি তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। সুতরাং আলীকে সুযোগ করে দেবেন আকীলকে হত্যা করার, এবং আমাকে অমুক ব্যক্তি যে আমার আত্মীয় তাকে হত্যা করার সুযোগ করে দেবেন। নিশ্চয় তারা কাফেরদের নেতা ও তাদের সরদার।' পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের সিদ্ধান্ত পছন্দ করলেন। আর আমার সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি। পরের দিন যখন আমি আসলাম, তখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. উপবিষ্ট অবস্থায় কাঁদছেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল!

[১] ইবনে খুযাইমা ৯০১

আপনি আমাকে বলুন কেন আপনি ও আপনার বন্ধু কাঁদছেন? যদি আমি কাঁদতে পারি তাহলে কাঁদব আর যদি কাঁদতে না পারি তাহলে আপনাদের ক্রন্দনের মত করে নিজেকে পেশ করব।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যে মুক্তিপণ গ্রহণের কথা তোমার সাথিরা পেশ করেছে তার জন্য কাঁদছি।' অবশ্যই তাদের শাস্তি আমার সামনে পেশ করা হয়েছে এই গাছের থেকে আরো নিকটবর্তী করে যে গাছটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا.

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান আখেরাত। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর আপতিত হত মহা-শাস্তি। সুতরাং যুদ্ধে তোমার যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম হিসাবে গ্রহণ কর।" সূরা আল-আনফাল : ৬৭-৬৯

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য গণীমত হালাল করে দিলেন।[১]

১৬। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে কেঁদেছেন এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্রাহীম আ. সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতখানা আবৃত্তি করলেন :

[১] সহীহ মুসলিম ১৭৬৩

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে প্রভু! নিশ্চয় তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছেন। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলের আর যে আমার অবাধ্য হবে নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়।" সূরা ইবরাহীম : ৩৬

এবং নবী ঈসা আ. বলেছেন।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দা। আর যদি ক্ষমা করে দেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি শক্তিশালী প্রজ্ঞাময়"। সূরা আল-মায়েদা : ১১৮

অতঃপর উভয় হাত উত্তোলন করলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!' এবং কাঁদলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন: "হে জিবরীল তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও আর তোমার প্রভু তার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। তারপর তাকে সালাম দাও এবং বল আপনি কেন কাঁদছেন?" জিবরীল তার নিকট আসলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলে দিলেন যা তিনি বলেছেন, আর আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বেশি জ্ঞাত। আল্লাহ তাআলা বললেন: "হে জিবরীল! মুহাম্মাদের নিকট যাও এবং বল অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে খুশি করব তোমাকে কষ্ট দেয় এমন কিছু করব না।"[১]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিশুদের প্রতি তার সোহাগ এবং তাদের আনন্দদান

[১] সহীহ মুসলিম ২০২

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ক্ষেত্রে মানবতার পূর্ণ শিখরে উপনীত হয়েছেন এই মহৎগুণের মধ্যে রয়েছে শিশুদের প্রতি তার সুন্দর ব্যবহার, যাতে রয়েছে সকলের জন্য আদর্শ। এ পর্যায়ে সাধারণত কেউ উপনীত হতে পারে না। মনোবিজ্ঞানীরাও না, তবে এ সত্ত্বেও মুসলমানের উচিত যতটুকু সম্ভব তার আদেশের অনুকরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহাগ ও কৌতুক করা। এগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত স্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ

মাহমুদ বিন রুবাই এর সাথে তার কৌতুক:

মাহমুদ রা. বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক বারের পানি ছিটানোর কথা; 'তিনি আমার চেহারায় বালতি থেকে পানি ছিটিয়েছেন তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর যা আমার এখনো মনে আছে।'[১]

তিনি এটা করেছেন কৌতুকরত বা বরকত স্বরূপ, যেমনটি তিনি সাহাবীদের সন্তানদের সাথে করতেন। শেখ বিন বায বলেন, 'এটা কৌতুক ও উত্তম চরিত্রের অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।'

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত :

শিশুদের সাথে তার সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও কৌতুক ঃ

জাবের বিন সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলের সাথে ফজরের নামাজ পড়লাম অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে বের হলেন আমিও তার সাথে বের হলাম। পথিমধ্যে তার সাথে কিছু বাচ্চাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদের এক এক করে প্রত্যেকের উভয় গালে হাত বুলাতে লাগলেন।' মাহমুদ রা. বলেন, 'তিনি আমার উভয় গালে হাত বুলালেন

[১] সহীহ আল - বুখারী ৭৭ , সহীহ মুসলিম ৪৫৬/১

আমি তার হাতের হিম শীতল সুগন্ধি উপলব্ধি করলাম। যেন তার হাতের সাথে সুগন্ধি ব্যবসায়ীর সামগ্রীর ছোঁয়া লেগেছে।'[১]

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঃ

বিভিন্ন সময় হাসান ও হুসাইন এর সাথে তার আদর পূর্ণ ব্যবহার ঃ

১। আবু হুরাইরাহ রা. বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান বিন আলীকে চুম্বন করেন তখন তার নিকট আকরাহ বিন হাবেস তামীমী বসা ছিলো। আকরাহ বলল, 'আমার দশটি সন্তান রয়েছে তাদের কাউকে আমি চুম্বন করি না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।'[২]

২। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক গ্রাম্য লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসল এবং বলল তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের চুমো খাও আমরা তাদের চুমো খাই না।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার অন্তরে দয়া উদ্রেক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আল্লাহ তাআলা তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন।'[৩]

৩। হাসান ও হুসাইন রা. রাসূলের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। এ ব্যাপারে ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি, 'তারা আমার পৃথিবীর সুগন্ধিময় দুটি ফুল।'[৪]

অর্থাৎ– আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের দান করেছেন এবং তাদের দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সন্তানদেরকে চুম্বন করা হয় এবং সুঘ্রাণ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সুগন্ধময় ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

[১] সহীহ মুসলিম ২৩২৯
[২] সহীহ আল - বুখারী ৫৯৯৭
[৩] সহীহ আল - বুখারী ৫৯৯৮, সহীহ মুসলিম ২৩১৭
[৪] সহীহ আল - বুখারী ৫৯৯৪

৪। আবু বকরাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারে আরোহণ অবস্থায় তার খুতবা শুনেছি, আর হাসান তার পাশে ছিল। তিনি একবার মানুষের দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার তার দিকে তাকাচ্ছেন এবং বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার এ সন্তান হল নেতা। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে মুসলমানদের বিশাল দু দলের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।'[1]

- পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে মুআবিয়া ও তার সাথিদের এবং আলী বিন আবু তালেব রা. এর অনুসারীদের ও তার সাথিদের মাঝে মীমাংসা করেন। অতএব তিনি খেলাফত মুআবিয়ার জন্য ছেড়ে দেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মুসলমানদের রক্ত হেফাযত করেন।

৫। বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি হাসান বিন আলীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে দেখেছি এবং বলতে দেখেছি, 'হে আল্লাহ আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসবেন।'[2]

চতুর্থ দৃষ্টান্ত:

সেজদা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিঠে বাচ্চার আরোহণ :

- শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন মাগরিব বা এশার নামাজ পড়ানোর জন্য। হাসান বা হুসাইনকে তিনি বহন করছিলেন। অতঃপর তিনি সামনে গেলেন এবং তাকে রাখলেন। এরপর তিনি নামাজের মধ্যে একটি দীর্ঘ সেজদা করলেন। আমার পিতা বলেন যে, 'আমি আমার মাথা উত্তোলন করলাম আর দেখতে পেলাম সেজদাহরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে একটি শিশু। আমি

[1] সহীহ আল - বুখারী ৩৭৪৬

[2] সহীহ আল - বুখারী ৩৭৪৯

আমার সেজদায় ফিরে আসলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ সম্পন্ন করলেন তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি নামাজের মধ্যে একটা দীর্ঘ সেজদা করেছেন, যে কারণে আমরা মনে করলাম হয়তো কোন কিছু হয়েছে অথবা আপনার কাছে ওহী আসছে।' তিনি বললেন, 'এগুলোর কোনটাই হয়নি। তবে আমার একটি সন্তান আমার পিঠে আরোহণ করেছিলো, তাই আমি তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাড়াহুড়ো করতে অপছন্দ করলাম।'[1]

পঞ্চম দৃষ্টান্ত:

উসামার প্রতি তার ভালোবাসা :

উসামা বিন যায়েদ রা. বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধরে তার এক রানে বসাতেন আর হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। অতঃপর তাদের একত্র করতেন এবং বলতেন,

'হে আল্লাহ! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো, কেননা আমি তাদের প্রতি দয়া করি।'[2]

অন্য বর্ণনায় এসেছে

'হে আল্লাহ! আমি তাদের ভালোবাসি সুতরাং আপনিও তাদের ভালোবাসুন।'

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত :

নামাজরত অবস্থায় যয়নব রা. এর মেয়েকে কোলে তুলে নেয়া ঃ

আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়া অবস্থায় উমামা বিনতে যয়নবকে বহন করছিলেন,

[1] নাসায়ী ১১৪২, আহমাদ ৪৯৩/৩

[2] সহীহ আল - বুখারী ৬০০৩

যখন তিনি সেজদা করতেন তখন তাকে রেখে দিতেন। আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কোলে তুলে নিতেন।'[১]

সপ্তম দৃষ্টান্ত :

উম্মে খালেদের সাথে হাবশী ভাষায় কৌতুক ঃ

এ ব্যাপারে উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। আমি আমার বাবার সাথে রাসূলের নিকট আসলাম, তখন আমার গায়ে হলুদ বর্ণের জামা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ছানাহ! ছানাহ!" এটি হাবশী ভাষার শব্দ যার অর্থ ঃ চমৎকার! চমৎকার!

তিনি বলেন– 'অতঃপর আমি নবুওয়তের মোহর নিয়ে খেলা করতে গেলাম। আমাকে আমার পিতা ধমক দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাকে ধমক দিও না।' অতঃপর বলেন 'ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, অতঃপর ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, অতঃপর আবার ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর।' আব্দুল্লাহ বলেন অতঃপর সে যতদিন জীবিত ছিল ততদিন বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।[২] অর্থাৎ বর্ণনাকারী তার দীর্ঘ জীবনের কথা বুঝিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, উম্মে খালেদের মত আর কেহ এত দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি।

অষ্টম দৃষ্টান্ত ঃ

শিশু বাচ্চারা কাঁদার সময় তার নামাজ পড়া সংক্ষিপ্ত করা ঃ

তিনি কোন শিশু বাচ্চার কাঁদার আওয়াজ শুনলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন। এ ব্যাপারে আবু কাতাদাহ তার পিতা হতে ও তার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন আমি নামাজে দাঁড়াই ইচ্ছা

[১] সহীহ আল - বুখারী ৫১৬
[২] সহীহ আল - বুখারী ৩০৭১

থাকে নামাজ দীর্ঘ করব। কিন্তু যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি, তখন তার মায়ের কষ্ট হবে ভেবে আমি নামাজ সংক্ষেপ করি।'[১]

নবম দৃষ্টান্ত ঃ

শিশু বাচ্চাদের তার সালাম দেয়া ঃ

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিশু বাচ্চাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম দিতেন। এবং বলতেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতেন।'[২]

দশম দৃষ্টান্ত ঃ

আবু উমায়ের সাথে তার কৌতুক ঃ

আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রিয় ছিল আমার এক ভাই, তার নাম আবু উমায়ের। আমার মনে আছে, সে যখন এমন শিশু যে মায়ের বুকের দুধ ছেড়েছে মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসতেন এবং বলতেন 'হে আবু উমায়ের! কি করেছে তোমার নুগায়ের?' নুগায়ের হল এমন একটি ছোট পাখি যার সাথে আবু উমায়ের খেলা করত। নুগায়ের মারা গিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নুগায়েরের জন্য চিন্তিত দেখলেন এবং তার সাথে খেলা করলেন।[৩]

একাদশ দৃষ্টান্ত ঃ

তার ডান পার্শ্বে অবস্থানের কারণে বড়দের পূর্বে শিশুদের প্রদান করা

তার ডান পাশের শিশু ছেলেকে বড়দের আগে শরবত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাহল বিন সাআদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক পেয়ালা শরবত আনা

[১] সহীহ আল - বুখারী ৭০৭
[২] সহীহ আল - বুখারী ৬২৪৭, সহীহ মুসলিম ১৭০৮/৪
[৩] সহীহ আল - বুখারী ৬২০৩

হল। তার থেকে তিনি শরবত পান করলেন এবং তার ডান পাশে ছিল দলের সবচেয়ে ছোট একটি ছেলে, আর বড়রা ছিল তার বাম পার্শ্বে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ছেলে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি তা বড়দের আগে দেব?'

ছেলেটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে আমার উপর প্রাধান্য দেব না।' অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে এদের দেয়ার।' ছেলেটি বলল, 'না। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে কিছু লাভ করার ব্যাপারে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেব না। বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ভরে দিলেন।'[১]

দ্বাদশ দৃষ্টান্ত ঃ

রাসূলের কোলে শিশুদের প্রস্রাব

উম্মে কায়স বিনতে মিহসান থেকে বর্ণিত, তিনি তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার কোলে রাখলেন, সে তার কোলে প্রস্রাব করে দিল। তারপর তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং পানি ছিঁটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করেননি।[২]

এ ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা দ্বারা শিশুদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম আচরণ, সুন্দর ব্যবহারের বিষয়গুলোর বর্ণনা রয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৩৫১

[২] সহীহ আল - বুখারী ২২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র

- প্রথমত ঃ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্দর চরিত্র দেখে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের সংখ্যা অগণিত। সেই চরিত্র তার বদান্যতা হোক বা দান হোক অথবা তার ক্ষমা মার্জনা, ধীরতা–সহনশীলতা হোক, কিংবা তা নম্রতা– ধৈর্যশীলতা বা তার ন্যায়পরায়ণতা– বিনয় হোক, বা তার দয়া– দান অথবা শক্তি - বীরত্ব হোক।

অনেক ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্দর চরিত্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিম্নে তার বর্ণনা করা গেল।

(১) মুসলমানের জীবনে সুন্দর চরিত্রের বিষয়টি ব্যাপক, বিশেষ করে আল্লাহর দিকে আহ্বান কারীদের জীবনে গুরুত্ববহ। কারণ এটা হল ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিনদের মধ্যে যার ঈমান যতটা পরিপূর্ণ সে ততটা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।'[১]

(২) সুন্দর চরিত্র সকল সমাজের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী সকলের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

কেননা যে এ সকল চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী হবে সে কেয়ামত দিবসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকবে।

তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আমার নিকটে বসবে যার চরিত্র তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর।'[২]

[১] তিরিমিজী ৪৭৭/৩, আবু দাউদ ২২০/৪

[২] তিরমিজী ৩৭০/৪

কবি যথার্থই বলেছেন :

জাতি সমূহ তত দিন টিকে থাকবে

যতদিন তাদের চরিত্র ঠিক থাকবে ।

আর যদি তাদের চরিত্র সমূহ নষ্ট হয়ে

যায় তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে ।

৪ । সুন্দর চরিত্র সবচেয়ে বড় ইবাদত, সবচেয়ে বড় দান এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বড় সহায়ক । উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া মানুষের প্রধানতম কর্তব্য । বিশেষ করে যারা মানুষকে এর দিকে দাওয়াত দেবে তাদের জন্য তো অবশ্যই । এজন্যই তিনি বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে সুন্দর চরিত্র ।'[১] তিনি আরো বলেছেন, 'নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি সুন্দর চরিত্রের কারণে অব্যাহত সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর সওয়াব লাভ করবে ।'[২]

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'চারটি বিষয় যখন তোমার মধ্যে থাকবে তখন দুনিয়ার প্রাচুর্য তোমার থেকে ছুটে গেলে তোমার কোন অনুতাপ করা উচিত নয় : আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, সৎ চরিত্র ও লোভ–লালসা মুক্ত হওয়া ।'[৩]

এই গুণাবলির মাধ্যমে একজন মুসলিম সমস্ত মঙ্গল ও বরকতের অধিকারী হতে পারে । তিনি আরো বলেছেন, 'পুণ্য হল উত্তম চরিত্র ।'[৪]

৫ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মুসলমানদের সুন্দর চরিত্রের অর্জন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন । বিশেষ করে দাওয়াত-কর্মীদের । তিনি মুআয বিন জাবাল রা. কে ইয়েমেনের গভর্নর, বিচারক ও ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে পাঠানোর সময় সৎ-চরিত্র

[১] আবু দাউদ ২৫৩/৪
[২] আবু দাউদ ২৫২/৪
[৩] আহমাদ ১৭৭/২
[৪] সহীহ মুসলিম ১৯৮০/৪

অবলম্বনের জোরালো আদেশ করে বলেছেন, 'মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর ।'[১]

৬ । সুন্দর চরিত্র একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কেননা আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন এবং এর জন্য তার প্রশংসা করেছেন ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"তুমি ক্ষমা করে যাও এবং সৎ কাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের থেকে ফিরে থাক ।"[২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

'আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত ।'[৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি মানুষের উত্তম চরিত্রগুলো পরিপূর্ণ করার জন্য ।'[৪]

আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করা হল রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে, তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের নবীর চরিত্র সম্পূর্ণ কুরআন ।'[৫]

৭ । সুন্দর চরিত্র ইসলামের দিকে, হেদায়াতের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম । এজন্য রাসূলের চরিত্রে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তিনি সর্বাবস্থায় বিশেষ করে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে সুন্দর চরিত্রের সাথে নিজেকে উপস্থাপন করতেন । ফলে

[১] তিরমিজী ৩৫৫/৪
[২] সূরা আল-আরাফ ১৯৯
[৩] সূরা আল-কলম ৪
[৪] বাইহাকী ১৯২/১০
[৫] সহীহ মুসলিম ৫১৩/১

মানুষ সামনের দিকে আসতে লাগল এবং আল্লাহ তাআলার দয়ায় ও নবীর সুন্দর চরিত্রের কারণে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল।

এবং কত মানুষ যে তার সুন্দর চরিত্রের কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তার হিসাব নাই।

- যেমন একজন বলেছিলেন যে, তোমার চেহারা অপেক্ষা আমার কাছে পৃথিবীতে আর কারো চেহারা এত ঘৃণ্য ছিল না, এখন তোমার চেহারা আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে গেছে।[১]

- অন্য একজন বলেছিল 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদকে দয়া কর, আমাদের সাথে আর কাউকে দয়া কর না।'[২]

এ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমায় এতটা প্রভাবিত হয়েছে যে, সে আল্লাহর রহমত যা সকলের জন্য উন্মুক্ত তাকে নিজের জন্য ও রাসূলের জন্য সীমিত করে দিয়েছে তার প্রার্থনায়। এরপরও রাসূল তাকে কোন কটু কথা বললেন না।

অন্য আরেকজন বলেছিল, 'আমার পিতা– মাতার শপথ! তার পূর্বে ও তার পরে তার চেয়ে উত্তম কোন শিক্ষক আমি দেখিনি।'[৩]

চতুর্থ আরেকজন বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, কেননা মুহাম্মাদ যাকে দান করে সে কখনো অভাবের ভয় করে না।'[৪]

পঞ্চম আরেকজন বলেছিল, 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেয়ার মত দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি আমার নিকট ছিলেন সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট। তিনি আমাকে দান

[১] সহীহ আল - বুখারী ৮৭/৭, সহীহ মুসলিম ১৩৮৬/৩
[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৩৮/১০
[৩] সহীহ মুসলিম ৩৮১/১
[৪] সহীহ মুসলিম ১৮০৬/৪

করতে থাকেন, ফলে তিনি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যান।'[১]

ষষ্ঠ আরেক ব্যক্তি, যাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তম ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি। অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে থেকে অনেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ বিষয়ে আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।'[২]

৮। সুন্দর চরিত্র প্রত্যেক মুসলিম বিশেষ করে সকল সাচ্চা দায়ীর জন্য আবশ্যক। কেননা তার দ্বারা সাধারণ ও অসাধারণ সকল মানুষ সর্বক্ষেত্রে মুক্তি পায় ও সফলতা লাভ করে। এই তাৎপর্যের কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুর নিকট সুন্দর চরিত্রের পথ দেখাতে দু'আ করতেন। রাতের নামাজ শুরু করার সময় বলতেন।

واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت

'তুমি আমাকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর চরিত্রের পথ দেখাও! সুন্দর চরিত্রের পথ একমাত্র তুমিই দেখাতে পার।'[৩]

তিনি আরো বলেছেন, 'তুমি যেমন আমার শরীরের গঠন সুন্দর করেছো, তেমনি তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও।'[৪]

৯। সুন্দর সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি সকল মানুষের কাছে প্রিয় এমন কি শত্রুর কাছেও। সে সকল শ্রেণীর মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে। যেই তার সাথে চলাফেরা করে তাকে ভালবাসে। সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাহায্যে তার মহান উদ্দেশ্য সহজভাবে বুঝাতে পারে। কেননা আল্লাহর পথের

[১] সহীহ মুসলিম ১৮০৬/৪
[২] সহীহ আল - বুখারী ২৯১০, সহীহ মুসলিম, ৮৪৩
[৩] সহীহ মুসলিম ৫৩৪/১
[৪] বাইহাকী, আহমাদ ৬৮/৬

আহ্বানকারীরা তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে না। বরং হাস্যোজ্জল চেহারা ও সুন্দর চরিত্র দিয়েই আকৃষ্ট করে থাকে।

১০। নিশ্চয় যে আহ্বানকারী সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান নয়, তার আহ্বান থেকে মানুষ দূরে সরে যায়।

তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ উপকৃত হয় না। কেননা মানুষের প্রকৃতি এমন যে, তারা অহংকারী ও অবজ্ঞাকারী থেকে কোন কিছু গ্রহণ করে না। আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যথার্থ বলেছেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"আল্লাহ তাআলার রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছো, যদি তুমি কর্কশবাসী কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে, তাহলে তারা তোমার থেকে দূরে সরে যেত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যে কোন বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর।"[১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"মুমিনদের যারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার কর।"[২]

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উপর ইহসান উল্লেখ করে বলেনঃ

[১] সূরা আলে ইমরান ১৫৯
[২] সূরা আশ-শুআরা ২১৫

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল এসেছে যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় কষ্টদায়ক ও তোমাদের কল্যাণকামী এবং মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও দয়ালু।"[১]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন:

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ম'মিনদের উপর ইহসান করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ আবৃতি করেন। তাদের সংশোধন করেন ও তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।"[২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।"[৩]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সাথিরা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর, নিজেরা একে অপরের প্রতি দয়ার্দ্র।"[১]

[১] সূরা আত-তাওবা ১২৮
[২] সূরা আলে ইমরান ১৬৪
[৩] সূরা আল-আম্বিয়া ১০৭

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্য দাতা, শুভসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তুমি ম'মিনদের শুভসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল মর্যাদা রয়েছে।"[২]

ইসলামের দিকে প্রত্যেক আহ্বানকারীর কর্তব্য হল যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ ও ইমাম হিসেবে গ্রহণ করবে।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে আল্লাহ ও আখেরাতের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে তার জন্য।"[৩]

১১। নিশ্চয় উম্মতের সংশোধন, হেদায়েত ও উন্নতি নির্ভর করে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার উৎস থেকে আহরণ এবং বিকৃত ধ্বংসাত্মক চিন্তা ফিকির থেকে দূরে থাকার উপর। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীরা সুন্দর চরিত্র আঁকড়িয়ে ধরলে এ উৎস অনুসারে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান

[১] সূরা আল-ফাতহ ২৯

[২] সূরা আল-আহযাব ৪৫-৪৭

[৩] সূরা আল-আহযাব ২১

করলে ও সে অনুপাতে নিজে আমল করলে তবেই তো নিশ্চিত হবে উন্নতি ও অগ্রগতি। এর অন্যথা কাম্য নয় আল্লাহর কাছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

"হে ঈমানদারগণ! যা তোমরা করোনা তা কেন বলো? তোমরা যা করনা তা তোমাদের বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।"[১]

আল্লাহ তাআলা এ জন্যই কাজের পূর্বে ইলম-জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (سورة محمد : ١٩)

"জেনে রাখ! যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি তোমার জন্য ও সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।"[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"শপথ আসরের! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এবং তারা পরস্পর সত্যের নির্দেশ দেয় এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।"[১]

[১] সূরা আস-সাফ ২-৩

[২] সূরা মুহাম্মাদ ১৯

এখানে সত্যের আহ্বান করার পূর্বে আমল করার কথা বলা হয়েছে।

১২। উত্তম চরিত্র দাওয়াতের ক্ষেত্রে দায়ীকে আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী করে তোলে। তার অনুভূতি গুলো খুলে দেয়। ফলে সে সত্যের ক্ষেত্রগুলো অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায়। আর তখন সে ব্যক্তি, স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি ও মাধ্যম অবলম্বন করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (سورة الأنفال : ٢٩)

"হে ঈমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর, তাহলে তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার উপলব্ধি দান করবেন।"[২]

১৩। দাওয়াতে সুন্দর চরিত্র একটি কার্যকরী পদ্ধতি যা আগুন থেকে মুক্তি দান করে এবং সফলতার শীর্ষ মর্যাদা জান্নাতুন নাঈম এর অধিকারী করে। আর এটাই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পর প্রত্যেক মুসলমানের প্রত্যাশা। এজন্যই এক ব্যক্তিকে রাসূল জিজ্ঞাসা করে বললেন তুমি নামাজের মধ্যে কি বল?

সে বলল আমি নামাজে তাশাহহুদ পড়ার পর আল্লাহর কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।

তিনি বললেন, 'ওহে শুন! আল্লাহর শপথ! তোমার গুঞ্জন কতই না সুন্দর! মুআজের গুঞ্জন নয়। আমরা যেন এমন গুঞ্জন করতে পারি।'[৩]

এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের পর সমস্ত কথা, কাজ ও দাওয়াত সবই জান্নাত লাভ করার জন্য ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই করা হবে।

---

[১] সূরা আল-আসর
[২] সূরা আল-আনফাল ২৯
[৩] আবু দাউদ ৭৯২

- যে নিজ চরিত্রকে সুন্দর করবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে তার জন্য উত্তম বাড়ির যিম্মা নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সত্যের উপর অটল থাকার পরও ঝগড়া বিবাদ পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের প্রান্তে একটি ঘরের দায়িত্ব নিলাম। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা - যদি তা হাসি তামাশার জন্যও হয়ে থাকে- পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘরের দায়িত্ব নিলাম। যে নিজ চরিত্রকে উন্নত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ শিখরে একটি ঘরের দায়িত্ব নিলাম।'[১]

১৪। সুন্দর চরিত্রের কারণেই সবচেয়ে বেশি মুসলমান জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ভীতি ও সুন্দর চরিত্র।'[২] তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয় জাহান্নাম প্রত্যেক সহজ সরল ও কোমল হৃদয়বান ব্যক্তির জন্য হারাম।' এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি তোমাদের কি বলব না তার কথা, যার জন্য জাহান্নাম হারাম ও যে জাহান্নামের জন্য হারাম? সে হল প্রত্যেক সহজ সরল কোমল হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি।'[৩]

দ্বিতীয় ঃ সুন্দর চরিত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল

- সুন্দর চরিত্র একটি পরিব্যাপ্ত বিষয় যার মধ্যে রয়েছে সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা, দানশীলতা, বদান্যতা, ক্ষমা, মার্জনা, দয়া, নম্রতা, ধৈর্য, স্থিতিশীলতা, অবিচলতা, ন্যায়-পরায়ণতা, ইনসাফ, সত্যবাদিতা, সুন্দর ব্যবহার, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, অঙ্গীকার পালন করা, আত্মত্যাগ, করুণা, অভাব প্রকাশ না করা, বিনয়, সাধনা, উৎকর্ষ, কর্ম-উদ্যম, মমতাবোধ, মনুষ্যত্ব বোধ, সাহসিকতা, আমানতদারী, ঐকান্তি

---

[১] আবু দাউদ ৭৮০
[২] তিরমিজী ৩৬৩/৪
[৩] তিরমিজী ৬৫৪/৪

কতা এগুলো যা উল্লেখ করা হলো আল্লাহর পথের আহ্বানে তা সুন্দর চরিত্র নামে আখ্যায়িত।

● যে মহান চরিত্রের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে করেছেন তা হচ্ছে সম্পূর্ণ দীন। আর সুন্দর চরিত্র হল তার একটি অংশ। যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেছেন, আর ইবনু কায়্যিম রহ. মাদারিজুস সালেকীনে বলেছেন সুন্দর চরিত্র চারটি ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো ছাড়া তাকে কল্পনা করা যায় না। ভিতগুলো হলঃ

(১) ধৈর্য (২) ইফফাত বা অভাব মুক্ত ভাব (৩) সাহসিকতা (৪) ন্যায়পরায়ণতা।

এই চারটা গুণ সকল উন্নত চরিত্রের সূচনাস্থল।

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহান সুন্দর চরিত্রসমূহের দিকগুলো নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদান্যতা ও তার মহানুভবতা

বদান্যতা ও মহানুভবতার দশটি স্তর রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(১) আত্মার বদান্যতা ঃ আর এটাই সর্বস্তরের উঁচু মানের বদান্যতা।

(২) নেতৃত্বের বদান্যতা ঃ দাতা তার সাধনা দিয়ে মানুষের উপকার করে। নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়।

(৩) নিজের আরাম আয়েশের বদান্যতা ঃ যিনি অন্যের উপকারের জন্য নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেন।

(৪) ইলম ও তার শিক্ষার বদান্যতা. এটাও উঁচু স্তরের বদান্যতা, যা মাল– সম্পদের বদান্যতা থেকে উত্তম।

(৫) নিজের মান মর্যাদা দিয়ে বদান্যতা. যেমন শাফাআত ও অন্যান্য বিষয়।

(৬) শারীরিক বদান্যতা ঃ বিভিন্নভাবে শরীরের সামর্থ্য ব্যয় করে অন্যের প্রতি বদান্যতা, যেমন দু ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করা ছদকাতুল্য। কোন ব্যক্তিকে যানবাহনে আরোহণে সাহায্য করা, তার পণ্য সামগ্রী তার কাছে তুলে দেয়া বা তার উপর বহন করতে তাকে সাহায্য করা ছদকাতুল্য। সুন্দর কথা বলাও ছদকাতুল্য।

(৭) ক্ষমার বদান্যতা ঃ যেমন কেহ তাকে গালি দিল তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন বা গীবত করল বা তার জন্য অমর্যাদাকর কিছু করল।

(৮) ধৈর্যের বদান্যতা. যেমন ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা, এটা সম্পদ দিয়ে উপকার করার চেয়ে উপকারী।

(৯) সুন্দর চরিত্রের বদান্যতা ঃ যেমন হাস্য-ভাব, সদালাপ, এটা ধৈর্যের বদান্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(১০) মানুষের কাছে পাওনা ছেড়ে দেয়ার বদান্যতা। ফলে তিনি তা আর চাইতেন না।

প্রত্যেক স্তরের বদান্যতার জন্য অন্তরে বিশেষ বিশেষ প্রকারের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আল্লাহ তাআলা দাতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়ার ও কৃপণকে কমিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।

আর আল্লাহ তাআলাই আমাদের শেষ আশ্রয়।

● নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক প্রকারের বদান্যতা ও মহানুভবতার গুণে গুণান্বিত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করে যে বদান্যতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার কতিপয় দিক নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১ম দৃষ্টান্ত ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানে আনাস রা. এর প্রশংসা ঃ

* আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, ইসলামের নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে দান করতেন। তিনি বলেন, তার নিকট এক ব্যক্তি আসল অতঃপর তিনি তাকে দু' পাহাড়ের মাঝখানের সব বকরী দিয়ে দিলেন। এরপর সে তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল এবং বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর কেননা মুহাম্মাদ এমন দান করে যে, সে দারিদ্রতার ভয় করে না।'[১]

এই মহান ঘটনাগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দান ও তার সীমাহীন বদান্যতার প্রমাণ করে।

* তিনি দান করতেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মানুষকে ইসলামের প্রেরণা দেয়ার জন্য ও তাদের আত্ম প্রশান্তির জন্য। প্রথমে কোন ব্যক্তি ইসলাম প্রকাশ করত ইহকালীন সুবিধা ভোগ করার জন্য, অতঃপর আল্লাহ তার রাসূলের আকর্ষণে ও ইসলামের নূরের কারণে তার অন্তর ইসলামের প্রকৃত ঈমানের জন্য খুলে যেত এবং ইসলাম তার অন্তরে গেঁথে যেত। তখন ইসলাম তার নিকট পৃথিবী ও তার মধ্যে যা আছে তা অপেক্ষা উত্তম হয়ে যেত।

২য় দৃষ্টান্ত ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদান্যতা সম্পর্কে সাফওয়ানের প্রশংসা মূলক বর্ণনা:

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অভিযানে বের হলেন, এবং তার সাথে মুসলমানরা বের হল। অতঃপর তারা হুনাইনে যুদ্ধ করলেন, আল্লাহ তাআলা তার দীন ও মুসলমানদের সাহায্য করলেন, সে দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে একশত বকরী দিলেন অতঃপর

[১] সহীহ মুসলিম ১৮০৬/৪

আরো একশত। তারপর আবার একশত, এভাবে মোট তিনশত বকরী দিলেন। সাফওয়ান বলল, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেয়ার মত দিয়েছেন। অথচ তিনি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত। তিনি আমাকে দিতে থাকলেন, এক সময় তিনি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে গেলেন।'

আনাস রা. বলেন কোন কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সুবিধার্থে ইসলাম গ্রহণ করত ইসলাম গ্রহণ মাত্রই তার নিকট তা দুনিয়া ও তার ধন-সম্পদ অপেক্ষায় উত্তম হয়ে যেত।

- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে দুর্বল ঈমান ওয়ালা দেখলে তাকে প্রচুর পরিমাণে দান করতেন। তিনি বলেন, 'আমি যখন কোন ব্যক্তিকে দান করি। তার থেকে আমার অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে। তাহল তাকে যেন উপুর করে আগুনে নিক্ষেপ করা না হয়।'[১] অর্থ্যাত তাকে শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত করা আমার দানের একটি উদ্দেশ্য।এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এক এক জনকে একশো করে উট দিতেন।

৩য় দৃষ্টান্ত ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক মহিলার সাথে যে আচরণ করেছেন

- মুশরিক মহিলা যে পানির মশক নিয়ে যাচ্ছিল তার সাথে রাসূলের মহৎ চরিত্রের বর্ণনাঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মশক থেকে সাহাবীদের পানি পান করার পর সে আগের তুলনায় দু মশক আরো বেশি পানি ভরা অবস্থায় ফিরে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের বললেন তার জন্য যে খেজুর আটা, সাতু আছে তা নিয়ে

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৪০/৩

এসো। তারা তার জন্য অনেক খাদ্য একত্র করলেন এবং তা একটি কাপড়ে রাখলেন, তার উটে তা বহন করিয়ে দিলেন কাপড়টি তার সামনে রাখলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন যে, 'তুমি এগুলো নিয়ে যাও ও তোমার পরিবারকে খেতে দাও। আর জেনে রাখ! আমরা তোমার কিছু কমিয়ে দেয়নি। তোমার থেকে কিছুই গ্রহণ করিনি। আল্লাহই আমাদের পানি পান করিয়েছেন।'

এ ঘটনায় আরো বর্ণিত আছে, যে মহিলাটি তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, 'আমি সবচেয়ে বড় যাদুকরের কাছ থেকে এসেছি অবশ্য তার লোকেরা তাকে নবী বলে জানে।' আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার কারণে একটি সমাজকে হেদায়াত দান করলেন। ফলে সে ও তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল।[১]

আরেক বর্ণনায় আছে যে, মুসলমানরা তার আশে পাশের মুশরিকদের আক্রমণ করত কিন্তু সে এলাকায় তারা আক্রমণ করত না, যেখানে সে মহিলা রয়েছে।

সে মহিলা একদিন তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এই সম্প্রদায় (মুসলিমগন) নিজেদের স্বার্থে তোমাদের দাওয়াত দেয় আমি তা মনে করি না। অতএব তোমরা কি ইসলামের অংশ নিবে?' অতঃপর তারা তার কথা মেনে ইসলাম গ্রহণ করল।[২]

এই মহিলার ইসলাম গ্রহণের দুটি কারণ:

১ম কারণ :

যা সে অবলোকন করেছে: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবারা তার মশক দুটো থেকে থেকে পানি নিয়েছে তবে তার পানি কোন অংশে কমেনি। এটা নবীর অলৌকিকতা যা তার রিসালতের সত্যতার পরিচায়ক।

২য় কারণ :

[১] সহীহ আল - বুখারী ৫৮০/৬
[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৮/১

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদান্যতা: যখন তিনি সাহাবীদের তার জন্য খাদ্য পানীয় একত্র করতে আদেশ করলেন তখন তারা তার জন্য অনেক খাদ্য– পানীয় একত্র করলেন।

আর তার সম্প্রদায় তার কথায় ইসলাম গ্রহণ করল। কারণ, মুসলমানরা নবীর আদেশে তার সম্প্রদায়কে দেখাশোনা করত, তাদের ইসলামে আকৃষ্ট করার জন্য। এটাই পরে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।

এই উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ রাসূলের বদান্যতার কিছু নমুনামাত্র। এ থেকে আমাদের রাসূলের অনুসরণ তার শিক্ষা, দাওয়াতে তার আদর্শ ও সর্বক্ষেত্রে তাকে আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নবম পরিচ্ছেদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায়পরায়ণতা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় স্থান দেয়া হবে, যে দিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। এদের মধ্যে আছেন ন্যায়পরায়ণ শাসক....[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা রহমানের ডান পার্শ্বে নূরের মঞ্চে আরোহণ করবে। আসলে আল্লাহর দুটো হাতই ডান হাত। যে সকল ব্যক্তি তাদের শাসন কার্যে, পরিবার পরিচালনায় ও অধীনস্থদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেছে তারা এ মর্যাদার অধিকারী হবে।'[২]

[১] সহীহ আল - বুখারী ৬৬০, সহীহ মুসলিম ১০৩১
[২] সহীহ মুসলিম ১৮২৭

ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্র হল বিশাল-বিস্তৃত। দেশ শাসনে ন্যায়পরায়ণতা, বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহর আইন ও বিধান প্রয়োগে ন্যায়পরায়ণতা, মানুষের সাথে লেনদেন করার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, মানুষের মধ্যে সালিশ ও মীমাংসার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি, শত্রুদের সাথে আচার-আচরণে ন্যায়পরায়ণতা, সন্তান- সন্ততির ব্যাপারে ন্যায়, স্ত্রী পরিজনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ন্যায় বিচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা একবার চুরি করল। মহিলার এ বিষয়টি কুরাইশদের ভাবিয়ে তুলল। কারণ বংশের দিক দিয়ে সে ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। তারা মহিলার শাস্তি মওকুফ করতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মধ্যস্থ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা বলল যে, 'কে এ বিষয়ে রাসূলের সাথে কথা বলতে পারে?' তারা মত দিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় ব্যক্তি হল উসামা বিন যায়েদ। সে-ই এ দুঃসাহস দেখাতে পারে। অতঃপর এ মহিলাকে রাসূলুল্লাহর দারবারে আনা হল। তারপর তার ব্যাপারে উসামাহ বিন যায়েদ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করলেন। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং বললেন, 'তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ?' অতঃপর উসামা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

এরপর বিকেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, 'শুনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, তাদের মধ্যে কেউ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে শাস্তি ব্যতীত ছেড়ে

দিত। আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আর আমি ঐ সত্ত্বার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দেব।' এরপর সে মহিলার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হল। আয়েশা রা. বলেন, 'সে মহিলা পরে সুন্দর তাওবা করেছে, বিবাহ করেছে। মাঝে মাঝে সে আমার কাছে আসত। আমি তার প্রয়োজনের কথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থাপন করতাম।'[১]

ন্যায়পরায়ণতা হল অন্যায়-অবিচারের বিপরীত। আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন। সকল কথায় ও সকল কাজে। তিনি বলেছেন ঃ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

"যখন তোমরা কথা বলবে ন্যায়সংগতভাবে বলবে, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে হলেও।"[২]

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[৩]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ নোমান ইবনে বশীর ও তার ছেলের ব্যাপারে ঃ

নুমান বিন বশীর মিম্বরে বসে বলেন যে, আমার পিতা আমাকে অতিরিক্ত দান করলেন কিন্তু উমরাহ বিনতে রাওয়াহা অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেয়ে ফয়সালা ব্যতীত আমি এটা মেনে নিব না।' অতঃপর বশীর নবী করীম

[১] সহীহ আল - বুখারী , সহীহ মুসলিম - কিতাবুল হুদুদ
[২] সূরা আল - আনআম ১৫২
[৩] সূরা আন- নিসা ৫৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসলেন এবং বললেন, 'আমি উমরাহ বিনতে রাওয়াহার ঘরে আমার ছেলেকে অতিরিক্ত সম্পদ দান করেছি। অতঃপর সে আমাকে আদেশ করেছে আপনার অনুমোদন নেয়ার জন্য। হে আল্লাহর রাসূল!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি তোমার সব ছেলেকে এভাবে অতিরিক্ত দিয়েছ?' তিনি বললেন, 'না', রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার ছেলেদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ কর।' বশীর ফিরে চলে গেল এবং তার অতিরিক্ত দান ফিরিয়ে নিল।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার কি আরো সন্তান আছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ,আছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি সবাইকে এ রকম দিয়েছো?' বললো, 'না,' রাসূল বললেন, 'তাহলে আমি অন্যায় অবিচারের সাক্ষী হতে পারি না।'[১]

এ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানদের ব্যাপারে ন্যায়-ভিত্তিক আচরণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমাদের শায়খ ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে বায রহ. বলেছেন, এ হাদীস দিয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, সন্তানদের মধ্যে কাউকে বেশি দেয়া জায়েয নয়। এটা তাদের মধ্যে বৈষম্য ও শত্রুতা সৃষ্টির নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঃ স্ত্রী পরিজনের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায়ভিত্তিক আচরণ

স্ত্রীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়পরায়ণতার বাস্তবায়ন করেছেন যথাযথভাবে। তিনি যতটুকু সম্ভব রাত্রি যাপন, খাদ্য-বস্ত্র দান, স্থায়ী বা অস্থায়ী সর্বাবস্থায় সকল

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৫৮৬, সহীহ মুসলিম ১৬২৩,

বিষয়ে তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ সমভাগে ভাগ-বণ্টন করেছেন। তিনি প্রত্যেকের নিকট এক রাত্র করে অবস্থান করতেন। নিজের হাতে যা রয়েছে তা তাদের প্রত্যেকের উপর সমভাবে খরচ করতেন। প্রত্যেকের জন্য একটি করে কক্ষ নির্মাণ করেছেন। যখন তিনি ভ্রমণে যেতেন তখন তাদের মধ্যে লটারি দিতেন। যার ভাগ্যে লটারি আসত তাকে নিয়ে সফরে যেতেন। এ ব্যাপারে তিনি শিথিলতা করতেন না। এ সমতা ছিল তার আমরণ। তার অসুস্থ অবস্থায় তাদের পালা অনুসারে তাকে প্রত্যেক স্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। আর যখন এটা করা অসম্ভব হয়ে গেল, তখন সকলে বুঝে নিল যে, তিনি আয়েশার ঘরে থাকতে চান। তারা সকলে আয়েশার ঘরে চিকিৎসা করার অনুমতি দিল। তিনি সেখানে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অবস্থান করলেন। এত পরিমাণ সমতা রক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছেন এবং বলেন–

اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك لا أملك

'হে আল্লাহ এ হল আমার ভাগ-বণ্টন। যার মালিক আমি। আর আপনি যার মালিক - আমি যার ক্ষমতা রাখি না, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না।"[১]

অর্থ্যাত বৈষয়িক ভাগ-বণ্টনে আমি সমতার বাস্তবায়ন করলাম কিন্তু আমি অন্তরের মালিক নই। কাজেই আমার অন্তর যদি করো প্রতি ঝুঁকে যায় তবে সে জন্য আমাকে আপনি শাস্তি দেবেন না। অন্তরের উপর ক্ষমতা তো আপনারই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক স্ত্রীর দিকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশি ঝুঁকে যেতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন– যার দুজন স্ত্রী রয়েছে অতঃপর সে একটার দিকে বেশি ঝুঁকে যায় সে কেয়ামতের দিন এক পার্শ্ব বাঁকা অবস্থায় উপস্থিত হবে।[২]

[১] আবু দাউদ ২১৩৪, তিরমিজী ১১৪০

[২] আহমাদ ২৪৭/২, আবু দাউদ ২১৩৩

অত্র হাদীসখানার মাধ্যমে যে আন্তরিক টানের ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছাশক্তি কার্যকর, তা হারাম সাব্যস্ত হয়। আর যেটি মানুষের আয়ত্বের বাইরে, সেটি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ্ তাআলা কাউকে সামর্থ্যের বাইরে আদেশ করেন না।"[১]

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"তোমরা আল্লাহকে সামর্থ্য অনুযায়ী ভয় কর।"[২]

তিনি আরো বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

"আর তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মাঝে সমতা বজায় রাখতে পারবে না। অতএব, তোমরা কারো প্রতি পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না, ফলে একজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দেবে।"[৩]

উল্লেখিত হাদীসের সতর্ক বাণী শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে, যে ইচ্ছাকৃত বৈষম্যমূলক আচরণ করে। আর সে কেয়ামত দিবসে মুখের এক পার্শ্ব বক্র অবস্থায় উঠবে। এটি একটি স্পষ্ট শাস্তি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা হলো, যে ব্যক্তি কুমারী নারী বিবাহ করবে, সে সাত দিন একাধারে তার সাথে অবস্থান করবে, এবং এরপর থেকে সকল স্ত্রীদের মাঝে সঙ্গ দেয়ার পালা বণ্টন

[১] সূরা আল-বাকারা : ২৮৬
[২] সূরা আত-তাগাবুন :১৬
[৩] সূরা আন-নিসা : ১২৯

শুরু করবে, যদি তার একাধিক স্ত্রী থাকে। আনাস রা. এর হাদীসে বর্ণিত আছে –

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم.

"কোন ব্যক্তি অন্য স্ত্রী থাকা অবস্থায় যদি কুমারী মেয়ে বিবাহ করে, তার সাথে একাধারে সাত দিন রাত্রিযাপন করবে, অতঃপর পালা বণ্টন শুরু করবে। আর যদি অকুমারী নারী বিবাহ করে, তাহলে তিন দিন অবস্থান করে পালা বণ্টন শুরু করবে।[১] উম্মে সালামা রা. এর বর্ণনা- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে বিবাহ করলেন, তখন তার সাথে তিন দিন অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন, 'তোমার কোন সমস্যা নেই, ইচ্ছা করলে আমি তোমার নিকট সাত দিন থাকতে পারি, তবে তোমার ঘরে সাত দিন রাত্রিযাপন করলে অন্য স্ত্রীদের ঘরেও সাত দিন করে থাকতে হবে।'[২]

আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত– সাওদা বিনতে যামআ রা. স্বীয় দিনটি আয়েশা রা. কে দান করেছেন, ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে নিজের ও সাওদার উভয় দিন তার কাছে যাপন করতেন।[৩]

আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালা বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। খুব কম দিনই তিনি আমাদের সকলের কাছে যেতেন। তবে গভীর মেলা-মেশা করা ব্যতীত সকলের নিকটবর্তী হতেন। সর্বশেষ তার নিকট গিয়ে রাত্রি যাপন করতেন, যার পালা রয়েছে। সাওদা রা. বয়স্ক হয়ে যখন এই আশঙ্কা করলেন যে, রাসূল হয়তোবা তাকে দূরে ঠেলে

[১] সহীহ আল - বুখারী, সহীহ মুসলিম
[২] সহীহ মুসলিম
[৩] সহীহ আল - বুখারী, সহীহ মুসলিম

দেবেন, তখন বলেছিলেন, আমি আমার দিনটি আয়েশাকে দিয়ে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন, আয়েশা রা. বলেন, 'সাওদা এবং তার মত মহিলাদের ব্যাপারেই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় -

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

"যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে রূঢ়তা কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা পরস্পর আপোশ করে নিলে তাদের কোন গুনাহ নেই।"[১]

ইবনে বায রহ. ঘটনাটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, 'এর দ্বারা বুঝা গেল, যদি কোন নারী নিজের অধিকার থেকে সরে আসে তবে তা তার জন্য বৈধ। যেমন স্বামীর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নিজের পাওনা দিনটিকে অন্য একজন সতীনকে দান করে দিতে পারে।

সকল স্ত্রীদের জন্যে সম্মিলিত সময় ছিল আসরের পরের সময়টি। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসর সালাত আদায় করে স্ত্রীদের সান্নিধ্যে যেতেন।[২]

গ্রন্থকার বলেন, আমার শায়েখ ইবনে বায রহ. কে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রের প্রতি দিক-নির্দেশ করে। তিনি ছিলেন স্বীয় পরিবারের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।

তিনি প্রতিদিন আসর সালাতের পর স্ত্রী গণের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের খোঁজ খবর নিতেন। তবে তিনি ঐ সময় তাদের সাথে মেলামেশা করতেন না। অবশ্য কখনও কখনও সকলের সাথে মেলামেশা শেষ করে একবার গোসল করতেন, যেমনটি আনাস রা. এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এটি ছিল বিরল।

---

[১] সূরা আন-নিসা : ১২৮

[২] সহীহ আল - বুখারী

আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ও আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এভাবে সমাধান করা যায় যে, সকল স্ত্রীর সাথে মেলামেশা শেষ করে একবার গোসল করার বিষয়টি খুব কম সময়ই হয়েছিল।

আনাস রা. এর বর্ণনা নিম্নরূপ :

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ও দিনে একই সময়ে এগারো জন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতেন, আনাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হল, 'এটা কি করে সম্ভব?' তিনি বললেন, 'আমরা জানি, তাকে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছে।' সাঈদ রহ. কাতাদার বরাত দিয়ে আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তাতে নয়জন বিবির উল্লেখ রয়েছে।[১]

হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর সমাধানে বলেছেন, স্ত্রীর সংখ্যা নয়জনই ছিল, তবে মারিয়া ও রায়হানা নামে দুইজন বাঁদীকেও নয়জনের সাথে যোগ করে দেয়া হয়েছে। আমার উস্তাদ ইবনে বায রহ. থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'এটি একটি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি। কারণ নয়জন বিবি, তার উপর আবার মারিয়া ও রায়হানা নামে দু'জন বাঁদী।[২] এর দ্বারা বুঝা গেল এক ব্যক্তি একাধিক স্ত্রীর সাথে তাদের যৌথ সময়ের মধ্যে মেলামেশা করতে পারে, এটি শুধু জায়েয ই নয়, বরং এটি সুন্নত । এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ।

আনাস রা. এর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নয়জন স্ত্রীর জন্য দিন ভাগ করা ছিল। তিনি প্রথম স্ত্রীর নিকট নয়দিন পরই যেতেন। তিনি যেদিন সকলের সাথে মেলামেশা করতেন সেদিন সবাই এক বাড়িতে একত্রিত হত।[৩]

আমার উস্তাদ ইবনে বায রহ. বলতেন, প্রতিদিন আসর বাদ সবার সাথে দেখা করতেন সেটি ভিন্ন ব্যাপার। এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সৃষ্টি করতেন এবং সকল

---

[১] সহীহ আল - বুখারী

[২] ফাতহুল বারী

[৩] সহীহ মুসলিম

প্রকার বৈরী ভাব দূর করতেন। কেননা সতীনদের মাঝে দূরত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক। রাতের বেলা সকলে একত্রিত হলে নিজেদের মধ্যে মুহাব্বত বাড়ে। স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ ঠিক রাখার জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তাদের মাঝে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। লটারীতে যার নাম উঠত, সেই তার সাথে সফরে যেত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনসাফ ও উত্তম আখলাকের আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট হয়, যা নিরূপ ঃ

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় অন্য আরেক স্ত্রী পেয়ালায় করে কিছু খাদ্য-দ্রব্য পাঠালেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ঘরে অবস্থানরত, তিনি খাদেমের হাত থেকে পেয়ালা ফেলে দিয়ে তা ভেঙ্গে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাঙ্গা পেয়ালার টুকরো জমা করে তাতে খাবার উঠাতে লাগলেন এবং বললেন, 'তোমাদের মা রাগ করেছে।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমকে আটকে রেখে ওর ঘর থেকে একটি ভাল পেয়ালা নিয়ে, যার পেয়ালা ভাঙ্গা হয়েছে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন, আর ভাঙ্গাটি এ ঘরে রেখে দিলেন।

অত্র হাদীসমূহের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্রের সুমহান দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

দশম পরিচ্ছেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনয় ও নম্রতা

নম্রতা একটি মহৎ গুণ, এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নম্র লোকদের প্রশংসা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ الفرقان

"রহমানের বান্দাগণ যখন যমীনের উপর চলে, তখন তারা খুব নম্র হয়ে চলে। আর যখন মুর্খ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তাদেরকে শান্তির বাণী শুনিয়ে দেয়।"[১]

মুসলমান বিনয়ী হলে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদার আসনে উন্নীত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সদকা করলে সম্পদ কমে না, ক্ষমা করলে আল্লাহ তাআলা সম্মান বাড়িয়ে দেন, আর বিনয়ী হলে মর্যাদা উঁচু করে দেন।'[২]

আর এটি একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের অন্তর প্রশস্ত করে দেয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। নম্র হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলাই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের মাঝে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।[৩] অপরদিকে যে ব্যক্তি মানুষের উপর অহংকার করে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে অপদস্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আবু হুরাইরা রা. ও আবু সায়ীদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অহংকার আল্লাহর পরিচ্ছদ, গর্ব তার চাদর, আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার হক নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব।"[৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অধিক মাত্রায় বিনয়ী। তার বিনয়ের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) আদবা নামক উষ্ট্রীর ঘটনা ঃ আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'আদবা' নামে একটি উষ্ট্রী ছিল।

[১] সূরা আল-ফুরকান : ৬৩
[২] সহীহ মুসলিম : ২৫৮৮
[৩] শরহে নববী (সহীহ সহীহ মুসলিম এব ব্যাখ্যা গ্রন্থ) : ১৬/১৪২
[৪] সহীহ মুসলিম : ২৬২০

তাকে কখনও পরাজিত করা যেত না, একদা কোন এক গ্রাম্য ব্যক্তি তার একটি বাহন এনে সেটিকে পরাজিত করে ফেলল, বিষয়টি মুসলমানদের অনুভূতিকে মারাত্মকভাবে আহত করল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ কোন বস্তু দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে সেটিকে নিচু করে দেন।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন আমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ। তিনি মানুষকে দাওয়াত দেয়ার সময় নম্রতা অবলম্বন করতেন।

(২)আবু মাসঊদ রা. কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিনয়ের বর্ণনা ঃ আবু মাসঊদ রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে কথা বলার সময় ভয়ে কাপতেছিল। রাসূল তাকে বললেন, 'তুমি স্বাভাবিক হয়ে কথা বল, কেননা আমি এমন এক মহিলার ছেলে, যে শুকনো গোশ্‌ত টুকরো টুকরো করে খেয়ে জীবন ধারণ করতো।' হাকেম রহ. জরীর রা. এর বর্ণনায় কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন, তাহল, অতঃপর জরীর রা. এই আয়াত পাঠ করেছেন :

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

"তুমি তাদের প্রতি জোর-জবরদস্তিকারী নও। যে আমার শাস্তির ভয় করে তাকে তুমি কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও।"[২]

অতএব, সকল মানুষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করা অতীব জরুরী। তিনি দাওয়াতী ময়দানে ছিলেন খুবই বিনয়ী। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাদেরকে সালাম দিতেন। ছোট্ট বালিকা তার হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত। তিনি ঘরে থাকা অবস্থায় পরিবারের খেদমত করতেন। ব্যক্তিগত কারণে কারো উপর প্রতিশোধ নিতেন না। জুতা সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। বকরী দোহন করতেন। উটকে ঘাস খাওয়াতেন। চাকর-

[১] সহীহ আল - বুখারী : ৬৫০১
[২] সূরা কাফ : ৪৫

বাকরদের সাথে খাবার খেতেন। মিসকীনদের সাথে উঠাবসা করতেন। বিধবা ও এতিমের সাথে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য হাটতেন। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রথমেই সালাম দিতেন। কেউ দাওয়াত দিলে তা অল্প হলেও গ্রহণ করতেন। মোটকথা তিনি নিজেকে অপদস্ত না করে ছিলেন বিনয়ী। অপচয় না করে ছিলেন দানশীল। ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী, মুমিনদের সামনে আপন বাহুকে ঝুকিয়ে দিতেন।[১]

(৩) অন্য নবীগণকে নিজের উপর মর্যাদা দেয়া ঃ এক ব্যক্তি তাকে বলল: **يا خير البرية** (হে সৃষ্টির সেরা), একথা শুনে তিনি বললেন, 'তিনি ছিলেন ইব্রাহীম আ.।'[২] কারো একথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুসের চেয়ে উত্তম।'[৩] তিনি নবী রাসূলগনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকল মানুষের নেতা এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি নিজেই বলেন: **أنا سيد الناس يوم القيامة** 'কিয়ামত দিবসে আমি হবো মানবজাতির নেতা।'[৪] তা সত্ত্বেও তিনি বিনয় প্রদর্শন করতে যেয়ে এ কথাগুলো বলেছেন।

তার বিনয়ী হওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, তার দরজায় কোন দারোয়ান থাকতনা,[৫] তিনি রুগ্ন ব্যক্তিদের ঝাড়-ফুঁক করতেন, তাদের আরোগ্যের জন্যে দুআ করতেন, ছোট শিশুর মাথায় হাত বুলাতেন, তাদের জন্যে দুআ করতেন,[৬] তিনি তার সাহাবীদের জন্যে সুপারিশ করতেন, এবং তিনি বলতেন, 'তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে, আর আল্লাহ তার নবীর যবানে যা চাইবেন তা-ই ফয়সালা করবেন।'[৭]

[১] মাদারিজুস সালেকীন : ২/৩২৮
[২] সহীহ মুসলিম : ১৩৬৯
[৩] সহীহ আল - বুখারী : ৪৬৩০, সহীহ মুসলিম : ২৩৭৬
[৪] সহীহ আল - বুখারী : ৩৩৪০, সহীহ মুসলিম : ১৯৪
[৫] সহীহ আল - বুখারী : ১২৮৩
[৬] সহীহ আল - বুখারী : ৭২১০
[৭] সহীহ আল - বুখারী : ১৪৩২, সহীহ মুসলিম : ২৬২৭

আনাস রা. কে তিনি আদর ও স্নেহ করে يا بني (হে ছেলে) বলে ডাক দিতেন।[১]

তার বিনয়ী হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হলো ঃ এক মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। এক রাতে সে মারা গেলে লোকজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তাকে দাফন করে ফেলল। আল্লাহর রাসূল তার মৃত্যুর কথা শুনতে পেয়ে বললেন, 'আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও' অতঃপর তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই এ সকল কবরসমূহ কবর বাসীর জন্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমার দুআর মাধ্যমে তাদের কবর আলোকিত করে দেন।'[২]

আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, 'আমি একটানা দশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে ছিলাম, কখনও তিনি আমার কাজে উহ! শব্দও উচ্চারণ করতেন না। যেটি করে ফেলেছি সেটির ব্যাপারে বলতেন না, 'কেন করেছ?' আর যেটি করিনি সেটির ব্যাপারে বলতেন না, 'কেন করনি?' তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[৩]

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধৈর্য ও ক্ষমা

আল্লাহর পথে আহ্বান করতে গিয়ে তিনি ধৈর্য ও ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলোঃ

[১] সহীহ মুসলিম : ২১৫১
[২] সহীহ মুসলিম : ৯৫৬
[৩] সহীহ আল - বুখারী : ৬০৩৮

এক ঃ যে ব্যক্তি বলেছিল, এ বণ্টনে ইনসাফ করা হয়নি, তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ ঃ

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেন। আকরা ইবনে হাবেস রা.কে একশত উট, উয়াইনাকেও তদ্রুপ দিলেন। আরবের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকেও সেদিন বেশি দেয়া হয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি এই বলে মন্তব্য করল যে, 'এ বণ্টনে ইনসাফ করা হয়নি। এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল না।' আমি মনে মনে বললাম, 'আল্লাহর কসম আমি এ সংবাদটি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেব।' আমি সংবাদ দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ ও তার রাসূল ইনসাফ না করলে আর কে আছে ইনসাফ করবে? মূসার উপর আল্লাহ দয়া করুন, তাকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।'[১]

এটি দাওয়াতী ময়দানে ধৈর্য ধারণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিকমত এই ছিল যে, গণীমতের মালসমূহ দুর্বল ঈমানদারদের মাঝে বণ্টন করা, আর মজবুত ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমানের উপর সোপর্দ করা।[২]

দুই ঃ যে বলেছিল : আমরাই এর বেশি উপযুক্ত, তার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ :

আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, আলী ইবনে আবু তালেব রা. ইয়েমেন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে চামড়ার থলে ভর্তি কিছু স্বর্ণ পাঠালেন। সেগুলো তিনি চার জনের মাঝে বণ্টন করলেন; উআইনা ইবনে বদর,[৩] আকরা ইবনে হাবেস, যায়েদ

[১] সহীহ আল - বুখারী : ৩১৫০, সহীহ মুসলিম : ১০৬২
[২] ফাতহুল বারী শরহুল সহীহ আল - বুখারী : ৮/৪৯
[৩] ইনি উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হুযাইফা, ফাতহুল বারী : ৮/৬৮

আল-খাইল,[১] চতুর্থ জন আলকামা[২] অথবা আমের ইবনে তুফায়েল। এক সাহাবী মন্তব্য করলো, 'আমরা তাদের তুলনায় অধিক হকদার।' কথাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কানে পৌঁছলে, তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত মনে কর না? আমি আসমান-যমীনের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আমার নিকট সকাল-সন্ধ্যায় আসমানের সংবাদ আসে।' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যার চোখ দুটো গর্তে ঢুকানো, গাল দুটো উঁচু, কপালটি বহির্গত, ঘন দাড়িযুক্ত, মাথা মুণ্ডানো, লুঙ্গি উপরে তোলা। সে বলল, 'হে রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন! রাসূল বললেন, 'এই হতভাগা, আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে আমি কি যমীনবাসীর মধ্যে অধিক অগ্রগামী নই।' বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর সে ব্যক্তি চলে গেলো, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না?' তিনি বললেন, 'না, সম্ভবত লোকটি নামাজ পড়ে।' খালেদ রা. বললেন, 'এমন অনেক নামাজী আছে, যারা মনে যা নেই তা মুখে বলে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মানুষের অন্তর ও পেট ছিঁড়ে দেখার জন্যে আমি আদিষ্ট হইনি।' অতঃপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে, যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে, তীর যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়ে আসে। আমি যদি তাদেরকে পাই, তাহলে আদ জাতির মত তাদের হত্যা করে ফেলব।'[৩]

এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহনশীলতার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে বিচার করেছেন, অন্তরে কি আছে তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেননি। লোকটি হত্যাযোগ্য অপরাধ

[১] যায়েদ খায়েল ইবনে মুহালহাল আত-তায়ী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যায়েদ আল-খায়ের নামকরণ করেছেন। ফাতহুল বারী :৮/৬৮

[২] তিনি ইবনে উলাছা আল-আমেরী, তিনি ইসলাম গ্রহন করেছেন, এবং সুন্দর ভাবে ইসলামে অটল থেকেছেন। পরবর্তীতে উমর রা. তাকে হাওয়ারেন এলাকার দায়িত্ব দিয়েছেন, ফাতহুল বারী : ৮/৬৮

[৩] সহীহ আল - বুখারী : ৪৩৫১, সহীহ মুসলিম : ১০৬৪

করেছে, কিন্তু তবুও তাকে হত্যা করেননি। যাতে করে মানুষ এ সমালোচনা করার সুযোগ না পায় যে, মুহাম্মাদ তার সাথিদেরকে হত্যা করে, বিশেষ করে লোকটি যখন নামাযী।[১]

তিন : আমের ইবনে তোফাইল রা. এর সাথে আচরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমের ইবনে তোফাইল দাউসী রা. এর সাথে সহনশীলতার যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়। তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কা নগরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তিনি আপন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তিনি সর্বপ্রথম তার পরিবারের মধ্যে দাওয়াত শুরু করলেন, ফলে তার বাবা ও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর তার বংশ ও গোত্রের অন্যান্য লোকজনকে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। কিন্তু কেউই ঈমান গ্রহণ করেনি। তোফাইল রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! দাউস গোত্র ধ্বংস হয়েছে, তারা কুফরী করেছে।'

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তোফাইল ইবনে আমর দাওসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন, 'দাউস গোত্র অস্বীকার করেছে, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দুআ করলেন। লোকজন বলল, 'তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়েত দান কর এবং তাদেরকে আমার কাছে হাজির করে দাও।'[২]

এ কাজটি দাওয়াতী মিশনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধৈর্য ও সহনশীলতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি দাওয়াত অস্বীকারকারীকে শাস্তি প্রদান কিংবা তাদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করার

[১] ফাতহুল বারী শরহুল সহীহ আল - বুখারী : ৮/৬৮

[২] সহীহ আল - বুখারী : ২৯৩৭, সহীহ মুসলিম : ২৫২৪, মুসনাদে আহমদ : ২/২৪৩, বিদায়া-নিহায়া :৬/৩৩৭, সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪০৭

ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেননি। বরং তাদের হেদায়েতের জন্যে দুআ করেছেন। আল্লাহ তার দুআ কবুল করেছেন এবং তিনি স্বীয় ধৈর্য, সহনশীলতা ও তাড়াহুড়া না করার পূর্ণ প্রতিফল পেয়েছেন। ফলে তোফাইল রা. তার গোত্রের লোকজনের নিকট ফিরে গেলেন। নরম ভাষায় তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার ফলে বহু লোক তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর থাকা অবস্থায় তোফাইল তার নিকট আসলেন। পরবর্তীতে দাউস গোত্রের আশি থেকে নব্বইটি পরিবার নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মুসলমানদের সাথে তাদের জন্যেও বরাদ্দ করলেন।'[১] আল্লাহু আকবার।

অতএব, দায়ী ভাইদের ধৈর্য ও সহনশীলতার দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। আর তা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ, অতঃপর নবী-আদর্শের পূর্ণ অনুশীলন ব্যতীত সম্ভব নয়।

চার : যে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তার সাথে

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নজ্দ অভিমুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অভিযানে বের হলাম।[২] আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচুর কাটাযুক্ত বৃক্ষ সম্বলিত উপত্যকায় অবস্থান করলাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নীচে অবতরণ করলেন। তিনি তার তলোয়ারটি গাছের কোন এক ডালে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমাদের কাফেলার লোকজন উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন গাছের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে আমার তলোয়ার হাতে নিয়ে নেয়। সাথে সাথে আমি জাগ্রত হলাম, উঠে দেখি, সে আমার মাথার উপর কোষমুক্ত তলোয়ার

[১] যাদুল মাআদ : ৩/৬২৬

[২] সহীহ সহীহ আল - বুখারীতে স্পষ্টভাবে এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে "যাতুর রিকা" : ৪১৩৬

নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর সে বলল, 'কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ।' অতঃপর দ্বিতীয়বার সে বলল, 'কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ।' একথা শুনে সে তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে ফেললো, এবং বসে পড়লো। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু বললেন না।[১]

আল্লাহু আকবার, এটি কত বড় মহানুভবতা! এটি অন্তরে কত বড় প্রভাব ফেলে! একজন বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ ব্যক্তির হাত থেকে বাঁচালেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিলেন! নিশ্চয় এটি একটি মহান চরিত্র। আল্লাহ সত্যিই বলেছেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এহেন আচরণ লোকটির জীবনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলল, এবং পরবর্তীতে সে মুসলমান হয়েছে এবং তার মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছে।[৩]

পাঁচ : পাদ্রী যায়েদের সাথে তার আচরণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন। রাগের সময় তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। দুর্ব্যবহারকারীর সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। উল্লেখিত উঁচুমানের চরিত্রগুলোই তার দাওয়াত কবুল করা, তার প্রতি ঈমান আনার বিষয় সুগম করে দিয়েছে। ইহুদীদের একজন বড় আলেম যায়েদ ইবনে

[১] সহীহ আল - বুখারী : ২৯১০, সহীহ মুসলিম : ৪/১৭৮৬, আহমদ : ৩/৩১১

[২] সূরা কলম : ৪

[৩] ফাতহুল বারী : ৭/৪২৮, শরহে নববী : ১৫/৪৪

সা'নার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আচরণ দেখিয়েছিলেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ।[১]

একদিন যায়েদ ইবনে সা'না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে তার পাওনা তাগাদা দেয়ার জন্য আসলো । সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাদর ও জামা ধরে সজোড়ে টান মারলো এবং তার সাথে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করলো । আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে রূঢ় চেহারায় তাকালো, এবং বললো, 'হে মুহাম্মাদ, আমার পাওনা পরিশোধ কর, তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর আসলেই টাল-বাহানাকারী গোষ্ঠী ।' সাহাবী উমার রা. তার দিকে তাকালেন, তার চোখদুটো ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রের মত ঐ ব্যক্তির মাথার উপর ঘুরছে । অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! তুমি রাসূলকে যা বলেছো আমি তা শুনেছি এবং তুমি তার সাথে যা আচরণ করেছো, তা আমি দেখেছি । ঐ সত্ত্বার কসম! যিনি তাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করবেন এই ভয় না থাকলে আমি তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা আলাদা করে ফেলতাম । এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার রা. এর দিকে স্থিরতার সাথে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'হে উমার! আমি ও সে তোমার নিকট থেকে এমন কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না । তুমি বরং আমাকে সুন্দরভাবে আদায় করার, এবং তাকে সুন্দরভাবে তাগাদা দেয়ার পরামর্শ দিতে পারতে । হে উমার! তাকে নিয়ে যাও এবং তার পাওনা পরিশোধ করে অতিরিক্ত আরো বিশ সা' খেজুর দিয়ে দাও ।'

এ কাজটিই তাকে ইসলাম গ্রহণ করার উৎসাহ দিয়েছে । অতঃপর সে ঘোষণা দিল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল ।'

[১] হিদায়াতুল মুরশিদীন : ৩৮৪

এ ঘটনার পূর্বে যায়েদ বলত, 'নবুয়্যতীর আলামতসমূহ থেকে কোন একটি আলামত তার চেহারায় ফুটে উঠতে দেখা বাকি ছিল না, তবে দুটি আলামত সম্পর্কে তখনও আমি অবগত হতে পারিনি ।

এক : তার অজ্ঞতার তুলনায় জ্ঞান-গরিমাই বেশি হবে ।

দুই: তার সাথে মূর্খতাসূলভ ব্যবহার তার সহনশীলতা বাড়িয়ে দেবে ।[১]

সে এই ঘটনার মাধ্যমে তা পরীক্ষা করে, এবং তার সম্পর্কে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তেমনটিই পেয়েছে । অতঃপর সে ঈমান আনলো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো, এবং তাবুকের যুদ্ধে অভিযানে শহীদ হল ।[২] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সত্যবাদিতা ও তিনি যে দিকে আহ্বান করছেন তা যে সত্য, এ দুই বিষয়ের উপর আখলাকের মাধ্যমে অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন ।

ষষ্ঠ: মুনাফিক নেতাদের সাথে তার আচরণ :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করলেন, এদিকে আউস ও খাযরাজ গোত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে নেতা বানানোর ব্যাপারে একমত হয়েছিল । এমনকি দুইজন ব্যক্তিও তার মর্যাদার ব্যাপারে মতবিরোধ করেনি । ইতিপূর্বে আউস ও খাযরাজ গোত্র কোন সময় দু'গ্রুপের কারো ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছোতে পারেনি । তারা তাকে মালা পড়িয়ে নেতা বানানোর সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করল । ঠিক এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাদের সম্মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপস্থিত করলেন । যখন মুনাফিক নেতার স্বজাতি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করল, তখন তার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো । এবং সে দেখল তার রাজত্ব ও ক্ষমতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে

[১] ইবনে হাজার রহ. আল-ইসাবা নামক কিতাবে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, : ১/৫৬৬, তাছাড়া ইবনে কাছীর রহ.ও আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে এটি উল্লেখ করেছেন> ২/৩১০ ।

[২] আল-ইসাবা ফী তাময়ীজিস সাহাবা : ১/৫৬৬ ।

চলে যাচ্ছে। সে যখন দেখল, তার স্বজাতি ইসলামে প্রবেশ করছে, তখন সে অপছন্দ করা সত্ত্বেও কপটতা নিয়ে, হিংসা ও বিদ্বেষসহ ইসলামে প্রবেশ করল।[১] সে ইসলাম থেকে মানুষকে বিমুখ করা, মুসলিম জামাআতে ফাটল সৃষ্টি করা ও ইহুদীদের সহযোগিতা করার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করল না।

ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে তার বিদ্বেষের বিষয়টি ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ মুনাফেকী অবস্থায়। নবী করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিষয়টি ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে নিতেন। কেননা সে ইসলাম প্রকাশ করেছিল। তাছাড়া তার অনেক মুনাফিক সাথি-সঙ্গী ছিল। সে ছিল তাদের নেতা। আর তারা ছিল তার অনুসারী। নবী করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা ও কাজে তার প্রতি অনুগ্রহ করতেন, এবং অনেক সময় তার দুর্ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতেন। নিম্নে এ রকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হল ঃ

১- ইহুদী সম্প্রদায় বনু কুরাইযা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পর তাদের জন্য সুপারিশ করা

বদর যুদ্ধের পর বাজারে জনৈক মুসলিম মহিলার পোশাক খুলে ফেলা উন্মুক্ত এবং এ মহিলাকে সাহায্য করার কারণে একজন মুসলমানকে খুন করার মাধ্যমে বনু কুরাইযা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের বিশ মাস পর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি শনিবার তাদের কাছে গেলেন, তাদেরকে পনেরো দিন বন্দি করে রাখলেন এবং তারা তাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল। তিনি খুব কঠিনভাবে তাদেরকে অবরোধ করলেন। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিদ্ধান্ত মেনে নেমে আসল। রাসূলের নির্দেশে তাদের উভয় হাত পিছনে বেধে দেয়া হল। তারা ছিল সাত শত জন যোদ্ধা। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/২১৬, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/১৫৭।
[২] সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/৪২৭, আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৪।

উবাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজির হয়ে বলল, 'হে মুহাম্মাদ আমার গোলামদের উপর দয়া কর।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিতে দেরি করলে সে আবার বলল, 'হে মুহাম্মাদ তুমি তাদের উপর দয়া কর।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, সে রাসূলের বর্ম-পোশাকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল এবং বলল, যতক্ষণ তুমি আমার লোকদের উপর দয়া না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না। (তাদের মধ্যে চার শত জন ছিল বর্ম পোশাক বিহীন, আর তিন শত জন বর্ম-পোশাক পরিহিত।) তারা আমাকে লাল ও কালো জাতি থেকে হেফাযত করেছে। আর তুমি তাদেরকে এক সকালেই আমার থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও? আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি অশুভ পরিণতির ভয় করছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাতিরে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন।[১] তাদেরকে মদীনা থেকে বের হওয়ার এবং এর নিকটে বসবাস না করার আদেশ করলেন। ফলে তারা সিরিয়ার আযরাআতে চলে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাল সম্পদ গণীমত হিসাবে তার এক পঞ্চমাংশ আয়ত্ব করে নিলেন।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহেন সুপারিশের দরুন তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। বরং ক্ষমা করে দিলেন।

২- উহুদ যুদ্ধে রাসূলের সাথে তার আচরণ ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে বের হলেন। তিনি যখন মদীনা ও ওহুদের মাঝামাঝি পৌঁছলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ সেনা নিয়ে আলাদা হয়ে গেল, এবং তাদেরকে নিয়ে মদীনায় চলে আসল। জাবের রা. এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম তাদের পিছনে পিছনে গেলেন। অতঃপর তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন ও পুনরায় ফিরে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দিলেন। এবং তিনি বললেন, 'চলে এসো এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। অথবা

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/৪২৮, বিদায়া-নিহায়া : ৪/৪।
[২] যাদুল মাআদ : ৩/১২৬।

শত্রুদেরকে প্রতিহত কর।' তারা বলল, 'আমরা যদি জানতাম তোমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবে, তাহলে ফিরে যেতাম না।' অতঃপর তাদেরকে নিন্দাবাদ করে তাদেরকে রেখে ফিরে এলেন।[১] এত বড় অপরাধ সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন শাস্তি দিলেন না।

৩- আল্লাহর প্রতি আহ্বান করা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাধা প্রদান ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদা রা. কে দেখতে গেলেন। পথিমধ্যে আল্লাহর শত্রু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তখন তার সাথে স্বীয় কওমের লোকজন উপস্থিত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহন থেকে নামলেন এবং সালাম করলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ বসলেন। তিনি কুরআন তেলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন। আল্লাহর কথা স্মরণ করালেন। ভয় দেখালেন ও সুসংবাদ দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা শেষ করলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দাঁড়িয়ে বলল, 'হে ব্যক্তি (নবী) আমি তোমার কথাগুলো ভালভাবে মেনে নিতে পারছি না। এগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি বাড়িতে বসে থাকলেই তো চলে। তোমার কাছে যারা আসে শুধুমাত্র তাদেরকেই এগুলো বয়ান করে শুনাও। তোমার কাছে যে আসে না, তাকে তুমি বিরক্ত কর না। কারো মজলিসে এমন কিছু নিয়ে এসো না যা সে অপছন্দ করে।'[২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাজেও তাকে পাকড়াও করলেন না। বরং ক্ষমা করে দিলেন।

৪- বনী নযীরকে আপন ভূমিতে বহাল রাখার চেষ্টা করা :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ইচ্ছা করে বনু নযীর যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করল, তখন তিনি তাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তারা যেন এ

[১] যাদুল মাআদ : ৩/১৯৪, সীরাতে ইবনে হিশাম : ৩/৮, বিদায়া-নিহায়া : ৪/৫১।

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/২১৮।

শহর ছেড়ে চলে যায়। এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে মুনাফিকরা বলে পাঠাল, তোমরা আপন জায়গায় থাক। নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করব না। যদি তোমরা যুদ্ধের সম্মুখীন হও, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব। যদি তোমাদেরকে বের কের দেয়া হয়, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব। ফলে ইহুদীদের মনোবল আরো চাঙ্গা হয়ে গেল। তারা চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতা করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে অবরোধ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেশান্তর করলেন। তারা খায়বর গিয়ে আশ্রয় নিল। আর তাদের কেউ কেউ সিরিয়ায় চলে গেল।[১] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এহেন নিকৃষ্ট তৎপরতার কোন শাস্তি দিলেন না।

৫- মুরাইসি যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানেদের সাথে চক্রান্ত ও বিশ্বাস ঘাতকতা ঃ

এ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমন একটি অপমানজনক কাজ করেছে, যার কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায় ঃ

প্রথমত ঃ মুনাফিকরা এ যুদ্ধে আয়েশা রা. এর প্রতি অপবাদ রচনা করে। যার নেতৃত্বে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।[২]

দ্বিতীয়ত : এ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যা বলেছিল আল-কুরআনে তা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম : ৩/১৯২,আল বিদায় ওয়ান নিহায়া : ৪/৭৫, যাদুল মাআদ : ৩/১২৭।

[২] সহীহ আল - বুখারী : ৪১৪১, সহীহ মুসলিম : ২৭৭০, যাদুল মাআদ : ৩/২৫৬।

‘তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, আমাদের মধ্যে সম্মানিত লোকেরা লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে ।”[১]

তৃতীয়তঃ এ যুদ্ধে আল্লাহর দুশমন যা বলেছিল আল-কুরআনে তা উল্লেখ করা হয়েছে :

لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِّ حَتَّى يَنْفَضُّوا

“আল্লাহর রাসূলের নিকট যারা রয়েছে তাদের জন্য তোমরা খরচ কর না, যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ।”[২]

এর অনেক পর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম-কৌশল আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হল । আর উদ্ভাসিত হল ফেৎনার আগুন নিভিয়ে ফেলা ও অকল্যাণের মূলোৎপাটনের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শিক রাজনীতি । সন্দেহ নেই, আল্লাহর অনুগ্রহ, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যাপারে তার দূরদর্শিতা, তার প্রতি তাঁর সহনশীলতা, তার প্রতি অনুগ্রহ এবং অপমানকর অবস্থানের মোকাবিলায় মুনাফিক নেতাকে ক্ষমা করে দেয়া এ সবগুলোর পিছনে ছিল নানাবিধ হিকমত ও কৌশল ।

আর তা হলো ঃ এ ব্যক্তির অনেক ভক্ত ছিল, ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভয় ছিল । তাছাড়া সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমান ছিল, আর এ কারণেই যখন উমার ইবনে খাত্তাব রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন, আমি এ মুনাফিক সর্দারের মাথা উড়িয়ে দিই ।’

তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, ‘তাকে ছেড়ে দাও, যাতে করে লোকেরা বলাবলি করতে না পারে যে, মুহাম্মাদ নিজ সাথিদের হত্যা করে ।’[৩]

[১] সূরা মুনাফিকুন : ৮ ।
[২] সূরা মুনাফিকুন : ৭ ।
[৩] সহীহ আল - বুখারী , হাদীস নং (৪৯০৫) ও সহীহ মুসলিম , হাদীস নং (২৫৮৪) ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাকে হত্যা করতেন তাহলে সেটি লোকদের ইসলামে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে আতঙ্ক সৃষ্টি করত । কারণ লোকেরা আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে মুসলিম বলেই জানত । তখন তারা বলত, মুহাম্মাদ মুসলমানদের হত্যা করে । তাতে করে নতুন ভাবে বিশৃঙ্খলার জন্ম নিত আর জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হত ।

এখানে চিন্তা করলে দেখা যাবে নবীজীর পক্ষ থেকে ইসলামের ঐক্য ও শক্তি সুদৃঢ় রাখার প্রত্যয়ে এবং বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকায় ছোট খাট সমস্যার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও প্রজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে । তাছাড়া তাকে প্রকাশ্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর ভিতরগত বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত করতে আদেশ দিয়েছেন ।

আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা না করার তাৎপর্য কি, এটি উমার রা. প্রথম প্রথম বুঝতে পারেননি, তবে কিছুদিন পরে বুঝে আসে । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অধিক বরকতময় ও কল্যাণকর ।’[১]

এভাবেই আল্লাহর পথে প্রত্যেক দাওয়াত-কর্মীকে নিজ নিজ দাওয়াতী কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে হিকমত ও প্রজ্ঞার রাস্তা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় ।

সপ্তম দৃষ্টান্ত ঃ ছুমামাহ বিন উসালের সাথে ঃ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল অশ্বারোহীকে নজদ অভিমুখে অভিযানে প্রেরণ করেন । তারা বনী হানীফের একলোককে ধরে নিয়ে আসল । যার নাম ছিল, ‘ছুমামাহ বিন উসাল ।’ সে ছিল ইয়ামামাবাসীদের নেতা ।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১৮৫, শরহে নববী ১৬/১৩৯ ।

তারা তাকে মসজিদের একটি খুটিতে বেঁধে রাখল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ছুমামাহ! আমাদের সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?' সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট আপনাদের সম্পর্কে ভাল ধারণাই আছে। যদি আপনি হত্যা করেন, তাহলে হত্যাপোযুক্ত লোককেই হত্যা করবেন। আর যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ লোককেই অনুগ্রহ করবেন। আর আপনি যদি অর্থকড়ি নিতে চান তাহলে বলুন, আপনার ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করা হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রেখে চলে গেলেন। যখন পরের দিন আবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ছুমামাহ! আমাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' উত্তরে সে বলল, 'আগে যা বলেছি তা–ই, যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই অনুগ্রহ করবেন। আর যদি হত্যা করেন তাহলে হত্যাযোগ্য লোককেই হত্যা করবেন। আর যদি অর্থ-কড়ি নিতে চান তাহলে বলুন, আপনার ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করা হবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রেখে চলে গলেন। যখন পরের দিন আসল, তখন বললেন, 'হে ছুমামাহ আমাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' উত্তরে সে বলল, 'আগে যা বলেছি তা–ই, যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই অনুগ্রহ করবেন। আর যদি হত্যা করেন, তাহলে হত্যাযোগ্য লোককেই হত্যা করবেন। আর যদি অর্থকড়ি নিতে চান তাহলে বলুন, আপনার ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করা হবে।'

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা ছুমামাহকে মুক্ত করে দাও।' মুক্তি পেয়ে সে মসজিদের নিকটস্থ একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বলল, 'আশহাদু আল লা ইলাহা... আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, পৃথিবীর বুকে আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অধিক ঘৃণিত কোন

চেহারা ছিল না। আর এখন আপনার চেহারা অন্য সকল চেহারা অপেক্ষা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার নিকট আপনার ধর্ম অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আর কোন ধর্ম ছিলনা, আর এখন আপনার ধর্ম অন্য সকল ধর্ম থেকে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার শহরই আমার নিকট ছিল সর্বাধিক ঘৃণিত শহর। আর এখন সেটিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হয়ে গেছে। আপনার প্রেরিত অশ্বারোহী বাহিনী যখন আমাকে গ্রেফতার করেছে তখন আমি উমরা পালনের নিয়ত করেছিলাম। আপনি এ বিষয়ে কি নির্দেশনা দেবেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দান করলেন এবং উমরা পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনি মক্কায় আগমন করলে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে?' উত্তরে সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম বরং আমি রাসূলুল্লাহর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, 'এখন থেকে রাসূলুল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত ইয়ামামাহ থেকে তোমাদের কাছে এক দানা গমও আর আসবে না।'[১]

অতঃপর তিনি ইয়ামামায় চলে যান এবং ইয়ামামাবাসীকে মক্কায় কিছু রপ্তানি করতে নিষেধ করে দেন। এ অবস্থা দেখে মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহর নিকট লিখল যে, 'তুমি আত্মীয়তা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে থাক, অথচ সে তুমিই আমাদের সাথে বন্ধন ছিন্ন করে দিলে। তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছ। আর আমাদের সন্তানদের মারছ অনাহারে।' চিঠি পেয়ে রাসূলুল্লাহ ছুমামাহকে খাদ্য রপ্তানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার নির্দেশ পাঠালেন।[২]

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. উল্লেখ করেছেন ঃ

ইবনে মাজাহ নিজ সনদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'ছুমামাহর ইসলাম গ্রহণ, ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তন, কুরাইশদের নিকট

---

[১] সহীহ আল - বুখারী (৪৩৭২) ও সহীহ মুসলিম (১৭৬৪)।
[২] সীরাতে ইবনে হিশাম ৪/৩১৭ ও ফাতহুল বারী ৮/৮৮

রসদ–সামগ্রী প্রেরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেনঃ

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

"আমি তাদের আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলাম। কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার তরে নত হলো না এবং কাকতি – মিনতিও করল না।"{সূরা মুমিনূন:৭৬}[১]

ইয়ামামাহ বাসীরা যখন স্বধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তখন ছুমামাহ রা. নিজ ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি এবং তার সম্প্রদায়ের যারা তার অনুসরণ করেছিল, তারা ইয়ামামাহ ছেড়ে এসে আলী আল - হাদরামীর সাথে মিশে বাহরাইনের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

'আল্লাহু আকবার' কি চমৎকার সহনশীলতা ছিল নবী মুহাম্মাদের! কত উর্দ্ধে ছিল তার চিন্তা–চেতনা ও অবস্থান। তিনি অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যাদের ইসলাম ও হেদায়াত কামনা করতেন। তাদের মন রক্ষার চেষ্টা করতেন। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ অব্যাহত রাখতেন। যাতে তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের অনুসারীবৃন্দও ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয় এবং ক্রমাগত ইসলামে দীক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এমনি করেই প্রত্যেক দাওয়াত কর্মীর কর্তব্য হবে সহনশীলতা ও অন্যায়কারীকে ক্ষমা করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা। কেননা ছুমামাহ শপথ করে বলেছে তার ঘৃণা মুহুর্তের মধ্যে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যখন সে দেখল, নবীজী তার সামনে কত সুন্দর করে সহনশীলতা, ক্ষমা ও বিনিময় বিহীন অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

[১] ইবনে হাজার বলেন: এর সনদ জাইয়্যেদ , দেখুন আল ইসাবাহ ... ৭/২০৩

আর এ ক্ষমা ও উদারতা ছুমামার জীবনে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ইসলামের প্রতি অন্যদেরকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।[১]

এজন্যেই তিনি বলেছিলেন:

أهم بترك القول ثم يردني - إلى القول إنعام النبي محمد

شكرت له فكي من الغل بعدما - رأيت خيالا من حسام مهند

'কথা বলব না বলে পণ করি আমি তবে – মুহাম্মাদী করুণা সংকল্প ভাংতে বাধ্য করে মোরে।

ভারতে তৈরি ধারালো তলোয়ার দেখে, ছায়ামূর্তি (মৃত্যু) প্রত্যক্ষ করলাম, বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।'

অষ্টম দৃষ্টান্তঃ যে বেদুইন রাসূলুল্লাহকে চাদরসহ টান মেরেছিল তার সাথে তাঁর সহনশীল আচরণ

সাহাবী আনাস রা. বলেন, 'আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলছিলাম, তার গায়ে গাঢ় পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর ছিল। পথিমধ্যে এক বেদুইন তাকে কাছে পেয়ে চাদর ধরে প্রচণ্ড জোরে টান মারল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, টানের তীব্রতার কারণে চাদরের পাড়ের মোটা অংশ তার কাঁধে দাগ সেঁটে দিয়েছে। অতঃপর সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত যে সম্পদ রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[২]

এটিই হচ্ছে নবীজীর চমকপ্রদ ও উৎকর্ষপূর্ণ সহনশীলতা, উন্নততর চরিত্র, উত্তম ক্ষমা প্রদর্শন, নিজ জীবন ও সম্পদে আপতিত বিপদে ধৈর্য ধারণ

[১] শারহু সহীহ মুসলিম লিন্নববী (১২/৮৯ ও ফাতহুল বারী (৮/৮৮)

[২] সহীহ আল-সহীহ আল - বুখারী হাদীস নং (৩১৪৯) ও সহীহ মৃসলিম (১০৫৭)।

এবং ইসলামপ্রিয় সহজ সরল ব্যক্তিবর্গের সাথে মার্জনাপূর্ণ অনুকরণীয় আদর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতকর্মীদের এ আদর্শের অনুকরণ একান্ত জরুরী। আরো জরুরী হচ্ছে তার সহনশীলতা, মার্জনাপূর্ণ সদাচরণ, ক্ষমা, উদারতা, প্রসন্ন মানসিকতা এবং দীন ইসলামের উপর আপতিত আঘাত উত্তম পদ্ধতিতে প্রতিহত করা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।[১]

নবম দৃষ্টান্ত ঃ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা বুঝে না

তার সহনশীলতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তাকে যারা বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে, অকথ্য নির্যাতন করেছে তাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করেননি। তাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার ছিল এবং এতে আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সহনশীল, প্রজ্ঞাময়। দূরদর্শী চিন্তা চেতনা নিয়ে কাজ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল সুদূর প্রসারী। আর সেটি হচ্ছে তাদের অথবা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ইসলাম গ্রহণের আকাংখা। এ জন্যেইতো আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন,

'আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ পানে তাকিয়ে আছি। তিনি জনৈক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন, তার কওম তাকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলেছে আর তিনি নিজ মুখাবয়ব থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন,

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

'হে আল্লাহ আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।'[২]

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সহনশীলতার প্রশংসা করেছেন এবং তাকে অনেক বড় করে দেখেছেন। যেমন সাহাবী আশজ্জ আব্দুল কায়সকে বলেন :

[১] ফাতহুল বারী ১০/৫০৬ শারহু সহীহ মুসলিম লিন নববী ৭/১৪৬,১৪৭
[২] সহীহ আল - বুখারী (৩৪৭৭) ও সহীহ মুসলিম (১৭৯২)

إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم و الأناة .

'নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টো স্বভাব বিদ্যমান যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন: সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা'।[১]

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে:

আশজ্জ জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ উক্ত সভাবদ্বয় কি আমিই অর্জন করেছি, না আল্লাহ আমার স্বভাবে প্রোথিত করে দিয়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'বরং আল্লাহ তাআলাই তোমার স্বভাবে সেগুলো জুড়ে দিয়েছেন।' তখন তিনি বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমার মধ্যে এমন দু'টো স্বভাব জুড়ে দিয়েছেন, যেগুলো আল্লাহ ও তার রাসূল পছন্দ করেন।'[২]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সহনশীলতা পছন্দ করতেন এবং তা নিজের মধ্যে তা লালন করতেন।

দশম দৃষ্টান্তঃ যে ইহুদী তাকে যাদু করেছিল তাকে তাকে ক্ষমা করে দেয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষমা প্রদর্শনের অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত হল, যাদুকারী ইহুদীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন। যে তাঁকে যাদু করেছিল। তিনি কখনোই সে ইহুদীকে এ সম্পর্কে কিছু বলেননি এবং সেও তার চেহারায় মৃত্যু-পূর্ব পর্যন্ত কখনো কোন (বিরক্তিকর) কিছু দেখতে পায়নি।[৩]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃঢ়তা ও ধীরস্থিরতা

[১] সহীহ মুসলিম (১৭/২৫)
[২] বর্ণনায় আবু দাউদ , হাদীস নং (৫২২৫) এবং আহমদ (৪/২০৬ ও ৩/২৩)
[৩] বর্ণনায় আহমাদ (১৯২৮৬)

একজন দাওয়াত-কর্মীর পক্ষে তার সকল কর্মে এবং সর্ব বিষয়ে ধৈর্য, সহনশীলতা ও দৃঢ়তার নীতি গ্রহণ করা ব্যতীত নিজ দাওয়াত কর্মে সফল হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সর্ব কাজে ধীরতা ও দৃঢ়তার নীতি অবলম্বন করেছেন । অনেক নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।

প্রথম দৃষ্টান্তঃ উসামা বিন যায়েদ রা. এর সাথে

সাহাবী উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জুহায়নার হারাকাহ নামকস্থানে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা প্রত্যুষে তাদের উপর চড়াও হয়েছি এবং পরাভূতও করে ফেলেছি। তিনি বলেন, আমি এবং জনৈক আনসারী সাহাবী তাদের একজনকে আঘাত করলাম। অতঃপর তাকে যখন আমরা বেষ্টন করে ফেললাম। সে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলেন, এরপর আনসারী বিরত হয়ে গেল আর আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। আমরা মদীনায় ফিরে আসলে এ খবর নবীজীর নিকট পৌঁছে গেল। তিনি আমাকে বললেন, 'হে উসামা! সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সেতো এটি জীবন রক্ষার্থে বলেছে।' তিনি তারপরও বললেন, 'তুমি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে?' উসামা বলেন, 'নবীজী একথাটি বার বার বলে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে আমি এ বলে আফসোস করেছিলাম! আহ্! আমি যদি সেদিনের আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম।'[১]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সে এটি অস্ত্রের ভয়ে বলেছে।' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি তার বক্ষ

[১] সহীহ আল - বুখারী , কিতাবুল মাগাযী। হাদীস নং (৪২৬৯) এবং সহীহ মুসলিম , কিতাবুল ঈমান। হাদীস নং (১৫৯)

বিদীর্ণ করলে না কেন? তাহলে তো জানতে পারতে সেটি সে সত্যিকারার্থে অন্তর দিয়ে বলেছিল কিনা।'[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কেয়ামত দিবসে যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উপস্থিত হবে তখন তুমি তার সাথে কি করবে?' আমি বললাম, 'আপনি আমার জন্যে গুনাহ মাফের দু'আ করুন।' তিনি বললেন, 'কেয়ামত দিবসে যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উপস্থিত হবে তখন তুমি তার সাথে কি করবে?' এরপর রাসূলুল্লাহ ক্রমাগত এটিই বলে যেতে থাকলেন, অন্য কিছু বলেননি। 'কেয়ামত দিবসে যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উপস্থিত হবে তখন তুমি তার সাথে কি করবে।'[২]

তাইতো নবীজীই ছিলেন দৃঢ়তা ও ধীরস্থিরতার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় ব্যক্তিত্ব। তিনি কোন কাফেরকে - তারা আর ইসলাম গ্রহণ করবে না মর্মে – যথেষ্ট রূপে নিশ্চিত না হয়ে হত্যার সিদ্ধান্ত নিতেন না।

আনাস বিন মালেক রা. বলেন, 'নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে একমাত্র সকাল বেলা এবং যথেষ্ট পরিমাণে অপেক্ষা করার পর অভিযান শুরু করতেন। যদি সেখানে আযান শুনতেন, তাহলে যুদ্ধ হতে বিরত হয়ে যেতেন। আর যদি আযান না শুনতেন, তাহলে তাদের উপর হামলা করতেন... ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ যুদ্ধের প্রাক্কালে

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে তাদের দাওয়াত কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে ধীরতা ও স্থিরতার প্রশিক্ষণ দান করতেন। তার প্রশিক্ষণের একটি দিক যেমন, তিনি কোন বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করলে দলনেতাকে এ মর্মে পরামর্শ দিতেনঃ

তুমি দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদের নিম্নোক্ত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান করবে।

[১] সহীহ মুসলিম , কিতাবুল ঈমান। হদীস নং (৯৭)।
[২] সহীহ মুসলিম , কিতাবুল ঈমান। হদীস নং (৯৭)।

(ক) ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতের প্রতি অথবা হিজরত ছাড়া ইসলাম গ্রহণের প্রতি । এবং তারা হবে (অধিকারের দিক দিয়ে) গ্রাম্য–বেদুইন মুসলমান সমতুল্য ।

(খ) যদি তারা এতে সম্মত না হয় তাহলে জিযিয়া – কর আদায় করতে বলবে ।

(গ) আর এতেও অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ শুরু করে দেবে ।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত: সালাতের ক্ষেত্রে

ধীরস্থিরতা ও তাড়াহুড়া না করার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজ সাহাবাদের প্রশিক্ষণ দানের একটি উদাহরণ ঃ যেমন তিনি বলেন-

'ইকামত হয়ে গেলে সালাতের জন্য তোমরা অতি দ্রুততার সাথে দৌড়িয়ে আসবে না বরং হেঁটে হেঁটে শান্ত শিষ্টভাবে আসবে । এরপর যতটুকু পাবে আদায় করবে, আর যা ছুটে যাবে পূরণ করবে ।'[১]

তিনি আরো বলেন, 'সালাতের ইকামত দেয়া হলে তোমরা আমি বের হওয়ার পূর্বে দাঁড়াবে না ।'[২]

ধীরস্থিরতার মর্যাদা ও উচ্চ মাকামের করণেই আল্লাহ তাআলা সেটি ভালোবাসেন । যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আশজ্জ কে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'তোমার মাঝে এমন দুটো অভ্যাস বিদ্যমান যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন: সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা ।'

নবীরাই সাধারণত আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং অনুকরণীয় আদর্শ । ধৈর্য ও সহনশীলতার সর্বোচ্চ শিখরে তাদের বিচরণ । তাদের মধ্য হতে যিনি মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন এবং তিনি সর্বাধিক সফল

[১] সহীহ আল - বুখারী কিতাবুল জুমুআ । হাদীস নং ৯০৮ এবং সহীহ মুসলিম , কিতাবুল মাসাজিদ । হাদীস নং ৬০২

[২] সহীহ মুসলিম । কিতাবুল মাসাজিদ । হাদীস নং ৬০৪

মানব । তিনিই হলেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । যার কোন তুলনা বা দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর নেই ।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুদ্ধনীতি প্রসঙ্গে আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের কোন এলাকায় প্রভাত উদ্ভাসিত হওয়ার পরই আক্রমণ করতেন । প্রথমে আযানের প্রতি কর্ণপাত করতেন, যদি ঐ এলাকা হতে আযানের আওয়াজ ভেসে উঠত, তখন আর আক্রমণ করতেন না । অন্যথায় তাদের উপর আক্রমণ চালাতেন ।

একবার এক ব্যক্তিকে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর' বলতে শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'লোকটি স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ।' তারপর লোকটি 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'লোকটি জাহান্নামের আজাব হতে মুক্তি পেল ।'[১]

আনাস রা. হতে বর্ণিত, 'কোন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রভাতের পূর্বে তাদের উপর কোন ধরনের আক্রমণ করতেন না এবং তিনি আযান শোনার অপেক্ষা করতেন । আযান শোনা গেলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন । আর আযান না শুনলে তাদের উপর আক্রমণ চালাতেন ।'[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, কত সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং শত্রুদের উপর আক্রমণে কোন প্রকার তাড়াহুড়া করতেন না, এটা তারই একটি প্রমাণ ।

আব্দুলহ বিন সারজাস আল -মুযানি রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সুন্দর বেশভুসা,[৩] ধীরস্থিরতা এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ।'[৪]

[১] সহীহ মুসলিম ২৮৮,৩৮৩

[২] সহীহ আল - বুখারী ৮৯,৬১০

[৩] অর্থাৎ দেখতে শুনতে সুন্দর দেখুন: ফায়জুল কবীর লিল মুযানী ২৭৭/২

[৪] তিরমিযি: ১৯৫/২

এতে প্রমাণিত হয় প্রত্যেক বিষয়ে ধীরস্থিরতা এবং গতিশীলতা উত্তম ও প্রশংসিত। তবে আখেরাতের বিষয়ে শরীয়তের মূলনীতি অনুসরণ করার শর্তে তাড়াহুড়া করা, কাজ যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করা এবং প্রতিযোগী হওয়া অবশ্যই ভাল, প্রশংসনীয় এবং শুভ লক্ষণ। এ ধরনের প্রতিযোগী হওয়া এবং তাড়াহুড়া করাকে আল্লাহ অবশ্যই পছন্দ করেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহমর্মিতা ও কোমলতা

প্রথমত ঃ সহানুভূতিশীলতার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উৎসাহ প্রদানঃ

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, 'যাকে সহমর্মিতা বা সহানুভূতিতা প্রদান করা হল, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ব প্রকার কল্যাণ তাকেই প্রদান করা হল, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, উত্তম চরিত্র এবং উত্তম প্রতিবেশী শহরকে বসবাস করার উপযোগী করে এবং তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বিষয়ে নমনীয়তা, দয়াদ্রতা এবং সহানুভূতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং তার কথা, কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ ছাড়া সকল গুণাবলির বাস্তব প্রয়োগ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন, যাতে প্রতিটি উম্মত তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে পারে।

বিশেষ করে, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দাওয়াত-কর্মী ও সংস্কারকদের এ বিষয়ে আরো বেশি সজাগ থাকতে হবে। কারণ, তাদের জন্য নম্রতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে উঠা-বসা চলাফেরা

[১] আহমাদ:৫১৯

ইত্যাদিতে। মোট কথা প্রতিটি মুহূর্তে তাদের জন্য এর অনুশীলন এবং চর্চা একান্ত অপরিহার্য।

উল্লেখিত হাদীস এবং পরবর্তী হাদীসগুলোতে নম্র ব্যবহার ইত্যাদির ফজীলত ও বিনয়ী হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া যে কোন উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, খারাপ আচরণ ও দুশ্চরিত্র হতে বিরত থাকা এবং খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার প্রতিও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, নম্রতা সকল কল্যাণের দ্বার খুলে দেয় এবং সকল প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য নম্রতা -ভদ্রতা এবং সৎ-চরিত্রের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যাদের মধ্যে এ সব গুণাবলি রয়েছে তাদের জন্য তাদের গন্তব্যে পৌঁছা বা উদ্দেশ্য হাসিল করা খুবই সহজ হয়।

আর নম্রতা বা সুন্দর চরিত্র দ্বারা যে সওয়াব বা পুণ্য লাভ হয়, তার বিপরীতে অন্য কোন নেক আমল দ্বারা তা কল্পনা করা দুষ্কর ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভদ্রতা হতে সতর্ক করেছেন। এবং তার উম্মতের উপর কোন ধরনের কঠোরতা করা হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেন।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার এ ঘরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের কেউ যদি ক্ষমতাশীল হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তুমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কঠিন আচরণ কর।'[১]

'আর যে ক্ষমতাশীল হওয়া সত্ত্বেও তা অন্যায়ভাবে প্রয়োগ না করে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার ও নম্র -ভদ্র আচরণ করল, তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার এবং তার প্রতি দয়া কর।'

রাসূল কাউকে বিশেষ কোন কাজে প্রেরণ করলে, তাকে সহজ করা, চাপ প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন না করার আদেশ দিতেন।

আবু মুসা আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করলে

[১] সহীহ মুসলিম :১৮২৮

বলতেন, 'তোমরা সুসংবাদ দাও, সহজ কর এবং কঠোরতা করো না ।'[১]
আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন পরিবারে কল্যাণ চান তাদেরকে নম্র হওয়ার সুযোগ দেন ।'[২]
আবু মুসা আল আশআরী ও মুআজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন, 'তোমরা মানুষের উপর সহজ কর । কঠিন করো না । তাদের সুসংবাদ দাও, আতঙ্কিত করো না । আনুগত্য করো মতবিরোধ করো না ।'[৩]
আনাস রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না সুসংবাদ দাও আতঙ্কিত করো না ।'[৪]
উল্লেখিত হাদীসগুলোর শব্দাবলীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজ করার আদেশ এবং এর বিপরীতে কঠিন করার নিষেধ দুটোই উল্লেখ করেন । কারণ, হতে পারে কোন ব্যক্তি কখনো সহজ করল এবং কখনো কঠিন করল আবার কখনো সুসংবাদ দিল আবার কখনো আজাব এবং শাস্তির কথা শুনালো । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে যদি শুধু সহজ করার কথা বলতেন, তাহলে কোন ব্যক্তি একবার বা একাধিকবার সহজ করলেই তাকে হাদীসের ভাষার মর্মার্থের প্রতি আনুগত্যশীল বলা যেত । কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলাদা ভাবে 'কঠোরতা করো না' বললেন, তখন কঠোরতার বিষয়টি সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে রহিত হয়ে যায় । আর হাদীসের
অন্তর্নিহিত মর্মবাণী এ দিকেই নির্দেশ করেন ।

---

[১] সহীহ মুসলিম : ১৭৩২
[২] আহমাদ:১২১৯
[৩] সহীহ আল - বুখারী ৪৩৪৪,২৩৪৫ সহীহ মুসলিম :১৭৩৩
[৪] সহীহ আল - বুখারী ৬৯, সহীহ মুসলিম :১৭৩২

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা আনুগত্য কর, মতবিরোধ করো না ।' দুটি শব্দ বলার কারণ হল, দুই জন কখনো কোন বিষয়ে এক হলেও, আবার কখনো দেখা গেল মতপার্থক্য করল । আবার কোন বিষয়ে একমত হল আবার অন্য কোন বিষয়ে একমত না ও হতে পারে । কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না' কথাটা আলাদাভাবে বলে দিলেন, ফলে বিচ্ছিন্ন হওয়া সব সময়ের জন্য এবং সকল ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হয়ে গেল । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর অসংখ্য নেআমত, মহা পুরস্কার এবং আল্লাহর অপার অনুগ্রহের সু-সংবাদ দেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান ব্যতীত শুধু আজাব-গজব, শাস্তি -ধমকি, হুমকি দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করা হতে নিষেধ করেন । হাদীসের নির্দেশাবলীতে 'মন রক্ষা কর, তাদের উপর কোন প্রকার কঠোরতা করো না' করা হয় ইসলামে নব দীক্ষিতদের জন্য ।
এ ছাড়াও প্রাপ্ত বয়স্ক ও যারা গুনাহের কাজ হতে ফিরে আসতে চায় তাদের প্রতি নমনীয় আচরণ করে ধীরে ধীরে তাদের ইসলামের অনুশাসনে অভ্যস্ত করতে হবে । হাদীসে যে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে তাতে এ ধরনের লোকদেরও ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করা সহজ হয় ।
ইসলামের বিধি বিধান কখনো একত্রে চাপিয়ে দেয়া হয়নি বরং ধাপে ধাপে মানুষের উপর ফরজ করা হয়েছে । ফলে যারা ইসলামে প্রবেশ করত বা প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করত তাদের ইসলাম পালন করা সহজ হত এবং ইসলামে দীক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকত । আর যদি প্রথমেই কাউকে সব কিছু চাপিয়ে দেয়া হত, তাহলে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা কমে যেত এবং কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেও চাপের মুখে পলায়ন করত ।[১]
এমনিভাবে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ হলো, রাসূল

---

[১] শরহে নববী:৪১/১২ ফাতহুল বারীঃ ১৬৩/১

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের বিভিন্ন সময় বিরতি দিতেন এবং এক দিন পর পর তালীম তরবিয়ত বা শিক্ষা মূলক বৈঠক করতেন। যাতে তারা বিরক্ত না হয় এবং অস্বস্তি অনুভব না করে।[১]
মোট কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন, এ উম্মতের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। সর্ব প্রকার কল্যাণের পথ প্রদর্শক, সংবাদ দাতা, এবং সকল অন্যায়, অনাচার, পাপাচার হতে বাধা দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। উম্মতকে যারা কষ্ট দেন, তাদের অভিশাপ করেন এবং যারা উম্মতের সাথে ভাল ব্যবহার করেন ও তাদের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাদের জন্য দুআ ও শুভ কামনা করেন। আয়েশা রা. এর উল্লেখিত হাদীস এর জ্বলন্ত প্রমাণ।
সুতরাং বলা বাহুল্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিহার করতেন। আর যারা মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি মমতা বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য কাজ করে তাদের বিশেষ গুরুত্ব দেন।[২]

প্রথম দৃষ্টান্ত: ব্যভিচার করার জন্য এক যুবকের অনুমতি প্রার্থনা
আবু উমামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন,' তার কথা শুনে উপস্থিত সবাই তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল এবং থামাতে চেষ্টা করল। রাসূল বললেন, 'তুমি কাছে এসো!' যুবকটি তার নিকটে গেল। তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার মায়ের সাথে ব্যভিচারকে পছন্দ কর?' সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা পছন্দ করি না। দুনিয়ার কেউই তা পছন্দ করে না।' তারপর বললেন, 'তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে অপকর্ম করাকে পছন্দ কর?' সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন- দুনিয়ার কোনো মানুষই তা পছন্দ করবে না।' তিনি বললেন, 'তুমি তোমার বোনের সাথে

[১] ফতহুল বারী:১৬২,১৬৩/১
[২] শরহে নববী: ২১৩/১২

অপকর্ম করতে পছন্দ কর?' সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন- দুনিয়ার কোন মানুষ তার বোনের সাথে অপকর্ম করতে পছন্দ করবে না।' তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে অপকর্ম করতে পছন্দ কর?' সে বলল, 'কসম আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, দুনিয়ার কোনো মানুষই তার ফুফুর সাথে অপকর্ম করাকে পছন্দ করে না।' তারপর বললেন, 'তুমি কি তোমার খালার সাথে অপকর্ম করাকে পছন্দ কর?' সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন-দুনিয়ার কোনো মানুষই তার খালার সাথে অপকর্ম করাকে পছন্দ করে না।' এরপর তিনি তার শরীরে হাত রেখে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং আত্মাকে পবিত্র কর লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর।' সে দিন থেকে যুবকটি কখনো ব্যভিচারের দিকে মনোযোগ দেয়নি।[১]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ হতে একজন সংস্কারকের জন্য মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার, তাদের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতির গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। বিশেষ করে যারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আশা করে, ঈমানকে বৃদ্ধি করার চেষ্টায় ব্যাকুল এবং ইসলামের উপর অটল অবিচল থাকার বিষয়ে প্রত্যয়ী হয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাজ-কর্মে এবং আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : ইহুদীর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যবহার
আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, এক দল ইহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বলল, 'আস্সামু আলাইকুম' (তোমাদের জন্য মৃত্যু)। আয়েশা রা. বলেন, আমি অভিশপ্ত ইহুদীদের ধোঁকা-বাজী

[১] আহমাদ: ৩৭০/১

বুঝতে পেরে বলি 'ওয়া আলাইকুমুস্সাম ওআললনাতু' (তোমাদের জন্য মৃত্যু ও অভিশাপ)। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সাবধান! হে আয়েশা, আল্লাহ প্রতিটি কাজে নমনীয়তাকে ভালোবাসেন।' আমি বললাম, 'হে রাসূল! তারা কি বলল, আপনি তা শুনেননি?' রাসূল বললেন, 'অবশ্যই শুনেছি এবং তাদের উত্তরে আমি বলেছি ওয়া আলাইকুম (তোমাদের জন্যও)।'[১] এ টুকুই বলাই যথেষ্ট। এবং তিনি বলেন, 'হে আয়েশা! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কাজে নমনীয়তাকে পছন্দ করেন। নমনীয়তার উপর যে ধরনের বিনিময় এবং সওয়াব দেন, কঠোরতা এবং অন্য কোন আমলের উপর এ পরিমাণ বিনিময় ও সওয়াব দান করেন না।[২]

তিনি আরো বলেন, 'যে কোন বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে এবং কঠোরতা প্রদর্শন তিক্ততা ছড়ায়।'[৩]

তিনি বলেন, 'নমনীয়তা হতে বঞ্চিত ব্যক্তি মানেই যাবতীয় কল্যাণ হতে বঞ্চিত।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যাকে নমনীয়তা হতে বঞ্চিত করা হয়, তাকে অবশ্যই দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়।'[৪]

আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যাকে নম্রতা বা ভদ্রতার ক্রিয়দাংশ প্রদান করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণেরও ক্রিয়দাংশ প্রদান করা হয়। আর যাকে নম্রতা বা ভদ্রতা হতে আংশিক বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ হতেও আংশিক বঞ্চিত করা হয়।'

আবু দারদা হতে আরো বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল বলেন, 'যাকে নম্রতা বা ভদ্রতার ক্রিয়দাংশ দেয়া হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণেরও ক্রিয়দাংশ দেয়া হয়। উত্তম চরিত্র হতে কোন আমলই ভারী হতে পারে না।'[১]

---

[১] সহীহ আল - বুখারী ৬০২৪
[২] সহীহ মৃসলিম:২৫৯৩
[৩] সহীহ মুসলিম :২৫৯৪
[৪] সহীহ মুসলিম :২৫৯২

তৃতীয় দৃষ্টান্ত : মসজিদে পেশাবকারীর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ

আনাস বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মসজিদে অবস্থান করছিলাম। ঠিক এ মুহূর্তে একজন গ্রাম্য লোক এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে আরম্ভ করল। এ দেখে সাহাবারা তাকে থামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না', ফলে তারা পেশাব করার জন্য সুযোগ দেন। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'মসজিদ পেশাবের জায়গা নয় বরং মসজিদ হলো আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং নামাজের স্থান।' তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন- এক বালতি পানি তার পেশাবে ঢেলে দেয়ার জন্য।[২]

সহীহ আল-বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এ লোকটি বলেছিল, 'হে! আল্লাহ তুমি আমাকে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহম কর, আমাদের দুইজন ছাড়া আর কাউকে অনুগ্রহ করো না।'

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দাঁড়ান। আমরাও দাঁড়াই, লোকটি নামাজে বলল, 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুগ্রহ কর। আমাদের ছাড়া আর কাউকে অনুগ্রহ করো না', নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি উন্মুক্ত ঝর্নাধারাকে পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলে।'[৩]

বুখারী ছাড়া অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এ ঘটনার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ : আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বলল, 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

---

[১] তিরমিযি:২০১৩
[২] সহীহ মুসলিম :২৮৫ সহীহ আল - বুখারী ২১৯
[৩] সহীহ আল - বুখারী ৬০১০

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুগ্রহ কর এবং এ ছাড়া কাউকে অনুগ্রহ করো না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি উন্মুক্ত ঝর্নাধারাকে পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলে?' এ কথা বলতে না বলতে সে মসজিদে পেশাব করতে আরম্ভ করলে সকলে দৌড়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের কষ্টের কারণ বা অকল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তোমরা তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।'[১]

তিনি বলেন, গ্রাম্য লোকটি বিষয়টি অনুধাবন করে বলল, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোন প্রকার ধমক দেননি, কোন মন্দ বলেননি এবং কোন প্রকার মারধর করেননি।'[২] দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী, বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। তার আচার - আচরণ এবং কাজকর্ম সবই প্রজ্ঞাময় এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তার আখলাক, আচার-আচরণ, নম্রতা-ভদ্রতা, নমনীয়তা, দয়াদ্রতা, সহনশীলতা, ক্ষমা ও ধৈর্যশীলতা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি মাত্রই তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হবে তার এবং প্রগাঢ় হবে তার ঈমান। লোকটি এমন একটি কাজ করল, তাতে রাগান্বিত হওয়া, শাস্তি যোগ্য অপরাধ মনে করা এবং শিক্ষা দেয়ার মত গর্হিত কাজ বিবেচনা করা ছাড়া উপস্থিত লোকদের সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না। এ কারণেই সাহাবীগণ তাড়াহুড়া করে তাকে বারণ করতে লাগলেন, তার এ কাজটিকে তারা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তারা তাকে ধমক দিলেন এবং তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন এবং সাহাবীদের তাকে পেশাবে বাধা দেয়া হতে বিরত রেখে তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন ও সুশিক্ষা দেন। এবং যখন সবাই বিরক্ত তখন তার প্রতি তিনি দয়ার্দ্র হলেন।

[১] তিরমিযি: ১৪৭ আহমাদ: ৭২৫৪

[২] আহমাদ: ১০৫৪০ ইবনে মাজাহ:৫২৯,৫৩০

এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়া, সহনশীলতা এবং সুন্দর ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতিটি কাজে এবং ব্যবহারে তিনি অনুরূপ হিকমত এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে হিকমতের সাথে শিক্ষা দেন এবং লোকটি যখন এ কথা বলে, 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুগ্রহ কর এবং আমাদের ছাড়া কাউকে অনুগ্রহ করো না', রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, 'তুমি বিস্তৃত জনপদকে সংকীর্ণ করে ফেললে! অর্থাৎ আল্লাহর রহমতকে। কারণ, সমস্ত কিছুই আল্লাহর রহমত দ্বারা আবৃত। আল্লাহ বলেন, 'আমার রহমত সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে।'[১]

কিন্তু দুআ করতে গিয়ে লোকটি কার্পণ্য করে এবং রহমতের দুআতে সমস্ত মাখলুককে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

অথচ, আল্লাহ তাআলা এর বিপরীতে যারা দুআতে সমস্ত সৃষ্টিকে শামিল করেন তাদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"আর যারা তাদের পরে আগমন করল, তারা বলে, 'হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের পূর্বে ঈমান সহকারে যারা অতিবাহিত হয়েছে তাদেরও। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ অবশিষ্ট রেখো না। হে রব! নিশ্চয় তুমি পরম দয়ালু।"[২]

লোকটি উল্লেখিত আয়াতের বর্ণনার সম্পূর্ণ উল্টো দুআ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নম্র, ভদ্র এবং আদরের সাথে শিক্ষা দেন। এবং এ ধরনের দুআ হতে নিষেধ করেন।[৩]

[১] সুরা আরাফ:১৫৬

[২] সুরা হাসর:১০

[৩] ফতহুল বারী: ৪৩৯/১০

আর লোকটি পেশাব করতে আরম্ভ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দেয়া হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। কারণ, হতে পারে বাধা দেয়ার ফলে সমস্যা আরো বাড়বে। তাই তিনি বাধা দেননি, কারণ ঃ

১ - পেশাব করতে আরম্ভ করার পর বাধা প্রদান করলে লোকটির স্বাস্থ্যের দিক হতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

২- অথবা পেশাব নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে শরীরের অন্যান্য স্থান, পোশাক এবং মসজিদের অন্য কোন অংশে পেশাব লেগে নাপাক হয়ে যেতে পারত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের দিক বিবেচনা করে বাধা প্রদান হতে বিরত রাখলেন।

অর্থাৎ তিনি দুটি বড় ধরনের সমস্যা এবং ক্ষতিকে প্রতিহত করেন সহনীয় দুটি ক্ষতিকে মেনে নিলেন। এবং দুটি বড় ধরনের কল্যাণ অর্জনকে প্রাধান্য দেন ছোট দুটিকে ছেড়ে দিয়ে।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বুদ্ধিমত্তা এবং হিকমতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণকারী। তিনি যে কোন প্রেক্ষাপটে যে কোন কাজকর্ম সমাধান এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় হিকমতের পরিচয় দিয়ে থাকেন। ঘটনায় তিনি তার উম্মত, বিশেষ করে দাওয়াত-কর্মী বা সংস্কারকদের একজন মূর্খ - অজ্ঞ , অশিক্ষিত-যার মধ্যে কোনপ্রকার হটকারিতা বা কপটতার অবকাশ নাই– কোন প্রকার কটূক্তি, হুমকি-ধমকি , কঠোরতা, কষ্ট দেয়া বা দুর্ব্যবহার ছাড়া কীভাবে শিক্ষা দিতে হয় তার একটি দৃষ্টান্ত এবং অনুপম আদর্শ স্থাপন করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপম আদর্শ- নমনীয়তা, দয়া, অনুগ্রহ, সহানুভূতিশীল আচরণ, মমতাময়ী ব্যবহার - লোকটির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। ফলে, সে পরবর্তী জীবনে ঘটনার বর্ণনায় কৃতজ্ঞতার সাথে বলে, 'তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আমার দিকে অগ্রসর হন। তবে তিনি আমাকে কোন

[১] ফতহুল বারী: ৩২৫/১

প্রকার কটূক্তি বা উচ্চবাচ্য করেননি, কোন প্রকার তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করেননি এবং মারধর করেননি।'[১]

তার কথা থেকেই বুঝা যায়, লোকটির জীবনে কেমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত ঃ মুআবিয়া বিন হাকামের ঘটনা

মুআবিয়া বিন হাকাম আস্সুলামী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 'একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামাজ আদায় করতে ছিলাম। ইতি মধ্যে নামাজে এক লোক হাঁচি দিলে তার উত্তরে আমি বলি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ! (আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন)' এ শুনে সবাই আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে আরম্ভ করল। আমি তাদের বললাম, 'হায় দুর্ভোগ! তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাও কেন?' তারপর তারা তাদের উরুতে থাপর মারতে আরম্ভ করল। আমি বুঝতে পারলাম তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। ফলে আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আমার মাতা পিতা উৎসর্গ হোক, ইতিপূর্বে আমি তার চেয়ে উত্তম কোন শিক্ষক ও এত সুন্দরভাবে শিক্ষা প্রদান করতে কাউকে দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে কোন গালি দিলেন না, তিরস্কার করলেন না এবং কোন মারধর করেননি। নামাজ শেষে বলেন, 'নিশ্চয় নামাজে কথা বলা সঙ্গত নয়। বরং নামাজ হলো তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তেলাওয়াত।'

আমি তাকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলিয়্যাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের নিকট যায়। আমি কি গণকের নিকট যাব?' রাসূল বলেন, 'না, তুমি গণকের নিকট যেও না।' বললাম, 'আবার আমাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে তারা লক্ষণ-কুলক্ষণে বিশ্বাস করে।' তিনি বললেন, 'এটা একটি কুসংস্কার, অবিশ্বাসী কাফেররা এতে বিশ্বাস করে। তবে তোমাকে এটা যেন কোন কাজ থেকে

[১] ইবনে মাজাহ:৫২৯

বিরত না রাখে।' তারপর আমি বলি, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা দাগ দেয়।' রাসূল বলেন 'যদি পূর্বেকার কোন নবী এ ধরনের দাগ দিয়ে থাকে, আর যার দাগ নবীর দাগের সাথে মিলে যায়, তার জন্য দাগ দেয়া বৈধ।'

মুআবিয়া বিন হাকাম বর্ণনা করেন, 'আমার একজন দাসী ওহুদ এবং জাওয়ানিয়া নামক স্থানে ছাগল চরাত। একদিন সে বলল, 'আমার একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে।' এ কথা শুনে আদম সন্তান হিসেবে স্বাভাবিকভাবে আমি খুব কষ্ট পেলাম, ফলে আমি খুব জোরে তাকে আঘাত করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে মুক্ত করে দেব কি?' রাসূল বললেন, 'তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' তাকে নিয়ে আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ কোথায়?' উত্তরে সে বলল, 'আল্লাহ আকাশে।' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কে?' সে বলল, 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' রাসূল বললেন, 'তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ, সে ঈমানদার।'[১] আল্লাহর পক্ষ হতে দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ কত সুমহান ও মহত্তম। তার আচরণ মুআবিয়া বিন হাকাম আস্‌সুলামীর এর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। তাই সে বলে, 'আমি ইতিপূর্বে এবং পরে এর চেয়ে উত্তম কোন শিক্ষক দেখিনি।'

পঞ্চম দৃষ্টান্ত ঃ যার হাত প্লেটে ঘুরপাক খেত তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ

উমার বিন আবি সালমা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে বসে খাচ্ছিলাম। আমার হাত প্লেটের সব জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে! বালক! তুমি বিসমিল্লাহ পড়। ডান হাত দিয়ে

[১] সহীহ মুসলিম :৫৩৭/১

খাও। এবং সামনে যা আছে তা হতে খাও।' তারপর হতে আমার খাওয়া এ ধরনেরই ছিল। এর ব্যতিক্রম কখনো হয়নি।[১]

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত : রমজানের দিনে স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ

সালামাতা বিন সাখার আল আনছারী হতে বর্ণিত, তিনি তার হাদীসে বলেন, 'ঘর হতে বের হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে আমার বিষয়ে তাকে অবহিত করি। তিনি বলেন, 'তুমি এ কাজ করেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হে রাসূল!' তারপর আবার বললেন, 'তুমি একাজ করেছ?' বললাম, 'এ কাজ করেছি হে আল্লাহর রাসূল!' তৃতীয় বার তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি এ কাজ করেছ?' আমি বললাম, 'হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর বিধান প্রয়োগ করুন! আমি মেনে নেব।' তিনি বললেন, 'একজন দাস মুক্ত কর।' আমি হাতকে স্বীয় ঘাড়ে রেখে বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল! যে সত্তা সত্যের পয়গাম নিয়ে আপনাকে প্রেরণ করছে, তার শপথ করে বলছি, আমি স্বীয় ঘাড় ছাড়া আর কোন কিছুরই মালিক নই।' তিনি বললেন, 'তাহলে দুই মাস রোজা রাখ।' আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! রোজা রাখার কারণেই আমি এ বিপদের সম্মুখীন হলাম।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি ছদকা কর।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্যের বাণী দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করছেন, আমি রাত যাপন করছি ক্ষুধার্ত অবস্থায়। কারণ, রাতে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না।' তিনি বলেন, 'তুমি বনী জুরাইক এর ছদকার মালিকের নিকট যাও তাদের বল, তারা যেন তোমাকে দান করে। আর তা হতে এক ওসক পরিমাণ তোমার পক্ষ হতে অভাবীদের আহার দাও। আর বাকীগুলো তুমি এবং তোমার পরিবারের জন্য গ্রহণ কর।' তারপর আমি নিজ গোত্রের নিকট গিয়ে বলি, 'আমি তোমাদের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখতে পাই এবং তোমাদের অদূরদর্শিতা অনুভব করি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহসী এবং বরকতময় দেখতে পাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু

[১] সহীহ মুসলিম :২০২২

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের আদেশ করেছেন ছদকা দিতে । তোমরা আমাকে দান কর । এ কথা বলার পর তারা আমাকে দান খয়রাত করে সহযোগিতা করল ।'[১]

সপ্তম দৃষ্টান্ত : কবরের পাশে ক্রন্দন রত মহিলার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ

আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের পাশে ক্রন্দনরত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর । মহিলাটি বলল, 'তুমি আমার থেকে দূর হও । কারণ, তুমি আমার মত বিপদের সম্মুখীন হওনি ।' আসলে মহিলাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারেনি । তারপর মহিলাকে লোক জন বলল, 'তুমি যার সাথে দুর্ব্যবহার করেছো তিন হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তখন সে দৌড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, তাই অভদ্র আচরণ করেছি ।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হয় ।'[২]

ভাবার বিষয় হলো, একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতই না সুন্দর আচরণ করেন । তাকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করেননি । তিরস্কার করেননি । এর চেয়ে উত্তম আদর্শ আর কার হতে পারে?

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বোচ্চ ধৈর্যধারণ

[১] আহমদ,আবুদাউদ,তিরমিজি

[২] সহীহ আল - বুখারী:১২৮৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাওয়াতী ময়দানে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে, যেগুলোর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি আল্লাহর নৈকট্য এবং তার থেকে বিনিময় লাভকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন । এ কথা আমরা সবাই জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনীয় দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করেন । এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । দাওয়াতী ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনের অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান । তবে আমরা বাস্তবমুখী কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করব ।

প্রথম দৃষ্টান্তঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ছাফা পাহাড়ে আরোহণ এবং সবাইকে একত্রিত করে ইসলামের দাওয়াত দেয়া

আল্লাহ তাআলা তার নবীকে সর্ব প্রথম নিকট আত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য আদেশ দেন । আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

"আর তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক কর । আর যে সব ঈমাদাররা তোমার অনুকরণ করে তাদের প্রতি বিনয়ী হও । আর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয় তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা করো তার দায় হতে আমি মুক্ত ।"[১]

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন । ইসলামের শক্তি প্রদর্শনের জন্য তিনি একটি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন । যার ফলে আল্লাহ তাআলা ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটান । দাওয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বুদ্ধিমত্তা, তার

[১] সুরা আশ-শুআরা ২১৪-২১৪

সাহসিকতা, সহনশীলতা, সুন্দর ব্যবহার এবং ইখলাস - আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ- ইত্যাদি অনেক কিছুই তার জীবনীতে ফুটে উঠে ।

সাথে সাথে এর একটি চিত্র এও দেখতে পাই; তা হল, যারা তাওহীদের বিরোধিতা করে, নবী ও রাসূলদের সাথে দুর্ব্যবহার ও তাদের যারা কষ্ট দেয়, তাদের পরিণতি লাঞ্ছনা বঞ্চনা এবং দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয় । ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন আল্লাহর বাণী

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

"আর তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক কর ।" যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাক দিলেন- হে বনী ফাহর! হে বনী আদি ! এ রকমভাবে কুরাইশের সম্ভ্রান্ত বংশকে-ডাকতে আরম্ভ করেন । তার ডাক শুনে সমস্ত মানুষ একত্রিত হল । এমনকি যদি কোন ব্যক্তি না আসতে পারতো, সে একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতো, কি বলে তা শুনার জন্য । আবু জাহেল নিজে এবং কুরাইশরা সবাই উপস্থিত হল । তারপর তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের পাদদেশে অস্ত্র সজ্জিত এক বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণের অপেক্ষায় আছে, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?' সকলে এক বাক্যে বলল, 'অবশ্যই বিশ্বাস করব ।' কারণ, আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি । তিনি বললেন, আমি তোমাদের সতর্ক করছি ভয়াবহ শাস্তি- আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ।

এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, 'তোমার জন্য ধ্বংস! পুরো দিনটাই তুমি আমাদের নষ্ট করলে । এ জন্যই কি আমাদের একত্রিত করেছ ?'

তার এ কথার উত্তরে আয়াত নাযিল হলো ।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ –

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক । তার ধন সম্পদ এবং তার কোন উপার্জন কাজে আসে নাই ।"[১]

আবু হুরাইরা রা. এর বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. এক এক গোত্রকে আলাদা করে ডাকেন এবং প্রতিটি গোত্রকে বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর ।' এবং কলিজার টুকরা ফাতেমা রা. কে ডেকে বলেন, 'হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর । কারণ, আল্লাহ পাকড়াও হতে তোমাদের রক্ষা করার মত কোন ক্ষমতা আমি রাখি না । হাঁ, তবে আমার সাথে তোমার রক্তের সম্পর্ক থাকায় আমি তোমাকে আদর-যত্নে সিক্ত করতে পারার আশা রাখি ।'[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যে ব্যাপক আহ্বান বা ঘোষণা দেন তা ছিল একটি ঐতিহাসিক আহ্বান ও যুগান্তকারী ঘোষণা । তাছাড়া তার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তিকে বলে দিলেন, ঈমান ও আখেরাতের বিশ্বাস এবং রেসালতের স্বীকৃতিই হল তাদের সাথে সম্পর্কের মানদণ্ড ।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা. কে ডেকে বললেন, 'হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর । কারণ, আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের বিষয়ে আমাকে কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি ।'

উলেখিত হাদীসে দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ছিল সর্বোচ্চ তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শন । এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিষয় স্পষ্ট করেন যে, কোন ব্যক্তির নাজাতের উপায় কখনো বংশ মর্যাদা, পিতা-মাতার পরিচয়, আত্মীয়তা কিংবা জাতীয়তা ইত্যাদির মানদণ্ডে হতে পারে না বরং এর মানদণ্ড হল তাওহীদ ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস । এ ঘোষণার পর আরবদের মাঝে বংশ মর্যাদা এবং আত্মীয়তা ইত্যাদির গৌরব আর

---

[১] সহীহ আল - বুখারী:৪৭৭০,সহীহ মুসলিম :২০৮

আয়াত : সুরা মাসাদ: ১-২

[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৭৭১, সহীহ মুসলিম ২০৬

অহংকারের যে প্রবণতা ছিল, তা আর অবশিষ্ট রইল না। এবং আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য ভিন্ন অন্য যে কোন উপকরণ-আত্মীয়তা, বংশ-বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে যে সব জাতীয়তা গড়ে উঠে তা একে বারে মূল্যহীন।

গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং প্রতিকুল প্রেক্ষাপটে ও তার বংশের লোকদের সর্বোচ্চ সতর্ক করলেন তিনি। তাদের ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার আহ্বান জানালেন। আল্লাহর কঠিন আজাব হতে ভয় দেখালেন এবং তাদের মূর্তি পূজা হতে বিরত থাকতে আহ্বান করলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তার আহ্বানে সাড়াতো দিলই না বরং তারা তার মিশনের বিরোধিতা করলো। ফু দিয়ে তা নিভিয়ে দিতে সচেষ্ট হলো। কারণ, তারা বুঝতে পারল, এ আহ্বান এমন এক দাওয়াত, শত শত বছর ধরে লালন করা ঐতিহ্য এতে বিলুপ্ত হবে এবং বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণ ব্যাহত হবে। জাহেলিয়্যাতের যে গতিধারা তাদের সমাজে অব্যাহত ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরোধিতা কোনভাবেই আমলে নেননি। বরং তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কারণ, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বে কোন প্রকার অবহেলা করবেন না বলে বদ্ধ পরিকর। যদি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষ তার মিশনকে প্রত্যাখ্যান বা প্রতিহত করে, তারপরও তিনি দাওয়াত অব্যাহত রাখবেন এবং বাস্তবেও তাই করেছেন।

রাতদিন গোপনে-প্রকাশ্যে যাকে যেখানে পেতেন দাওয়াত দিতেই থাকতেন। তার চিন্তা চেতনায় শুধু একটি জিনিসই কাজ করতো কীভাবে মানুষকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথ দেখাবেন। কীভাবে মানুষকে শিরক থেকে মুক্ত করবেন এবং তাওহীদের পতাকা তলে একত্রিত করবেন। তাকে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার, কোন যালিমের যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, লোভ-লালসা ও প্রলোভন কোন কিছুই বিরত রাখতে পারেনি এবং পারেনি কোন কিছুই তার গতিকে থামিয়ে দিতে।

মানুষের সম্মেলনে, অনুষ্ঠানে এবং হাটে বাজারে মোট কথা যাকে যেখানে পেতেন আল্লাহর দিকে তাকে আহবান করতেন।

বিশেষ করে হজের মাওসুম- যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে মানুষ একত্রিত হতো- তখন এ সুযোগকে কাজে লাগাতেন। সমগ্র মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতেন।

ধনী-দরিদ্র, দুর্বল-সবল, স্থানীয়-মুসাফির, পথিক-পর্যটক এমন কোন লোক অবশিষ্ট ছিল না যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দাওয়াত পৌছাননি। এ দাওয়াতে সমস্ত মানুষ তার নিকট ছিল সম-মর্যাদার। কোন প্রকার বৈষম্য বা পার্থক্য করেননি কারো মধ্যে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মক্কার ক্ষমতাবান লোকেরা তার শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে মানসিক, শারীরিকসহ অমানবিক নির্যাতন নিপীড়ন আরম্ভ করল। মক্কাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। তারা কোন ভাবেই তাকে মেনে নিতে পারেনি এবং তাকে মেনে নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানাল।

তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থমকে যাননি, তার মিশন চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং ইসলামে দীক্ষিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। গোপনে গোপনে কোন কোন পরিবারের বাড়িতে গিয়েও তাদের তালীম-তারবিয়ত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিতেন।

তালীম-তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন একটি জামাত গঠনে সক্ষম হলেন, যারা তার মিশনের ধারক বাহক হিসেবে তার এ গুরু দায়িত্ব পালনে শরীক হলেন। এদের মত একটি জামাত পেয়ে তার মনে আশার সঞ্চার হলো। ধীরে ধীর তারা এমন একটি জামাতে পরিণত হল, তারা তাদের জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করতে এবং সব কিছুর উপর একমাত্র দীনকে প্রাধান্য দিতে নিজেদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিলেন। তারা দৃঢ় ঈমান এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন। ধৈর্য ও সহনশীলতার যে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে ছিল একেবারেই বিরল।

আল্লাহর আদেশের আনুগত্য এবং তার প্রতি যে প্রগাঢ় ভালোবাসা তারা দেখিয়েছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
একজন আমীরের আনুগত্য এবং তার প্রয়োজনীয়তা শুধু বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেননি বরং তা বাস্তবায়নের যে ইতিহাস আমরা তাদের মধ্যে দেখতে পাই, বর্তমান আধুনিক পৃথিবীর নেতা নেত্রীরা তা কল্পনাও করতে পারে না।
তাদেরকে কোন আদেশ বা নিষেধের জন্য বাধ্য করার প্রয়োজন হতো না। বরং রাসূলের মুখ থেকে কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা মাত্রই স্বতঃস্ফুর্তভাবে তা পালন করার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো। তার আদেশের প্রতি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ছিল, তার তুলনায় দুনিয়ার অন্য সবকিছুর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা তাদের নিকট ছিল নেহায়েত তুচ্ছ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যথাযথ তালীম তারবিয়ত, অবিচল নীতি অবিরাম সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ফলে দীনের এ আমানত এবং ওহীর এ গুরু দায়িত্ব পালনে তারা সক্ষম হন। আর আমাদের জন্য একটি চিরন্তন আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
রাসূল আল্লাহর দীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও মেধার পরিচয় দেন তা চিরদিন আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত :কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ

কুরাইশরা যখন দেখতে পেল শুধু নির্যাতন এবং দমননীতি অবলম্বন করে মুসলমানদের থামানো সম্ভব নয় তখন তারা ভিন্ন কৌশল হিসেবে একটি আপোশ প্রস্তাব নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসে। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়াবী যে কোন প্রস্তাবে সম্মত করাতে প্রচেষ্টা চালায়। এদিকে রাসূলের চাচা আবু তালেব, যিনি তাকে দেখাশুনা করেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য সহযোগিতা এবং আশ্রয় দিয়ে থাকেন তাকেও একটি প্রস্ত

াব দেয়। দাবি জানায়, তিনি যেন মুহাম্মাদকে বিরত রাখেন এবং দীনের দাওয়াত বন্ধ করে দেন।[১]
কুরাইশের সরদার এবং নেতারা আবু তালেবের নিকট এসে বলল, 'তুমি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত, বয়স্ক, মর্যাদাবান এবং সম্মানী ব্যক্তি। আমরা অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম তুমি তোমার ভাতিজাকে নিষেধ করবে। কিন্তু বাস্তবতা হল তুমি নিষেধ করোনি। আমরা জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। সে আমাদের বাপ দাদা সম্পর্কে মন্তব্য করে। আমাদের প্রতি অশুভ আচরণ করে। আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি কটূক্তি করে। আমরা আর বিলম্ব করতে পারব না। হয়, তুমি তাকে বিরত রাখ অন্যথায় তুমি যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। এতে হয় তোমরা ধ্বংস হবে অথবা আমরা ধ্বংস হব।'
আবু তালেব তাদের অসাধারণ হুমকি এবং সময় বেধে দেয়াকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং তা আমলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করেন।
তিনি তার স্বজাতি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা করলেন। আর এই মুহূর্তে স্বজাতি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার মত অনুকুল পরিবেশ তার ছিল না। তাই তিনি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন এবং উভয় সংকটে জড়িয়ে পড়েন। একদিকে ইসলাম গ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারছেন না, অন্য দিকে তার ভাতিজার অপমান এবং তার উপর কোন প্রকার অন্যায় অবিচারকে সহ্য করতে পারছিলেন না।
নিরুপায় হয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'হে ভাতিজা! নিজ বংশের লোকেরা আমার নিকট এসে এ ধরনের কথা বার্তা বলেছে। এ বলে তিনি তাদের কথার বিবরণ শোনালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ।
তারপর আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'তোমার সাধ্যের বাইরে কোন কাজ করা দরকর নাই। এমন কোন

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪১/৩

কাজের দায়িত্ব নিতে যাবে না, আমি যার সমাধান করতে পারব না। সুতরাং আমার পরামর্শ হল, তোমার স্বজাতি যে সব কাজ অপছন্দ করে তুমি সে সব কাজ হতে বিরত থাক।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচার কথায় একটুও কর্ণপাত করলেন না। তিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন।

আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে গিয়ে কারো কোন কথায় গুরুত্ব দিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ। কারণ, তিনি জানেন তিনি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিশ্বাস করেন, তার এ দীনকে আল্লাহই সাহায্য করবেন। তার এ দাওয়াত আল্লাহ তাআলা একটি পর্যায়ে অবশ্যই পৌঁছাবেন। কিছু দিন যেতে না যেতে আবু তালেব দেখতে পেল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নীতি আদর্শের উপর অটল, অবিচল এবং কুরাইশদের দাবী অনুসারে তাওহীদের দাওয়াত তিনি কখনো ছাড়বেন না।

আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সা. কে বললেন, 'আমি কসম করে বলছি, তারা তোমার নিকট একত্রিত হয়ে আসতে পারবে না, যতদিন না আমি মাটিতে প্রোথিত হবো এবং মাটিকে বালিশ বানাবো। তুমি নির্ভয়ে তোমার কাজ চালিয়ে যাও আর সু সংবাদ গ্রহণ কর। আর এ সুসংবাদ দ্বারা তোমার চোখকে শীতল কর।'[১]

তৃতীয় দৃষ্টান্ত: উতবা বিন রবিয়ার ঘটনা।

হামজা বিন আব্দুল মুত্তালেব রা. এবং উমার বিন খাত্তাব রা. এ দুজনের ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের আনন্দ ঘন আকাশে ফাটল ধরলো। তাদের দুশ্চিন্তার আর অন্ত রইলো না।

এ ছাড়াও মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া, প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা, ইসলামের বড় বড় দুশমনদের বিরোধিতা এবং তাদের জুলুম নির্যাতনের কোন পরোয়া না করা, ইত্যাদি বিষয় তাদের ঘুমকে হারাম করে দিল। তাদের মনের আশঙ্কা, ভয়ভীতি এবং দুশ্চিন্তা আরো বৃদ্ধি পেল।

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২৭৮/১ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪২/৩

তারপর তারা উতবা বিন রাবিয়াকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঠালো। তাদের ধারণা এর কোন একটি প্রস্তাবে তাকে রাজি করানো যেতে পারে।

তাদের প্রস্তাব নিয়ে উতবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, 'হে আমার ভাতিজা! তুমি জান, তুমি আমাদের নিকট একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তোমার বংশ মর্যাদা আরবের সমগ্র মানুষের চাইতে বেশি সম্ভ্রান্ত। কিন্তু তুমি তোমার স্বজাতির নিকট এমন একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছো যা আমরা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছি না। কারণ, তুমি আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করছো। আমাদের স্বপ্নকে ধুলিস্যাত করে দিচ্ছো। এবং আমাদের উপাস্যগুলোকে কটাক্ষ করছো। আর আমাদের বাপ দাদাদের হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যে আঘাত হানছো।

সুতরাং তোমাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে শুন। আশা করি যে কোন একটি প্রস্তাবে তুমি সম্মতি জ্ঞাপন করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনীত ভাবে বললেন, 'হে আবুল ওয়ালিদ! আপনার প্রস্তাবগুলো তুলে ধরুন! তারপর সে বলল, 'যদি তোমার এ মিশনের উদ্দেশ্য টাকা পয়সা, অর্থ প্রাচুর্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে আমরা এত পরিমাণ ধন সম্পদের মালিক বানাব তাতে তুমি মক্কার মধ্যে সবার চেয়ে বেশি সম্পদশালী হবে। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও, তোমাকে যাবতীয় সব কিছুর নেতা বানিয়ে দেব, তোমাকে ছাড়া একটি পাতাও তার জায়গা হতে সরবে না। আর যদি রাজত্ব চাও, তাহলে তোমাকে পুরো রাজত্ব দিয়ে দেব। আর যদি এমন হয় যে, তুমি যে সব কথা বলছ, তা কোন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে; কারণ, অনেক সময় এমন হয়, তোমার মাথা হতে বিষয়টি কোন ভাবে নামানো যাচ্ছে না। তাহলে আমরা তোমাকে উচ্চ চিকিৎসার জন্য যত অর্থের প্রয়োজন, তার সবই জোগান দেব। হতে পারে অনেক সময় মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি কোন খেয়াল বা কল্পনার কারণে লোপ পায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব মনোযোগ দিয়ে উতবার কথা শুনতে লাগলেন। তারপর যখন কথা শেষ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার কথা শেষ হয়েছে হে আবুল ওয়ালিদ?' বলল, 'হ্যাঁ।'
তা হলে এবার আমার থেকে শোন! তারপর সে বলল, 'আচ্ছা বল।'
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনালেন-

حم ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿٥﴾

"হা-মীম। রাহমান রাহিম এর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। এটা এমন একটি কিতাব, যাতে তাঁর নিদর্শন সমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে, আরবী কুরআন এমন জাতির জন্য যারা জানে। যা সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। আর তারা বলে, তুমি যে দিকে আহ্বান করো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত আর আমাদের কানে ছিপি লাগানো এবং তোমার মাঝে আর আমার মাঝে রয়েছে পর্দা। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর আর আমরা আমাদের কাজ করি।"[১]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতগুলো পড়তে থাকেন। উতবা যখন কুরআনের আয়াত শুনতে পেলো তখন সে কান খাড়া করে দিলো। এবং তার দু হাত ঘাড়ের উপর রেখে হেলান দিয়ে কুরআন শুনতে আরম্ভ করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তিনি সেজদা করলেন উতবাও তার সাথে সেজদা করল। তারপর তিনি বললেন, 'হে আবুল ওয়ালিদ! 'তুমি আমার কথা শুনেছো, তুমি এখন ফিরে যেতে পার।'[২]

[১] সুরা ফুসসিলাতঃ ১-৫
[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহয়া : ৬২/৩ আর রাহিকুল মাখতুমঃ ১০৩

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

"যদি তারা বিমুখ হয়, তুমি তাদের বল আমি তোমাদের ভয়ংকর শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি যে ভয়ংকর শাস্তি সামুদ এবং আদ জাতির অনুরূপ।"[১]
তখন উতবা বিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সে তার হাতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে রেখে বলল, 'আমি আল্লাহর কসম দিচ্ছি এবং আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি, তুমি এ দাওয়াত হতে বিরত থাক।' এ কথা বলে সে দৌড়ে তার নিজ গোত্রের নিকট চলে গেল। এমনভাবে দৌড় দিল, যেন বিদ্যুৎ তার মাথার উপর পড়ছিলো। গিয়ে কুরাইশদের পরামর্শ দিল, তারা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামায় এবং তাকে তার আপন অবস্থায় কাজ করতে ছেড়ে দেয়। সে বার বার তাদের বুঝানোর জন্য চেষ্টা চালায়।[২]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শুনানোর জন্য এ আয়াতকে নির্বাচন করেন। কারণ, তিনি যাতে উতবাকে বুঝাতে সক্ষম হন, রিসালাত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাকীকত কি হতে পারে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জন্য এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছেন, যদ্বারা তিনি তাদের পথভ্রষ্টতা হতে বের করে সৎপথে পরিচালনা করেন। তাদের তিনি অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথ দেখান। তাদের তিনি জাহান্নাম হতে বাঁচান এবং জান্নাতের সন্ধান দেন। আর তিনি নিজেই সকলের পূর্বে এর ধারক বাহক। তাই এ দীনের পরিপূর্ণ বিশ্বাস সর্বপ্রথম তাকেই করতে হবে এবং সর্বপ্রথম তাকেই তার বিধান সম্পর্কে জানতে হবে।
আল্লাহ যখন সমগ্র মানুষকে কোন নির্দেশ দেন, তা মানার বিষয়ে সর্ব প্রথম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সর্বাধিক বিবেচ্য

[১] সুরা ফুসসিলাতঃ ১৩
[২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৬২/৩

ব্যক্তি। তিনি কোন রাজত্ব চান না এবং কোন টাকা পয়সা চান না। এবং কোন ইজ্জত-সম্মান চান না। আল্লাহ তাআলা তাকে সব কিছুর সুযোগ দেন এবং তিনি তা হতে নিজেকে বিরত রাখেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মালামালের প্রতি লোভ-লালসা বলতে কিছুই তার ছিল না।
কারণ, তিনি তার দাওয়াতে সত্যবাদী আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ঐকান্তিক।[১]
তার এ অবস্থান, তাকে আল্লাহর পক্ষ হতে যে প্রজ্ঞা ও পরম ধৈর্য দেয়া হয়েছে, তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি তার দাওয়াত এবং মিশনকে সামনে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোন ধন-সম্পদ অর্থ-প্রাচুর্য নারী-বাড়ী, গাড়ী এবং রাজত্ব কোন কিছুকেই তার বিনিময় প্রাধান্য দেননি এবং স্থান কাল পাত্র বেধে এমন কথা পেশ করলেন যা তখনকার সময়ের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। মনে রাখতে হবে একেই বলে হিকমত এবং সর্বোত্তম আদর্শ।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত: আবু জাহেলের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ
কাফেররা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়াসহ ইসলামে প্রবেশকারী মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সাথে সাথে ইসলামের জাগরণকে ঠেকাতে সব ধরনের কলা কৌশল এবং অপপ্রচার চালিয়ে যাবে।
তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ভাবে অপবাদ দিতে লাগল, তারা তাকে পাগল, যাদুকর, গণক, মিথ্যুক ইত্যাদি বলে গালি গালাজ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অটল অবিচল। তাদের কথায় কোন প্রকার কর্ণপাত করেননি। আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আশায় সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের পক্ষ হতে এমন কষ্টের সম্মুখীন হন যে, কোন ঈমানদার এত কষ্টের সম্মুখীন হননি। আবু

[১] ফিকহুস সীরাত: গাজালীর :১১৩

জাহেল তার মাথাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে এবং তাকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন এবং আবু জাহেলের ষড়যন্ত্রকে তারই বিপক্ষে প্রয়োগ করেন।
আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জাহেল তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করল, 'মুহাম্মাদ কি তোমাদের সম্মুখে চেহারা মাটিতে মেশায়?' বলা হল, 'অবশ্যই, 'সে আমাদের সম্মুখে মাথা মাটিতে ঝুঁকায়।' এ কথা শোনে সে বলল, 'লাত এবং উযযার কসম করে বলছি, আমি যদি তাকে মাটিতে মাথা ঝোঁকানো অবস্থায় দেখতে পাই, তার গর্দানকে পদপৃষ্ঠ করব অথবা তার চেহারাকে ধুলা বালিতে মিশিয়ে দেব।' তারপর একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতে ছিলেন। দেখতে পেয়ে আবু জাহেল তার গর্দান পদপৃষ্টর করার জন্য তার দিকে অগ্রসর হল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এল, হঠাৎ সে পিছু হঠতে আরম্ভ করল এবং দু-হাত দিয়ে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে আরম্ভ করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার কি হয়েছে, তুমি এমন করছো কেন?' তখন সে উত্তর দিল, 'আমি আমার এবং তার মাঝে আগুনের একটি পরিখা দেখতে পাই এবং তাতে অসংখ্য ডানা দেখতে পাই।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি সে আমার কাছে আসতো, তাহলে ফেরেশতারা তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলতো।'
তারপর এ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযেল করেন - كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى থেকে সুরা আলাকের শেষ পর্যন্ত।[১]
আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ দুর্বৃত্ত এবং অন্যান্য দুর্বৃত্তের হাত হতে রক্ষা করেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার কষ্ট, জুলুম নির্যাতন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নীরবে সয়ে যান এবং তার জান, মাল ও সময় আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেন।

[১] সহীহ মুসলিম : ২৭৯৭

পঞ্চম দৃষ্টান্ত ঃ রাসূলের পিঠে উটের ভুঁড়ি রাখা

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রা. বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর পাশে নামাজ আদায় করতে ছিলেন । আবু জাহেল এবং তার সাথি- সঙ্গীরা এক সাথে বসা ছিল । বিগত দিন একটি উট জবেহ করা হয়েছিল । আবু জাহেল বলল, 'কে উটের ভুঁড়িটি নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মাদ যখন সেজদা করবে তার পিঠের উপর রেখে দেবে ।' তারপর তার দলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে ব্যক্তি, সে উষ্ট্রের ভুঁড়িটি নিয়ে আসল[১] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা করলে তার দুই কাঁধের উপর রেখে তারা হাসাহাসি করতে আরম্ভ করে । তারা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে ডলে পড়তো । আমি পুরো বিষয়টি দেখতে পেলাম, যদি কোন ক্ষমতা থাকতো তা হলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পৃষ্ঠ হতে তা সরিয়ে নিতাম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় পড়ে রইলেন । কোনভাবে মাথা উঠাতে পারছিলেন না । এক লোক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এ দৃশ্য দেখে ফাতেমা রা. কে সংবাদ দেন । তিনি খবর শোনামাত্র দৌড়ে আসেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা থেকে উটের ভুঁড়ি নামালেন । তারপর তাদের গালি গালাজ করতে লাগলেন । নামাজ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ আওয়াজে তাদের জন্য বদ দুআ করতে আরম্ভ করেন । আর তার অভ্যাস ছিল, যখন দুআ করতেন, তিন বার দুআ করতেন । আবার যদি কোন কিছু চাইতেন, তিন বার চাইতেন । রাসূল বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের শাস্তি দাও ।' তিনবার বলেন । যখন তারা রাসূল এর বদ দুআর আওয়াজ শুনতে পেল, তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল । এবং তারা তার দুআকে ভয় করতে আরম্ভ করে । তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নাম ধরে ধরে বদ দুআ করে বললেন, 'হে আল্লাহ তুমি আবু জাহেল ইবনে হিশামকে ধ্বংস কর, উতবা বিন রাবিয়াকে ধ্বংস কর, শাইবা বিন রাবিয়া, ওয়ালিদ বিন উতবা, উমাইয়া

[১] লোকটির নাম উকবা বিন আবি মুয়াইত ।

বিন খালফ, উকবা বিন আবি মুয়িতকে ধ্বংস কর ।' এভাবে তিনি সাত জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে যাই । আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যের পয়গাম নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, তিনি যাদের নাম নেন, তাদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন দিন অধঃমুখে হয়ে পড়ে থাকতে দেখি । তারপর তাদের বদর গর্তে নিক্ষেপ করা হল ।[১]

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত : মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সবচেয়ে কঠিন যে আচরণ করে তার বর্ণনা

সহীহ আল-বুখারীতে[২] উরওয়াহ বিন যুবায়ের হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসকে বলি, মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সবচেয়ে খারাপ যে আচরণ করেছে আপনি আমাকে তার বিবরণ দিন । তিনি বলেন, 'একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর পাশে নামাজ আদায় করতে ছিলেন এ অবস্থায় উকবা বিন আবি মুয়াইত এসে রাসুলের গলা চেপে ধরে এবং তার শরীরের কাপড়কে তার গলায় পেঁছিয়ে দেয়, তারপর সে খুব জোরে গলা চাপা দিলো, আবু বকর রা. এসে তার গলাও চেপে ধরলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাকে দুরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন,

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ

'তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ ! এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণসমূহ নিয়ে এসেছেন?'[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের উপর মুশরিকদের নির্যাতনের আর কোন অন্ত রইল না । তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৪০, সহীহ সহীহ মুসলিম : ১৭৯৪

[২] সহীহ আল - বুখারী ৩৮৫৬

[৩] সুরা গাফের : ২৮

অনেকেই সাহায্য চাইলেন এবং আল্লাহর কাছে দুআ প্রার্থনা করতে এবং তাঁর সাহায্য কামনা করতে বলেন।
তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাহায্য লাভে প্রত্যয়ী ছিলেন এবং আল্লাহর মদদ তার পক্ষেই হবে এ বিশ্বাস তার পুরোপুরি ছিল। কারণ, তিনি জানতেন শেষ শুভপরিণতি একমাত্র মুত্তাকীদের পক্ষেই হয়ে থাকে এবং তারাই পরিশেষে সফলকাম হয়।
খাব্বাব ইবনুল আরত রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাবা শরীফের ছায়ায় শুয়ে আছেন এ অবস্থায় তার নিকট গিয়ে অভিযোগের স্বরে আমরা বললাম, 'মুশরিকদের নির্যাতনে আমরা অসহায় হয়ে পড়ছি, আপনি কি আমাদের জন্য বিজয় প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য দুআ করবেন না?' উত্তরে তিনি বলেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকদের নির্যাতনের অবস্থা ছিল : তাদের কোন এক লোককে ধরে আনা হতো এবং মাটিতে তার জন্য কূপ খনন করে তাকে এ কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতো। অথবা একটি কাঠ কাটার করাত দিয়ে মাথার উপর হতে নীচ পর্যন্ত কেটে দুই টুকরা করা হত এবং তাদের শরীরকে লোহার চিরুনি দ্বারা চিরুনি করা হতো। শরীরের হাড় ও রগ হতে গোশ্তকে আলাদা করে ফেলতো, তারপরও তাদের আল্লাহর ধর্ম থেকে বিন্দু পরিমাণও দূরে সরানো যেত না। আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ তার দীনকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। ফলে এমন একটি সময় আসবে যখন একজন লোক 'সানাআ' হতে 'হাদ্রামাউত' পর্যন্ত এমন নিরাপদে ভ্রমণ করবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। ছাগলের জন্য বাঘকে হুমকি মনে করবে না। কিন্তু তোমরা অতি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো।'[১]
মোট কথা, মুসলমানদের এবং বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তারা বিরামহীন নির্যাতন চালাতো এবং তাদের সর্ব প্রকার কষ্ট, যন্ত্রনা, মুসলমানদের সহ্য করতে হতো। কারণ, তাদের

[১] সহীহ আল - বুখারী : ৩৬১২

একমাত্র অপরাধ, তারা আল্লাহর দীনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। হক ও সত্যের উপর অটল ও অবিচল থেকেছে। জাহেলিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের কুসংস্কার এবং প্রতিমা পূজাকে বর্জন করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কী অপরাধ ছিল?

সপ্তম দৃষ্টান্ত : আবু লাহাবের স্ত্রীর ঘটনা
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের পক্ষ হতে কঠিন নির্যাতনের সম্মুখীন হন।
এমনকি তাকে এবং তার আনীত দীনকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তার নামের মধ্যে পর্যন্ত বিকৃতি আনতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেনি। তাদের শত্রুতা এবং বিরোধীতা ধর্মীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে তা তার ব্যক্তি পর্যায়েও নিয়ে আসে।
কুরাইশরা রাসুলের প্রতি তাদের অযৌক্তিক দুশমনী ও বাড়াবাড়িতে সীমা ছড়িয়ে যায়। যে নাম দ্বারা তার প্রশংসা বুঝায় তা পরিবর্তন করে, তার জন্য একটি বিপরীত নাম রাখে। যার অর্থ প্রকৃত নামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা 'মুজাম্মাম' বলে তার নামকরণ করে। আর যখন তার নাম আলোচনা করত, বলত : 'মুজাম্মাম এ কাজ করেছে এবং মুজাম্মাম এখানে এসেছে।' অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসিদ্ধ নাম হলো মুহাম্মাদ। মুজাম্মাম বলে কোন নাম তার নেই।
কিন্তু তার পরিণতিতে দেখা গেল, যে উদ্দেশ্যে এসব অপকর্মের আশ্রয় নিল, তা তাদের জন্য হিতে বিপরীত আকার ধারণ করল।[১]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এতে তোমরা আশ্চর্য বোধ কর না যে, আল্লাহ কীভাবে আমার থেকে কুরাইশদের গালি ফিরিয়ে নেন এবং তাদের অভিশাপ দেন। তারা মুজম্মামকে গালি দিত এবং মুজাম্মামকে অভিশাপ করতো আর আমিতো মুজাম্মাম নই, আমি মুহাম্মাদ।'[২]

[১] ফতহুল বারিঃ ৫৫৮/৬
[২] সহীহ আল - বুখারী ৩৫৩৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাঁচটি নাম ছিল[১] তার একটি নামও মুজাম্মাম ছিল না ।
আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল তার সম্পর্কে এবং তার স্বামী সম্পর্কে কুরআনে অবতীর্ণ চিরন্তন বাণীর কথা শুনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসল, রাসূল তখন কাবা গৃহের পাশে বসা ছিলেন । তার সাথে ছিল আবু বকর রা. । আর আবু লাহাবের স্ত্রীর হাতে এক মুষ্টি পাথর ছিল । সে যখন তাদের নিকটে এসে পৌঁছলো আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিলেন । সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আর দেখতে পেল না । শুধু মাত্র আবু বকরকে দেখতে পেল । তার উপর পর চড়াও হয়ে বলল, 'হে আবু বকর তোমার সাথি কোথায়? শুনতে পেলাম সে আমার দুর্নাম করে, শপথ করে বলছি, যদি তাকে পেতাম, আমি তার মুখে এ পাথরগুলো ছুড়ে মারতাম ।' মনে রেখো, আমি একজন কবি এবং তার বদনাম করতে আমিও কার্পণ্য করব না । তারপর সে এ কাব্যাংশ আবৃতি করেঃ
'আমি মুজাম্মামের নাফরমানি করি, তার নির্দেশের অমান্য করি এবং তার দীনকে ঘৃণা করি ।'[২]
মুশরিকরা রাসূল এবং তার অনুসারীদের কষ্ট দেয়া অব্যাহত রাখল এবং মুসলমানদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তাদের নির্যাতনের মাত্রা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের হিংসা বিদ্বেষ তত প্রকট আকার ধারণ করল । তারা তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি এবং বদনাম রটাতে অপচেষ্টা চালাত ।
তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসলমানদের দুরাবস্থা দেখতে পান এবং তিনি নিজেই একমাত্র আল্লাহর হেফাজতে বেচে আছেন এবং চাচা আবু তালেব তাকে সহযোগিতা করলেও সে মুসলমানদের কোন উপকার করতে পারছে না তাদের উপর যে ধরণের নির্যাতন চলছে তা সে কোন ভাবেই ঠেকাতে পারে না । এভাবে

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৫৩২
[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৫২৩/৪

মুসলমানদের দিনকাল অতিবাহিত হচ্ছিল, এরই মধ্যে অনেকে মারা যেত আবার কেউ কেউ অন্ধ হয়ে যেত আবার কেউ অর্ধাঙ্গ আবার কেউ বিকলাঙ্গ হয়ে যেত ।
বাধ্য হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার অনুমতি দেন । ফলে উসমান বিন আফ্‌ফানের নেতৃত্বে বার জন পুরুষ এবং চার জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন । তারা সাগর তীরে পৌছলে আল্লাহ তাদের জন্য দুটি নৌকার ব্যবস্থা করেন । তা দ্বার তারা তাদের গন্তব্য আবিসিনিয়ায় পৌছতে সক্ষম হন । তখন নবুওয়তের পঞ্চম বছরের রজব মাস ।
এদিকে কুরাইশরা তাদের সন্ধানে ঘর থেকে বের হলো এবং সাগরের তীর পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলো । কিন্তু তাদেরই দুর্ভাগ্য সেখানে গিয়ে তারা কাউকে পায়নি । তারপর তারা সেখান থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে মক্কায় ফিরে আসে ।
পরবর্তীতে আবিসিনিয়ায় একটি মিথ্যা সংবাদ পৌছলো যে, কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছে । তাই তারা পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন ।
কিন্তু তারা মক্কায় ফিরে এসে যখন জানতে পারেন এ খবরটা ছিল মিথ্যা-অপপ্রচার এবং এও জানতে পারেন, মুশরিকরা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন মুসলমানদের আরো বেশি কষ্ট দেয় । তাই তাদের কেউ কেউ অন্যের আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন আবার কেউ গোপনে মক্কায় প্রবেশ করেন । আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রা. আশ্রয় প্রার্থনা করে মক্কায় প্রবেশ করেন ।
এ ঘটনার পর হতে মুসলমানদের উপর নির্যাতন আরো বেড়ে যায় এবং আরো কঠিন অত্যাচারের সম্মুখীন হন ।
তাদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার তাদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন । দ্বিতীয়বার যারা হিজরত করেন তাদের সংখ্যা হল আশি জন ।

তাদের মধ্যে ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসার এবং নয়জন মহিলা। তারা সে দেশে নাজ্জাশী বাদশার আশীর্বাদে নিরাপদে বসবাস করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতে কুরাইশরা যখন জানতে পারল তখন তারা বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন নিয়ে নাজ্জাশী বাদশার নিকট দূত প্রেরণ করে। যেন সে আশ্রিত মুসলমানদের তার দেশ থেকে বের করে দেয় ও আবার মুশরিকদের নিকট ফেরত পাঠায়।[১]

অষ্টম দৃষ্টান্ত : উপত্যকায় রাসূলের বন্দি জীবন

যখন কুরাইশরা ইসলামের প্রচার প্রসার, ব্যাপকভাবে মানুষের ইসলাম গ্রহণ, ইথিওপিয়ায় মুহাজিরদের সম্মান ও নিরাপদ আশ্রয় ও কুরাইশ প্রতিনিধি দল নিরাশ হয়ে ফিরে আসার ব্যাপারগুলো অবলোকন করল, তখন ইসলামের অনুসারীদের প্রতি তাদের ক্রোধ বেড়ে গেল এবং তারা বনী হাশেম, বনী আব্দুল মুত্তালিব ও বনী আবদে মানাফের বিরুদ্ধে পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করতে একত্র হল। তারা তাদের সাথে লেনদেন করবে না। পরস্পর বিবাহ শাদী করবে না। কথা বার্তা বলবে না ও উঠা বসা করবে না। যাকে বলা যায় অবরোধ বা বয়কট। এ অবরোধ চলতে থাকবে যতক্ষণ না তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের হাতে সমর্পণ করবে। অতঃপর একটি চুক্তিনামা লিখে কাবার ছাদে ঝুলিয়ে দিল।

ফলে আবু লাহাব ব্যতীত বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের কাফের মুসলিম সকলে এক পক্ষ অবলম্বন করল। তারা মুসলিমদের সাথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। আবু লাহাব এদের গোত্রভুক্ত হওয়া সত্বেও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সমর্থক থেকে গেল।

নবুওয়তের সপ্তম বছরে মুহাররম মাসের শুরুর দিকের কোন এক রাত্রিতে আবু তালেব ঘাঁটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবরুদ্ধ করা হল। তারা সেখানে আবদ্ধ সংকীর্ণতা ও খাদ্য সমাগ্রীর অভাব এবং বিচ্ছিন্নাবস্থায় তিন বছর যাবৎ অবরোধের

[১]যাদুল মায়াদ:২৩,৩৬,৩৮/৩ , আর রাহীকুল মাখতুমপ:৮৯

দিনগুলো অতিবাহিত করলেন। এমনি হয়েছিল যে, ঘাটির আড়াল থেকে ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের কান্নাকাটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুক্তিপত্রের সম্পর্কে অবহিত করলেন যে, একটি উঁই পোকা পাঠিয়ে জোর, জুলুম, আত্মীয়তা ছিন্নের চুক্তির সব লেখা খাইয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার নামটি অবশিষ্ট আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সকলকে সংবাদ দিলেন। ফলে একজন কুরাইশদের কাছে গেল এবং সংবাদ দিল যে, মুহাম্মাদ চুক্তিপত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলছে। যদি সে এতে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে আমরা তাকে তোমাদের হাতে দিয়ে দেব। আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তোমাদের এই অবরোধ ও বয়কট থেকে ফিরে আসতে হবে। তারা বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ।' অতঃপর তারা কাগজের টুকরাটি নামিয়ে আনল। যখন তারা এই বিষয়টি রাসূলের কথামত দেখতে পেল তখন তাদের কুফরী আরো বেড়ে গেল। নবুয়তের দশম বছরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীরা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে থেকে বের হয়ে আসলেন। এর ছয় মাস পর আবু তালেব মৃত্যুবরণ করল। তার মৃত্যুর তিন দিন পর খাদিজা রা. ইন্তেকাল করেন।[১] কেউ কেউ অন্য মতও প্রকাশ করেছেন।

বয়কট ও অবরোধ অবসানের পর অল্প দিনের ব্যবধানে আবু তালেব ও খাদিজার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ফলে রাসূলের উপর তার সম্প্রদায়ের নির্বোধরা দুঃসাহসিকতার সাথে, প্রকাশ্যে, আরো বেশি উৎপীড়ন–নিপীড়ন করতে থাকল। যার কারণে তার দুঃচিন্তা বেড়ে গেল এবং তাদের থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। এবং তিনি তায়েফে চলে গেলেন এ আশায় যে, তায়েফবাসীরা তার ডাকে সাড়া দেবে। তাকে আশ্রয় দেবে। তাকে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। সেখানেও কেউ তাকে

[১] যাদুল মায়াদ:৩০/৩ ইবনে হিশাম:৩৭১/১...

আশ্রয় দেয়নি, কেউ সাহায্য করেনি। এবং তারা তাকে আরো বেশি কষ্ট দিয়েছে এবং তার সম্প্রদায়ে চেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে।[১]

নবম দৃষ্টান্ত : তায়েফ বাসীর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবুয়তের দশম বছরে শাওয়াল মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ বাসীর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার ধারণা ছিল যে, তিনি সকীফ গোত্রে তার দাওয়াতের প্রতি সাড়া ও সাহায্য পাবেন। তার সাথে ছিল আজাদ কৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে যে গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। তবে তাদের কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি।

যখন তিনি তায়েফে পৌঁছলেন তখন সেখানকার নেতাদের নিয়ে বসলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার দাওয়াতে তারা কোন ভাল উত্তর দেয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দশদিন অবস্থান করেন। এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকদের কাছে গিয়ে ইসলামের কথা বলেন। তাতে ও ভাল কোন সাড়া পাননি। বরং তারা বলল, 'তুমি আমাদের দেশ থেকে বের হও! আমরা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারলাম না।' তারা তাদের নির্বোধ ও বাচ্চাদেরকে তার প্রতি ক্ষেপিয়ে তার পিছনে লেলিয়ে দিল। অতঃপর যখন তিনি বের হতে ইচ্ছা করলেন তখন নির্বোধরা তার পিছু ধরল। তারা দু সারি হয়ে তাকে পাথর নিক্ষেপ করল। অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল এবং তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে পাথর নিক্ষেপ করে তার জুতাদ্বয় রক্তে রঞ্জিত করে দিল। আর যায়েদ বিন হারেসা নিজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করতে ছিলেন। যার কারণে তার মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে দুশ্চিন্তা ও ভগ্ন হৃদয় নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় আসার পথে আল্লাহ তাআলা পাহাড়-পর্বতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাসহ জিবরীলকে পাঠান। সে তার

[১] যাদুল মায়াদ:৩১/৩

কাছে অনুমতি চাচ্ছিল যে, দুটি পাহাড় যা তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা মক্কাবাসীর উপর নিক্ষেপ করতে।[১]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে কি উহুদ যুদ্ধের দিন অপেক্ষা আরো কোন ভয়ানক দিন এসেছে?' তিনি বললেন যে, আমি তোমার সম্প্রদায় থেকে যে কষ্ট পাওয়ার তাতো পেয়েছি। তবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি আকাবার দিন। যখন আমি ইবনে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কিলালের কাছে দাওয়াত পেশ করলাম তারা আমার আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় আমি চিন্তিত বেহুশ অবস্থায় চলে এলাম। 'কারনুস শাআলব' নামক স্থানে এসে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মাথা উত্তোলন করি তখন আমি একটি খন্ডমেঘ দেখতে পাই, যা আমাকে ছায়া দিচ্ছে। মেঘের দিকে তাকালে জিবরীলকে দেখি। অতঃপর সে আমাকে ডেকে বলল, 'আল্লাহ তাআলা আপনার সম্প্রদায়ের কথা ও তাদের উত্তর শুনেছেন।'

তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়েজিত ফেরেশ্তাকে পাঠিয়েছেন। আপনি তাদের ব্যাপারে যে শাস্তি চান তাকে নির্দেশ করতে পারেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তা আমাকে আওয়াজ দিল এবং আমাকে সালাম দিল। অতঃপর বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে আল্লাহ তাআলা তা শুনেছেন। আর আমিতো পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়েজিত ফেরেশ্তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। যদি আপনি চান তাহলে দু পর্বতের মাঝে তাদেরকে মিশিয়ে দেব।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'বরং আমি চাই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের পরবর্তী বংশধর থেকে এমন প্রজন্ম বের করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে যার কোন শরীক নাই। এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।'

[১] যাদুল মায়াদ: ৩১/৩, আর- রাহিকুল মাখতুম:১২২

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ উত্তরের মধ্যে তার অনন্য ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। এবং তার যে মহান চরিত্র ছিল, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেছিলেন, তাও প্রকাশ পেয়েছে।

এর মাধ্যমে তার জাতির প্রতি তার দয়া, ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর এটাই আল্লাহ তাআলার এ বাণীর সাথে মিলে যায় ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

(سورة آل عمران ١٥٩)

'অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়ে গেছ। আর তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে ফিরে যেত।'[১]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ سورة الأنبياء ١٠٧ ﴾

'আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।'[২]

আল্লাহ তাআলার অগণিত সালাত ও সালাম তার উপর বর্ষিত হউক।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'নাখলা' নামক স্থানে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এবং মক্কায় ফিরে আসতে সংকল্প করলেন। ইসলাম ও আল্লাহর শ্বাশত রেসালাত পেশ করার ব্যাপারে তার প্রথম পরিকল্পনা নতুন করে আরম্ভ করার ইচ্ছা করলেন নতুন উদ্যমে। তখনই যায়েদ বিন হারেসা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'তাদের কাছে নতুন করে কিভাবে যাবেন? তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে।' যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে যায়েদ! তুমি যা দেখতে পাচ্ছো,

[১] সূরা আলে ইমরান ২৫৩

[২] সূরা আল-আম্বিয়া ১০৭

আল্লাহ তাআলা এর থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তা দেখিয়ে দিবেন। আল্লাহ তার দীনের সাহায্য করবেন ও তার নবীকে বিজয় দান করবেন।

এরপর চলতে চলতে মক্কায় পৌঁছলেন। একজনকে 'খুজাআ' গোত্রের মুতয়েম বিন আদীর নিকট তার আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠালেন। মুতয়েম সাড়া দিলেন। তার সন্তান ও গোত্রের লোকদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা যুদ্ধাস্ত্র ধর এবং কাবা ঘরের কোণায় অবস্থান গ্রহণ কর। কেননা, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ বিন হারেসা রা. কে সাথে নিয়ে প্রবেশ করে কাবা ঘরে গিয়ে যাত্রা শেষ করলেন। মুতয়েম বিন আদী তার সওয়ারীর উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে কুরাইশ গোত্র! আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছি। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার সাথে বিদ্রুপ করবে না।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকনে ইয়ামানির কাছে গেলেন তা স্পর্শ করলেন। এবং দু রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। মুতয়েম বিন আদী ও তার সন্তানেরা তার বাড়িতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাকে অস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছিলো ।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে এই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তায়েফ সফরে, এটা তার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অদম্য ইচ্ছার স্পষ্ট প্রমাণ। এবং মানুষেরা তার দাওয়াতে সাড়া না দেয়ায় তিনি আশাহত হননি। যখন প্রথম প্রান্তরে কোন বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন দাওয়াতের নতুন প্রান্তর খুঁজেছেন।

এর মধ্যে এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রজ্ঞার শিক্ষক ছিলেন। আর এটা এ কারণে যে, তিনি যখন তায়েফ আসলেন তখন সমস্ত দলপতি ও তায়েফের সাকীফ গোত্রের প্রধানকে দাওয়াতের জন্য বাছাই করলেন। আর এটা তো জানা কথাই, তারা দাওয়াত গ্রহণ করলে সমস্ত তায়েফবাসীর দাওয়াত গ্রহণ করবে।

[১] দেখুন যাদুল মাআদ ৩/৩৩ এবং সীরতে ইবনে হিশাম ২/২৮ বিদায়া অন নিহায়া ৩/১৩৭ আর রহীকুল মাখতুম ১২৫ পৃঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই পা থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মধ্যে একথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের কাজে কতবড় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তিনি ।

নিজের জাতি ও তায়েফবাসীর উপর তার বদ-দুআ না করা, আর পর্বতসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে দুই পাহাড়ের মধ্যে ধ্বংস করার প্রস্তাবে সম্মতি না দেয়ার মধ্যে আরো বড় উদাহরণ যে, দায়ীর দাওয়াত গ্রহণ না করলে তাকে কত পরিমাণ ধৈয ধারণ করতে হয় । এবং তাদের হেদায়েত না পাওয়ার কারণে নিরাশ হওয়া যাবে না । হতে পারে আল্লাহ পরবর্তীতে তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন কাউকে বের করবেন, যে এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কৌশলের মধ্য থেকে ছিল, মুতয়েম বিন আদির আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেননি । আর এভাবেই দায়ীর উচিত এমন কাউকে তালাশ করা যে তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবে, যাতে সে চাহিদা অনুযায়ী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারে ।[১]

দশম উদাহরণঃ ব্যবসায়ী ও মওসুমী লোকদের কাছে তার দাওয়াত উপস্থাপন-

নবুওতের দশম বর্ষে জিলকদ মাসে তায়েফ থেকে মক্কায় ফেরার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন । তিনি সেখানকার মওসুমী বাজারগুলোতে যেতে আরম্ভ করলেন । যেমন, উকাজ, মাজান্নাহ, জিল-মাজাজ ইত্যাদি যে সমস্ত বাজারে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা উপস্থিত হতো ব্যবসার উদ্দেশ্যে, কবিতা পাঠের আসরে যোগ দেয়ার জন্য । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সমস্ত গোত্রের নিকট নিজেকে উপস্থাপন করলেন আল্লাহর দিকে

[১] দেখুন সীরাতে নববী শিক্ষা ও উপদেশ মুস্তফা সুবায়ী লিখিত ৮৫ পৃঃ এবং অহাজাল হাবিব ইয়া মুহিব ১৩৪ পৃঃ

তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে । একই বছর হজের মওসুম আসল তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতিটি গোত্রের নিকট গেলেন । তাদের নিকট ইসলাম উপস্থাপন করলেন, যেমন তিনি তাদেরকে নবুওতের চতুর্থ বর্ষ থেকে দাওয়াত দিতেন ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলাম পেশ করে ক্ষ্যান্ত থাকেননি, বরং ব্যক্তির কাছেও ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মানুষদেরকে উৎসাহ দিতেন সফলতার দিকে ।

আব্দুর রহমান বিন আবিজ যানাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দিল, যে রবিয়াহ বিন আব্বাদ বলে পরিচিত । সে বনি দাইল গোত্রের এবং জাহেলী যুগের লোক ছিলো । সে বলল, আমি জাহেলী যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিল মাজাজ বাজারে দেখলাম । তিনি বলছেন, 'হে মানব সকল! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তা হলে তোমরা সফলকাম হবে ।' এ অবস্থায় লোকেরা তার পাশে জড়ো হয়ে আছে । এবং তার পিছনে প্রশস্ত চেহারার এক ব্যক্তি দাড়িয়ে আছে । সে বড় বড় ব্যাকা চোখের অধিকারী । সে বলছে, 'এই মুহাম্মদ নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, সে মিথ্যাবাদী ।' যেখানেই তিনি যাচ্ছেন, এ লোকটি তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে । আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম । তারা আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ পরিচয় উল্লেখ করল এবং বলল, 'সাথের এ লোকটি তার চাচা আবু লাহাব ।'[১]

অন্যান্য আরবের মত আউস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকেরাও হজ করত । কিন্তু ইহুদীরা হজ করত না । যখন আনছাররা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা এবং দাওয়াতকে দেখল

[১] আহমদ ৪/৩৪৭,৩ /৪৯২' তার বর্ণনা সূত্র সুন্দর হাকেম

তখন বুঝতে পারল যে, ইনিই সেই লোক যার সম্পর্কে ইহুদীরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই তারা ইহুদীদের আগে ঈমান আনতে চাইল। কিন্তু তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে এ বছর বাইয়াত গ্রহণ করল না। মদীনায় ফিরে গেল।

নবুওতের একাদশ বর্ষে হজের মওসুমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের নিকট উপস্থিত হচ্ছিলেন, সে সময় মিনার গিরিপথে ইয়াসরেবের ছয় যুবককে পেলেন। তাদের নিকট ইসলাম পেশ করলেন। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত কবুল করলেন। তারা ইসলামের দীক্ষা নিয়ে তাদের জাতির নিকট ফিরে গেলেন।[১]

অতঃপর বছর ঘুরে নতুন বছর আসল। নবুওতের দ্বাদশ বর্ষে লোকেরা হজে করতে আসল। ইয়াসরেবের হাজীদের মধ্য থেকে বারজন আসল। এদের মধ্যে গত বছরের ছয়জনের পাঁচজনও ছিল। অঙ্গীকার অনুযায়ী মিনার গিরিপথে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হল ও ইসলাম গ্রহণ করল। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল। যা ইতিহাসে বাইয়াতুন নিসা নামে পরিচিত।[২]

উবাদাহ বিন ছামেত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাহদের একটি দল পরিবেষ্টিত অবস্থায় বললেন, 'আস! তোমরা আমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ কর। শপথ কর এ কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। চুরি করবে না। ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। তোমাদের নিজের কৃত অপরাধকে অন্যের উপর অপবাদ হিসেবে চাপিয়ে

[১] তারিখে ইসলাম মাহমুদ শাকেরের ২য় খন্ড ১৩৭ পৃঃ ওয়া হাজাল হবিব ইয়া মুহিব ২য় খন্ড ১৪৫ পৃঃ রহিকুল মাখতুম ১৩২ পৃঃ ১যাদুল মায়াদ ৩য় খন্ড ৪৫ পৃঃ ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ৩৮ পৃঃ বিদায়া নিহায়া ৩য় খন্ড ১৪৯ পৃঃ

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম

দেবে না। কোন ন্যায় কাজে আমার অবাধ্য হবে না। যে এ অঙ্গীকারগুলো পরিপূর্ণরূপে পালন করবে তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে। আর যে ব্যক্তি এর মধ্য থেকে কোন কাজ করে ফেলবে, অতঃপর পৃথিবীতে তাকে শাস্তি দেয়া হলে তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এর মধ্য থেকে কোন কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ গোপন রাখেন, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট অর্পিত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা মাফ করে দিতে পারেন।' এই কথাগুলোর উপর আমরা তার নিকট বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করলাম।[১]

যখন বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হল, এবং হজ মওসুম শেষ হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে মুছআব বিন উমায়ের রা. কে পাঠালেন মুসলমানদেরকে ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারের কাজ করার জন্য। তিনি তার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করলেন। নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজের মওসুমে হজ পালনের জন্য ইয়াসরেব থেকে তিয়াত্তর জন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা উপস্থত হলেন এবং তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

যখন তারা মক্কায় আসল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাবায় তাদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করলে তারা সময়মত সেখানে উপস্থিত হল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে কথা বললেন। অতপর তারা বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার নিকট কি বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ করব? তিনি বললেন, 'তোমরা আমার নিকট বাইয়াত করবে সুখ ও দুঃখ সর্বাস্থায় আমার আনুগত্য করবে এবং আমার কথা শুনবে। সুখে দঃুখে খরচ করবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। এক আল্লাহর কথা বলবে। এ বিষয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করবে না। এবং আমাকে সাহায্য করবে। আমার কাছ থেকে বাধা দেবে ঐ সমস্ত জিনিস যা তোমরা তোমাদের নিজের থেকে ও স্ত্রীদের থেকে এবং সন্তানদের থেকে বাধা

[১] সহীহ আল - বুখারী ফতহুলবারী সহ ৭ম খন্ড ২১৯ পৃষ্ঠা সনদকে হাফেজ ইবনে হাজার হাসান বলেছেন।

দিয়ে থাক । তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ।' তারা সবাই উঠে রাসুলের কাছাকাছি গেল এবং তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করল ।

আর এই বাইয়াত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য বারজন নেতা ঠিক করে দিলেন, যারা তাদের গোত্র প্রধান হবেন । নয়জন ছিল খাজরাজ গোত্রের এবং তিনজন ছিল আওস গোত্রের । অতঃপর তারা ইয়াসরেবে ফিরে গেল । এবং সেখানে পৌছার পর তারা ইসলাম প্রকাশ করল । আল্লাহর প্রতি দাওয়াতে তাদের দ্বারা অনেক খেদমত হল ।[১]

দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের জন্য একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সফল হলেন । সংবাদটি অধিকহারে মক্কায় প্রচার হল এবং কুরায়েশদের নিকট এ কথা প্রমাণ হল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াসরেববাসীদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন । এতে মক্কায় যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল । এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন । মুসলমানরা হিজরত করল । কুরাইশরা বৈঠকে বসল । তখন নবুওয়তের চতুর্দশ বর্ষে ২৬শে ছফর তারিখ । তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার বিষয়ে একমত হল । এ সংবাদ অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন । তার সুন্দর কৌশল ছিল । তিনি আলী রা. কে নির্দেশ দিলেন, সে যেন আজ রাতে তার বিছানায় ঘুমায় । মুশরিকরা দরজার ফাক দিয়ে আলী রা. কে দেখে মুহাম্মাদ ভেবে অপেক্ষা করতে থকল । এ অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে গেলেন এবং আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করলেন ।[২]

---

[১] তারিখে ইসলাম মাহমুদ শাকেরের ২য় খন্ড ১৪২ পৃঃ পৃঃ রহিকুল মাখতুম ১৪৩ পৃঃ ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ৩৯ পৃঃ বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩য় খন্ড ১৫৮ পৃঃ

[২] ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ৯৫ পৃঃ বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩য় খন্ড ১৭৫ পৃঃ জাদুল মায়াদ ৩য় খন্ড ৫৪ পৃঃ সিরাতে নববী মুস্তফা সুবায়ী রচিত ৬১ পৃঃ ওয়া হাজাল হাবিব ইয়া মুহিব ১৬৫ প

আর এই মহান অবস্থান যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন, স্পষ্ট প্রমাণ যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌশল বা হিকমত অবলম্বন করেছেন, এবং তিনি ধৈর্য্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন । আর তিনি যখন জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা সীমালংঘন করেছে ও দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে তখন এমন একটি স্থান তালাশ করেছেন, যাকে ইসলামী দাওয়াতের ঘাটি বানাবেন । তিনি শুধু এ পরিকল্পনা করেই ক্ষ্যান্ত হননি, বরং তাদের নিকট থেকে ইসলামকে সাহায্য করার ব্যাপারে বাইয়াত ও অঙ্গীকার নিয়েছেন । এ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে দুটি সম্মেলনের মাধ্যমে : প্রথম আকাবার বাইয়াত, অতঃপর দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত । তিনি একটি স্থানকে দাওয়াতের ঘাটি বানাবেন বলে খুঁজছিলেন যখন তা পেয়ে গেলেন এবং দাওয়াতের সাহায্যকারীও পেয়ে গেলেন । তিনি তার সাথীদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন । যখন তার বিরুদ্ধে কুরায়েশরা চক্রান্ত করল তখন তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন । । আর এ কাজটিকে কাপুরুষতা ধরা হয় না, বা মৃত্যু থেকে পলায়নও বলা যায় না । হ্যাঁ আল্লাহর উপর ভরসা করে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় । আর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কুটনীতিই হল দাওয়াতের সফলতার কারণ । আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের এমনই হওয়া উচিত, কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন তাদের আদার্শ ও নেতা ।[১]

একাদশ উদাহরণঃ তার মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত হল এবং দানদান মুবারক শহীদ হল

সাহল বিন সাআদ রা. থেকে বর্ণিত, তাকে প্রশ্ন করা হল, উহুদ দিবসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহত হওয়া সম্পর্কে । তিনি বললেন, 'তার মুখমন্ডল আহত হল, এবং তার দাঁতগুলো ভেঙ্গে গেল । বর্মের ভাঙ্গা অংশ তার মাথায় প্রবেশ করল । ফাতেমা রা. রক্ত পরিস্কার করছিলেন, এবং আলী রা. রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন । যখন

---

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৪৭৭ সহীহ মুসলিম ১৭৯২ শরহে নববী ১২খন্ড ১৪৮ পৃঃ

দেখলেন রক্ত বন্ধ না হয়ে আরো বেশি পরিমাণে বের হচ্ছে তখন ফাতেমা চাটাইতে আগুন ধরিয়ে দিলেন, পুড়ে ছাই হয়ে গেল । অতঃপর তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তখনই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল ।[১]

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কঠিন কষ্ট বরদাশত করছিলেন । যার মহত্বের কাছে পাহাড়ও কেঁপে উঠে । তিনি এমন এক নবী, যিনি এ অবস্থায়ও তার জাতির বিরুদ্ধে বদ-দুআ করেননি । বরং তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করেছেন । কেননা তারা বুঝে না ।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখনো মনে হয় আমি রাসুলের দিকে চেয়ে আছি আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন যাকে তার জাতি মেরেছে । এ অবস্থায় তিনি চোখ থেকে পানি মুছছিলেন । এবং বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে মাফ করে দিন তারা বুঝে না ।'[২]

সমস্ত নবীগণ এবং তাদের মধ্যে সবার উপরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ও সহনশীলতা, ক্ষমা, ও দয়ার মুর্ত প্রতীক ছিলেন । তিনি তার জাতির জন্য ক্ষমা ও করুণার সকল দ্বার খুলে দিয়েছিলেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর অভিশাপ ঐ জাতির উপর অধিক হারে পতিত হয়, যে জাতি তাদের রাসুলের সাথে এ আচরণ করে । এ কথা বলার সময় তিনি তার দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন । আল্লাহ তাআলার ক্রোধ কঠোরতর হল এমন ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহর রাসুল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল ।[৩]

উহুদ দিবসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহত হওয়ার মধ্যে দাওয়াত-কর্মীদের জন্য সান্তনা রয়েছে; তারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের শরীরে যে কষ্ট বরদাশত করবে, অথবা তাদের স্বাধীনতা হরণ করা হবে অথবা তাদেরকে যে নির্যাতন করা হবে সে সকল বিষয়ে তারা

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪০৭৩ সহীহ মুসলিম ১৭৯৩
[২] সীরাতে নববী দুরুস ও ইবর ১১৬ পৃঃ
[৩] শরহে নববী ১২ খন্ড ৪৩৬ পৃঃ

আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত হবে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন উত্তম আদর্শ । তাকে যখন কষ্ট দেওয়া হয়েছে আর তিনি তাতে ধৈর্য ধারণ করেছেন । তাহলে অন্য দাওয়াত-কর্মীদের তো তা বরদাশত করতেই হবে ।[১]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বীরত্ব

যুদ্ধ এবং লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বীরত্ব দেখানো অবশ্যই ধৈর্যের পরিচায়ক । এবং এর দ্বারা ভীতির উদ্রেক থেকে নিজের আত্মার উপর নিয়ন্ত্রন রাখা যায় । মানুষ যে সকল স্থানে বীরত্বকে ভাল চোখে দেখে, সে সকল স্থানে কাপুরুষতা প্রদর্শন সাহসিকতার বিরোধী বলে গণ্য ।

বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে রাসুলের সীরাতের কিছু উদাহরণ দেয়া হল, আর এই উদাহরণগুলো দ্বারা মানুষ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে উত্তম আদর্শ পাবে । এই জন্যই তো তিনি অন্তর, জিহবা, তরবারী, দাঁত, দাওয়াত ও বক্তৃতা দ্বারা জিহাদ করেছেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৬টি অভিযান প্রেরণ করেছেন । আর তিনি নিজে সরাসরি ২৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন । এর মধ্যে ৯টি তে নিজে প্রত্যক্ষ লড়াই করেছেন ।[২]

উদাহরণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

প্রথম উদাহরণঃ বদরের যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বীরত্ব-

[১] সীরাতে নববী দুরুস ও ইবর
[২] সীরতে ইবনে হিশাম ২খন্ড ২৫৩ পৃঃ ফতহুল বারী ৭ম খন্ড ২৮৫ পৃঃ যাদুল মা'আদ ৩য় খন্ড ১৭৩ পৃঃ আর রহীকুল মাখতুম ২০০পৃঃ সহীহ আল - বুখারী ৩৯৫২ সহীহ মুসলিম ১৭৭৯ তারিখে ইসলামী মাহমুদ শাকের ২য় খন্ড ১৯৪ পৃঃ

তার যে সকল অবস্থান হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ তার একটি হল, তিনি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে লেকেদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। কেননা তিনি যুদ্ধে আনছারদের আগ্রহ বুঝার চেষ্টা করছিলেন। বাইয়াতের মধ্যে তাদের সাথে শর্ত করা হয়েছিল যে, মদীনায় থেকে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষে ঐ সমস্ত জিনিসকে প্রতিরোধ করবেন যা তারা সাধারনত নিজেদের জন্য, মাল সম্পদের রক্ষায়, সন্তান ও স্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য করে থাকেন। মদীনার বাহিরে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তাদের সাথে কোন শর্ত ছিল না। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে পরামর্শ করতে চাইলেন। তাদেরকে একত্রিত করলেন ও পরামর্শ করলেন। আবু বকর রা. দাড়ালেন এবং সুন্দরভাবে বললেন। এরপর উমার রা. দাড়ালেন ও সুন্দরভাবে বললেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূনরায় পরামর্শ চাইলেন। এইবার মিকদাদ রা. দাড়ালেন, তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ আপনাকে যে পথে চলতে নির্দেশ করেছেন আপনি সে পথে চলুন। আমরা সবাই আপনার সাথে। আল্লাহর শপথ আপনাকে আমরা তেমন বলব না যেমন বলেছিল বনী ইসরাঈল মুসা আ. কে যে 'আপনি ও আপনার প্রভু যান, যুদ্ধ করুন। আমরা এখানে বসে থাকি।' কিন্তু আমরা বলছি 'আপনি এবং আপনার প্রভূ যান যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করব। আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে, পিছনে, সর্বত্র যুদ্ধ করব।' রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় বার মানুষের সাথে পরামর্শ করলেন। আনছাররা বুঝতে পারল, তাদের মতামত চাওয়া হচ্ছে। সাআদ বিন মুআজ রা. সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! মনে হয় আপনি আমাদের মতামত চাইছেন। আসলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মতামতই চাচ্ছিলেন। কেননা তারা বাইয়াত করেছিল, দেশের মধ্যে অবস্থান করে তারা রাসূলের পক্ষে প্রতিরোধ করবে। কিন্তু যখন মদীনার বাহিরে লড়াই করার প্রশ্ন আসল তখন তাদের মতামত নেয়া খুবই জরুরী মনে করলেন। অতঃপর যখন বের হওয়ার সংকল্প করলেন, তাদের সাথে পরামর্শ করলেন, যাতে তাদের

মনের অবস্থা জানতে পারেন। সাআদ রা. তাকে বললেন, 'মনে হয় আপনি ভয় পাচ্ছেন যে, আনছারদের এ অধিকার আছে তাদের নিজেদের দেশে ছাড়া আপনাকে সাহায্য করবে না। আমি আনছারদের পক্ষ থেকে বলছি ও উত্তর দিচ্ছি, আপনি যেখানে ইচ্ছা গমন করুন। যাকে ইচ্ছা নিয়ে যান। যাকে ইচ্ছা বাদ দিন। আমাদের সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছা আমাদের জন্য রেখে যান। আমাদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করবেন তা আমাদের নিকট বেশি প্রিয় তার চেয়ে যা আমাদের জন্য রেখে যাবেন। আমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ করতে চান, করুন। আমরা আপনার আদেশের অনুগত। আল্লাহর শপথ! আমাদেরকে নিয়ে চলতে চলতে যদি গামদান এর হ্রদে পৌছে যান, অবশ্যই আমরা আপনার সাথে চলব। ঐ সত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে এই সমুদ্রে নিয়ে পরীক্ষা করেন, আর আপনি তাতে প্রবেশ করেন, আমরাও আপনার সাথে প্রবেশ করব। আমাদের মধ্য থেকে একজনও পিছনে থাকবে না। আর আমরা এটাও অপছন্দ করব না যে, আমাদেরকে নিয়ে আগামী কালই শত্রুদের মুখোমুখী হবেন। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল, শত্রু সাক্ষাতে সত্যবাদী। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে এমন কিছু দেখাবেন যা আপনার চক্ষু শীতল করবে। আল্লাহর বরকতের উপর নির্ভর করে আমাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।' এই বক্তব্যে রাসুলুল্লার চেহারা মুবারক আলোকিত হল। আনন্দ ফুটে উঠল এবং তাকে পুলকিত করল। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'চলো এবং সুভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ আমার সাথে দুইটি দলের একটির অঙ্গীকার করেছেন। মনে হয় আমি এখন সে জাতির ধংস দেখতে পাচ্ছি।'[1]

বদরের যুদ্ধে রাসুলের বিশেষ অবস্থানের মধ্যে একটি ছিল আল্লাহ তাবারকা ও তাআলার উপর তার অগাধ ভরসা। কেননা তিনি জেনেছিলেন যে, বিজয় অধিক সংখ্যক যোদ্ধা বা শক্তির কারণে আসবে

না। বরং বিজয় হবে আল্লাহর সাহায্যে উপকরণ গ্রহণ ও আল্লাহর উপর ভরসা করার মাধ্যমে।

উমার বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর দিবসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। এবং তার সাথীদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে ফিরলেন, অতঃপর দু হাত উত্তোলন করে তার প্রভূর নিকট উচু কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। 'হে আল্লাহ আমাকে যা অঙ্গীকার করেছেন তা পরিপূর্ণ করে দিন, হে আল্লাহ ইসলাম অনুসারী এ দলকে যদি আপনি ধংস করে দেন তা হলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার কেহ থাকবে না।' হাত উঠিয়ে কেবলামুখী হয়ে উচ্চ কণ্ঠে তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনায় এমনভাবে রত ছিলেন যে, তার কাধের উপর থেকে চাদর পড়ে গেল, আবু বকর রা. তার নিকট আসলেন, চাদর উঠালেন কাধের উপর ফেলে দিলেন, অতঃপর পিছনে তার গায়ে লেগে বসলেন, ও বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা যথেষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা আপনার জন্য অঙ্গীকার করেছেন তা আপনাকে দিবেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ন করলেনঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿الأنفال:٩﴾

'স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে সাহায্যের আবেদন করেছিলে। আর তিনি সেই আবেদন কবুল করেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা ধারাবাহিকভাবে আসবে।"[১]

আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে রাসুলকে সাহায্য করেছেন।[২]

[১] সূরা আল-আনফাল ৯

[২] সহীহ মুসলিম ১৭৬৩ সহীহ আল - বুখারী ৩৯৫২ আর রাহীকুল মাখতুম ২০৮ পৃঃ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুর নিচ থেকে বের হতে হতে বলছিলেনঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿القمر٤٥﴾

"এইদল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।"[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে লড়াই করলেন এমনভাবে যে, তিনি সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। রাসুলের সাথে আবু বকর রা. ছিলেন, যেমন তারা দুজন তাবুতে দুআ ও কান্নাকাটির মাধ্যমে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। অতঃপর তারা দু'জন নীচে নেমে আসলেন সকলকে উদ্বুদ্ব করলেন। এবং দুজনই স্ব শরীরে যুদ্ধ করলেন। জিহাদের পবিত্র দু' স্তরের সমন্বয় তারা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের চেয়ে বড় বীর ছিলেন। আলী বিন আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, বদর দিবসে দেখেছি, আমরা যখন তার কাছাকাছি অবস্থান করছিলাম, তিনি আমাদের চেয়ে শত্রুদের বেশি নিকটবর্তী ছিলেন, সে দিন তিনি সকলের চেয়ে কঠিন আক্রমণকারী ছিলেন।'[২]

আলী রা.বলেন, 'যুদ্ধের দাবানল যখন জলে উঠত এবং এক জাতি আর এক জাতির মুখোমুখী হত, তখন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতাম। আমাদের কেহ রাসুলের চেয়ে শত্রু বাহিনীর বেশি নিকটবর্তী হতো না।'[৩]

দ্বিতীয় উদাহরণঃ উহুদের যুদ্ধে রাসুলের বীরত্ব

বীরত্বের ব্যাপারে এবং নিজ জাতির নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে উহুদের যুদ্ধে তার অবস্থান ছিল অনেক উর্ধে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বড় ধরণের লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

[১] সুরা কামার ৪৫

[২] আহমদ ১ম খন্ড ৮৬ পৃঃ হাকেম ২য় খন্ড ১৪৩ পৃঃ

[৩] হাকেম ২য় খন্ড ১৪৩ পৃঃ আল বিদায়া ও আন নিহায়া ৩য় খন্ড ২৭৯পৃঃ

মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের রাষ্ট্র তখন দিপ্রহারের অগ্রভাগে ছিল। আল্লাহর দুশমনেরা পিঁছু হটতে হটতে পালিয়ে গেল। তারা তাদের নারীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। যখন গিরিপথ পাহাড়ারত মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী তাদের পরাজয় দেখল। তারা তাদের স্থান ত্যাগ করেছিল যেখানে রাসুল তাদেরকে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছিলেন সর্বাবস্থায়। আর এটা এ কারণে হয়েছিল যে, তারা মনে করেছিল, মুশরিকরা আর ফিরে আসবে না। অতঃপর তারা পাহাড়ের পথ খালি করে দিয়ে যুদ্ধ লব্দ সম্প্দের খোঁজে চলে গেল। মুশরিকদের অশ্বারোহী দল আবার ফিরে আসল। তীরন্দাজ বাহিনী মুক্ত সীমান্ত পেল। তারা মুখোমুখী হল ও সেখানে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করল। তাদের সর্বশেষ জনও সেখানে আসল। মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল। তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা শহীদি মর্যাদা দিতে চাইলেন দিলেন। এরা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর জন। সাহাবায়ে কেরাম পিছনে সরে গেলেন এবং মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারি পাশে সমবেত হল। রাসুলের চেহারা মুবারক আহত করল এবং তার নিচের ডান দিকের দাঁত ভেঙ্গে গেল। বর্মের সুঁচালো মাথা তার মাথায় বিদ্ধ হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বাচানোর জন্য লড়াই করে যেতে থাকলেন।[১]

রাসুলের পাশে কুরাইশ গোত্রের দু'জন ছিল। আনছরদের মধ্য থেকে ছিল সাতজন। যখন তারা রাসুলের নিকটে এসে পড়ল এবং কাছকাছি পৌঁছল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে, অথবা জান্নাতে সে আমার সঙ্গী হবে।' আনছারদের মধ্য থেকে একজন সামনে অগ্রসর হল শাহাদত বরণ করা পর্যন্ত লড়াই করল। অতঃপর তারা রাসুলের আরো নিকটে চলে আসল। রাসুল আবার বললেন, 'তাদেরকে যে সরিয়ে দেবে তার জন্য জান্নাত।' আনছারদের একজন অগ্রসর হল সে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেল। এভাবে সাতজন শহীদ

[১] যাদুল মাআদ ৩য় খন্ড ১৯৬-১৯৯ আর রহীকুল মাখতুম ২৫৫-২৫৬

হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই সঙ্গীকে বললেন, রণাঙ্গনের সীমান্ত ছেড়ে দিয়ে আমাদের সাথীরা ঠিক কাজ করেনি।[১]

মুসলমারা যখন একত্রিত হল, এবং যে গিরিপথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান নিয়েছিলেন, সেখানে তারা পৌঁছলো এবং তাদের মাঝে আবু বকর, উমার, আলী, হারেস বিন ছম্মাহ আল আনছারী প্রমুখ ছিলেন। তারা যখন পাহাড়ে হেলান দিয়ে বসলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই বিন খালাফকে তার ঘোড়ায় পেলেন। সে বলছে, মুহাম্মাদ কোথায়? সে যদি বেচে যায় আজ আমার রক্ষা নেই। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মধ্য থেকে কে তার দিকে অগ্রসর হবে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তার দিকে যেতে নিষেধ করলেন। অতপর যখন তার নিকটবর্তী হল, হারেস বিন ছাম্মাহ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্শা নিয়ে নিলেন। যখন তার থেকে বর্শাটি নিলেন, সে কেঁপে উঠল এমনভাবে যেমন উটের পিটের উপর থেকে লোম উঠালে সে কেঁপে উঠে। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সামনা-সামনি হলেন এবং তার লৌহ বর্ম ও মাথার টুপির মধ্য থেকে তার গলার লক্ষ্য-বস্তু ঠিক করে নিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জাগায় তাকে আঘাত করলেন। আঘাতে সে তার ঘোড়ার উপর কয়েকবার চক্কর মারল। বার বার কেঁপে উঠল। আল্লাহর দুশমন যখন সামান্য আঘাতের চিহ্ন নিয়ে কুরায়েশদের নিকট ফিরে গেল। সে বলল, 'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছে।' তারা তাকে বলল, মনে হচ্ছে তোমার জান বের হয়ে গিয়েছে। তোমার মারাত্মক কোন ক্ষত আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। সে বলল, 'মুহাম্মাদ তো মক্কায় আমাকে বলেছিল, আমি তোমাকে হত্যা করব। আল্লাহর শপথ সে যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করে তবুও আমি মনে করব

[১] সহীহ মুসলিম ১৭৮৯

সে আমাকে হত্যা করেছে।' তারা মক্কায় ফেরার পথে আল্লাহর এই শত্রু ছারফ নামক স্থানে মারা গিয়েছিল।[১]

তৃতীয় উদাহরণঃ হুনাইন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বীরত্ব

হুনাইন যুদ্ধে মুসলমান এবং কাফেররা মুখোমুখী হওয়ার পর, মুসলমানরা পিছনে ফিরে পালাতে লাগল।[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের দিকে তার খচ্চর হাঁকাতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর বললেন, 'হে আব্বাস! রাত্রে গল্প-গুজব যারা করছিল তাদেরকে আহবান কর।' আব্বাস রা. উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি উচ্চ স্বরে বললাম, 'রাত্রে গল্প-গুজবকারীরা কোথায়?' আল্লাহর শপথ! তারা যখন আমার কণ্ঠ শুনলো তখন তাদের সহানুভূতির অবস্থা এমন ছিল, যেমন গাভীর সহানুভূতি তার বাছুরের প্রতি হয়ে থাকে। তারা বলল, 'হাজির! হাজির! কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খচ্চরের উপর বসে প্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে তাদের যুদ্ধ দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'এখন যুদ্ধের তীব্রতা বেড়েছে।'[৩]

এই অবস্থানেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে যার থেকে অনেক মহান ব্যক্তিরা অপারগ হয়ে গিয়েছে।[৪]

বারা ইবনে আযেব রা.কে লক্ষ্য করে কোন এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'হে আবু আমারা! তোমরা কি হুনাইনের দিনে পালিয়ে গিয়েছিলে?' তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসুল পালায়ন করেননি।

[২] যাদুল মা'আদ ৩য় খন্ড ১৯৯ পৃঃ আর রহীকুল মাখতুম ২৬৩ পৃঃ বিদায়া নিহায়া ৪খন্ড ৩২ পৃঃ তবারী ২য় খন্ড ৬৭ পৃঃ ফিকহুস সীরাহ ২২৬ পৃঃ

[৩] সহীহ মুসলিম ১৭৭৫

[৪] আর রহীকুল মাখতুম ৪০১ পৃঃ ওয়াহাজাল হাবিব ইয়া মুহিব ৪০৮ পৃঃ

কিন্তু তার যুবক সাথীরা যারা তাড়াতাড়ি করেছিল, যাদের নিকট অস্ত্র ছিল না বা কম ছিল। তারা এমন লোকদের সাথে সামনে পড়ে গেল যারা তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিল। হাওয়াযেন ও নছর গোত্রের বিরাট একটি দল সম্মিলিতভাবে তাদের উপর তীর বর্ষণ করল। তাদের নিশানা ব্যর্থ হচ্ছিল না। তারা উন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসল। সকলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে আসল। আবু সুফিয়ান বিন হারেস রাসুলের খচ্চর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসুল নেমে পড়লেন, ও দুআ করলেন, আল্লাহর সাহায্য কামনা করে বলতেছিলেনঃ

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب، اللهم نزّل نصرك

'আমি সত্য নবী, আমি আব্দুল মুত্তালিব এর সন্তান, হে আল্লাহ আপনার সাহায্য অবতীর্ন করুন!'[১]

বারা রা. বলেন যখন প্রচন্ড লড়াই শুরু হল, আমরা রাসুলের কাছাকাছি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম, আমাদের মধ্যে বীর তিনিই ছিলেন যার কাছাকাছি সবাই যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[২]

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় সালামাতা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভীতু অবস্থায় আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তার শাহবা নামক খচ্চরের উপর ছিলেন। ইবনুল আকওয়াকে কম্পমান অবস্থায় দেখলাম। সবাই যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ধরল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খচ্চরের উপর থেকে নেমে পড়লেন। অতঃপর যমীন থেকে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিলেন এবং শত্রু বাহিনীর মুখের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তাদের চেহারা কালো হয়ে গেল। তাদের সকলের চোখ একমুষ্টি মাটিতে ভরে গেল। তারা পিছন ফিরে পালাল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে

[১] সহীহ মুসলিম ১৭৭৬

[২] সহীহ মুসলিম ১৭৭৬

পরাজিত করলেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধলব্দ সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন ।[১]

আলেমগণ বলেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খচ্চরে আরোহণ করা হল যুদ্ধের ময়দানে কঠিন যুদ্ধের সময় বীরত্ব এবং দৃঢ়তার চুড়ান্ত পর্যায় । তাছাড়া লোকরা তো তার নিকটেই ফিরে আসছিল । তার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করছিল । আর এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন ইচ্ছাকৃত ভাবে । কেননা, তার নিকটে অনেক প্রশিক্ষিত ঘোড়া ছিল । তা রেখে তিনি খচ্চরের পিঠে আরোহণ করেছিলেন ।'

আর তার বীরত্বের প্রমাণ এটাও বহন করে যে, তিনি তার খচ্চরকে লাফাতে লাফাতে মুশরিকদের ভীড়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন । আর শত্রু পক্ষের লোকেরা পালাচ্ছিল । রাসূলুল্লাহ সা. মাটিতে নেমে আসেন এমন সময় যখন সকলে তাকে ঘিরে ধরেছিল । বীরত্ব ও ধৈর্যের শেষ পর্যায় তিনি প্রদর্শন করেছেন । কেহ কেহ বলেন, 'রাসুল এমন করেছিলেন যারা মাটিতে ছিলেন তাদের সাথে একত্বতা প্রকাশের জন্য ।' সাহাবীগণ হুনাইন যুদ্ধ ক্ষেত্রের সর্বত্র তার বীরত্বের আলোচনা করেছেন ।[২]

চতুর্থ উদাহরণঃ নিজ সাথীদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বীরত্ব

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশি দানশীল, ও সবার চেয়ে সাহসী মানুষ ছিলেন । এক রাতে মদীনাবাসী একটি ভয়ানক আওয়ায শুনে ভয় পেয়ে গেল । কিছু মানুষ শব্দের দিকে চলে গেল, তারা দেখল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসছেন । তিনি সকলের আগে আওয়াযের দিকে পৌঁছে

[১] সহীহ মুসলিম ১৭৭৭

[২] নববী ১২ খন্ড ১১৪ পৃঃ

গিয়েছিলেন । তিনি ফিরে আসছিলে আর বলছিলেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, তোমরা ভয় পেয়ো না ।' তিনি আবু তালহার ঘোড়ার উপর ছিলেন । তার শরীরে চাদর ছিল না । তার কাঁধের উপর ছিল একটি তরবারী । বর্ণনাকারী বলেন, তাকে আমরা বীরত্বের সমুদ্রের ন্যায় পেয়েছি । তিনি বীরত্বের সমুদ্র ছিলেন ।[১]

এই সমস্ত উদাহরণ ও পূর্বের উদাহরণগুলি একথারই স্পষ্ট প্রমাণ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের চেয়ে বীরত্বে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । সার্বিক বিবেচনায় এই ধরায় তার মত আর কোন সাহসী ব্যক্তি আসেনি । আর এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন বড় বড় বীর বীর ও সাহসীগণও ।[২]

বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, 'যখন প্রচন্ড লড়াই শুরু হল, আমরা রাসুলের কাছাকাছি আশ্রয় গ্রহণ করছিলাম । আমাদের মধ্যে বীর তিনিই ছিলেন যার কাছাকাছি সবাই যাচ্ছিলেন । অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আনাস রা. পূর্বের হাদীসে বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশি দানশীল, ও সবার চেয়ে বড় বীর মানুষ ছিলেন ।'

পঞ্চম উদাহরণঃ চিন্তা ও পরিকল্পনায় তার বীরত্ব

পূর্বের এই উদাহরণগুলি তার অন্তরের বীরত্বের উদাহরণ ছিল । তার চিন্তাগত বীরত্বের একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব । কেননা তার নামে হাজার হাজার বীরত্বগাথা রয়েছে । সে বীরত্ব হল, সুহায়েল বিন আমরের গোয়ার্তুমির সময় । যখন তিনি হুদাইবিয়া সন্ধির চুক্তিনামা লিখছিলেন, সে সময়ে রাসূলের অবস্থান অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ছিল । কেননা চুক্তিপত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা তিনি স্থগিত করেছিলেন । শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখেছিলেন । এবং 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লেখার পরিবর্তে 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' লিখতে রাজি

[১] সহীহ আল - বুখারী ৬০৩৩

[২] আহমাদ ১ম খন্ড ৮৬ পৃঃ হাকেম ২য় খন্ড ১৪৩ পৃঃ

হয়েছিলেন। ও সুহায়েলের এই শর্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, কুরাইশদের কেহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিবেন সে মুসলমান হলেও। সাহাবারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এ সকল অসম শর্তাবলীতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় ধৈর্য ধরে বসেছিলেন। চুক্তিনামা লেখা শেষ হল। কিছুদিন পর স্পষ্ট বিজয় অর্জিত হল।

উল্লেখিত উদাহরণের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মিক ও বুদ্ধিমত্যা জনিত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দূরদৃষ্টি, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থ নেয়ার কৃতৃত্ব তো তার আছেই। অধিকন্তু দায়ীদের প্রজ্ঞার পরিচয় হচ্ছে অধিকতর লাভবান বস্তু অর্জন করার নিমিত্তে কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পরিহার করা। যদি তাতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে।[১]

যা এতক্ষণ আলোচিত হয়েছে সবই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বীরত্ব ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত। এটা তার বীরত্বের তুলনায় সমুদ্রের এক ফোটার পরিমাণমাত্র। অন্যথায় তার বীরত্ব যদি খুজে খুজে লেখা হয়, তাহলে তো বিশাল গ্রন্থ লেখা হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ করে আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল, তাদের প্রত্যেক বিষয়ে ও প্রতিটি কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে। আর এরই মাধ্যমে সফলতা এবং বিজয় আসবে। এবং ইহ জগতে ও পরকালে সৌভাগ্য লাভ করবে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿الأحزاب٢١﴾

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৭৩১-২৭৩২ আহমাদ ৪র্থ খন্ড ৩২৮-৩৩১ পৃঃ হাজাল হাবিব ইয়া মুহিব ৫৩২প

"তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাহাদের জন্য রয়েছে রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ।"[১]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সংস্কার ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মকৌশল

১। সমাজ সংস্কার ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম-কৌশল

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছলেন সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও প্রচুর মতপার্থক্য ছিল। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যও এক ছিল না। তারা একত্রিত হত নিজ নিজ গন্ডিতে । তাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল পুরাতন উত্তরাধিকার সূত্রে। কিছু কিছু নতুন মতবিরোধও ছিল। মদীনার অধিবাসীরা ছিল মূলত তিনভাগে বিভক্তঃ

১- মুসলমানঃ আউস, খাজরাজ ও মুহাজেরদেরদের সমন্বয়ে।

২- মুশরিকঃ আউস, খাজরাজ ও যারা ইসলামে প্রবেশ করেনি তাদের সমন্বয়ে।

৩- ইহুদী ঃ তারা কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে বনু কাইনুকা ছিল খাজরাজ গোত্রের মিত্র। বনু নযীর ও বনু কুরাইযাহ এ দু' গোত্র ছিল আওস গোত্রের মিত্র।

আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে কঠিন বিরোধ ছিল। মধ্যযুগে তাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ তাদের মধ্যে 'বুয়াসের' যুদ্ধ

[১] সরা আল আহযাব ২১

হয়েছিল । তার কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তখনও তাদের মধ্যে চলমান ছিল ।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মহান কৌশল তার সুন্দর কুটনীতি দ্বারা এই সমস্ত সমস্যা সুন্দর ও স্থায়ীভাবে সমাধান করতে লাগলেন । এই সমস্ত অবস্থার সমাধান ও সংশোধন এবং মুসলমানদের চিন্তা চেতনা একত্রিত করার কার্যক্রম ছিল এ রকমঃ

১- মসজিদ তৈরী এবং সেখানে একত্রিত হওয়া ঃ এই প্রথম কাজটি পরস্পরবিরোধী অন্তরগুলোকে একত্রিত করে দিল । সংশোধন এবং ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে প্রথম কাজ করলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । এবং সকল মুসলমান তা নির্মাণের কাজে অংশ গ্রহণ করল । তাদের নেতৃত্বে ছিলেন তাদের ইমাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । এটাই ছিল প্রথম সেবা ও সহযোগিতা মূলক কাজ যা সমস্ত অন্তরকে এক সুতোয় গেঁথে দিল । এবং কর্মের সাধারণ লক্ষ্য স্পষ্ট করল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমণের পূর্বে প্রত্যেক গোত্রে লোকদের মিলিত হওয়ার জন্য জন্য আলাদা এক একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল । তারা সেখানে রাত্রে বসে গল্প করত । রাতে জাগ্রত থাকত । কবিতা পাঠ করত । আর এ অবস্থা তাদের অনৈক্যেরই প্রমাণ ছিল ও অনৈক্য বিস্তারে সহায়ক ছিল । যখন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তা সমস্ত মুসলমানদের কেন্দ্র হয়ে গেল ও তাদের সমবেত হওয়ার স্থান হিসেবে গণ্য হল ।

সব সময় তারা সেখানে সমবেত হত । তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত । তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতেন, পথ প্রদর্শন করতেন, দিক নির্দেশনা দিতেন ।[২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩য় খন্ড ২১৪পৃঃ ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ১১৪ পৃঃ জাদুল মা'আদ ৩য় খন্ড ৬২ পৃঃ তারিখে ইসলাম মাহমুদ সাকের ২য় খন্ড ১৫৬ পৃঃ আর রহীকুল মাখতুম১৭১ পৃঃ সহীহ আল - বুখারী ৪২৮ সহীহ মুসলিম ৫২৪

[২] সহীহ আল - বুখারী ৩৯০৬

এর মাধ্যমে সমস্ত আলাদা বৈঠকস্থলগুলো এক হয়ে গেল । সমস্ত মহল্লা এক জায়গায় চলে আসল । গোত্রগুলো কাছাকাছি আসল । উপদলগুলো ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হল । অনৈক্য ঐক্যের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেল । মদীনায় কোন একাধিক দল থাকল না । বরং সকল দল একটি দলে পরিণত হল । অনেক নেতা থাকল না । বরং নেতা এজনই হয়ে গেল । তিনি হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তিনি তার প্রভুর নিকট থেকে আদেশ নিষেধ প্রাপ্ত হন, এবং তার উম্মতকে শিক্ষা দেন । মুসলমানরা এক কাতারের ন্যায় হয়ে গেল । সমস্ত সত্তা ও চিন্তা-চেতনার পথগুলো মিলে গেল একটি মোহনায় । তাদের ঐক্য শক্তিশালী হল । আত্মাগুলো শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ হল । শরীরগুলো একে অপরকে সাহায্য করল ।[১]

মসজিদ শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জায়গা ছিল না, বরং সেটি ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয় । মুসলমানরা সেখানে ইসলামের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতো । সেখানে একত্রিত হতো, বিভিন্ন গোত্রের লোকজন পরস্পরে মিলিত হতো । যদিও জাহেলী যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ, ঝগড়া তাদের মাধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত ঘৃণার পরিবেশ তৈরী করে রেখেছিল । মসজিদকে তারা ঘাটি বানিয়ে নিয়েছিল সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য । সেখান থেকেই সব বিষয় প্রচার করা হত । পরামর্শ মূলক ও সিদ্ধান্তমূলক কাজের বৈঠকের স্থান ছিল মসজিদ ।

এই জন্যই মদীনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই অবস্থান করেছেন, প্রথমে সেখানে মসজিদ তৈরী করছেন । যেখানে মু'মিনগন একত্রিত হবে । যখন কুবায় অবস্থান করেছেন সেখানে মসজিদ বানিয়েছেন । জুমার নামাজ আদায় করেছেন বনী সালেম বিন আউফে, যা কুবা ও মদীনার মধ্যখানে নিচু জাগায় (রানুনা) নামক স্থানে অবস্থিত । মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মসজিদ তৈরী করলেন ।[২]

[১] তারিখে ইসলামী মাহমুদ সাকের ২য় খন্ড ১৬১-১৬২ পৃঃ রাহীকুল মাখতুম ১৭৯ পৃঃ

[২] তারিখে ইসলামী মাহমুদ সাকের ২য় খন্ড ১৬১-১৬২ পৃঃ রাহীকুল মাখতুম ১৭৯ পৃঃ

২- ইহুদীদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা দ্বারা ইসলামের দাওয়াত দিলেন

সংস্কার ও ঐক্যের ঘাটি থেকে -যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রবেশ করার পর বিণির্মান করেছিলেন- ইহুদীদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন সাল্লামের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন ।

আনাস রা. বর্ণনা করেন, 'আব্দুল্লাহ বিন সাল্লামের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার সংবাদ পৌঁছল । তিনি রাসুলের নিকট এসে বললেন, 'আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই । যার উত্তর নবী ব্যতীত আর কেউ দিতে পারবে না । কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? জান্নাতবাসী প্রথমে কি খাবার খাবেন? সন্তান কেন তার পিতা অথবা মাতার মত হয়ে থাকে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এখনই জিবরীল আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ।' ইবনে সাল্লাম বললেন, 'ফেরেশতাদের মধ্যে ইনিই তো ইহুদীদের শত্রু ।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কেয়ামতের প্রথম আলামত হল, আগুন আসবে এবং পূর্ব পশ্চিমের মানুষকে একত্রিত করবে । প্রথম খাদ্য যা জান্নাতবাসীরা গ্রহণ করবে তা হল মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ । আর সন্তান পিতা বা মাতার মত এই কারণে যে, পুরুষ যখন নারীর সাথে মিলিত হয় কখনও পুরুষের বীর্য আগে প্রবেশ করে, তখন সন্তান তার মত আকৃতি ধারণ করে । আর যদি নারীর বীর্য আগে প্রবেশ করে তবে সন্তান তার আকৃতি ধারণ করে ।'

আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল ।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! ইহুদীরা মিথ্যারোপকারী জাতি । আপনি তাদেরকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করার পূবে যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে তা হলে আপনার নিকট আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে ।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে পাঠালেন, তারা রাসুলের নিকট আসল । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে

বললেন, 'হে ইহুদী জাতি! তোমাদের ধংস হোক । তোমরা আল্লাহকে ভয় কর । ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই । তোমরা জান আমি আল্লাহর সত্য রাসূল । আমি তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছি । তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর ।' তারা বলল, 'এ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা ।' এ কথা তারা তিনবার বলল । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা বলল, 'সে তো আমাদের নেতা । আমাদের নেতার সন্তান । আমাদের মধ্যে বড় আলেম-বিদ্বান । আমাদের বড় আলেমের সন্তান ।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা কি করবে?' তারা বলল, 'আল্লাহর আশ্রয়! সে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না ।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, 'সে ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা কি করবে?' তারা বলল, 'আল্লাহর আশ্রয়! সে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না ।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, 'সে ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা কি করবে?' তারা বলল, 'আল্লাহর আশ্রয়! সে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না ।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ইবনে সাল্লাম! তাদের সামনে বের হও?' ইবনে সাল্লাম বের হয়ে বললেন, 'হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর । ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা জান তিনি আল্লাহর রাসুল, তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন । তারা সকলে বলল, 'তুমি মিথ্যা বলেছ । তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির ছেলে ।' এবং তারা সকলে তার উপর আঘাত করল ।'[১]

এটাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইহুদীদের নিকট থেকে সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা যা তিনি অর্জন করেছিলেন মদীনায় প্রবেশ করার পর ।

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৩২৯ শব্দ সহীহ আল - বুখারীর তিন অধ্যায় থেকে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩য় খন্ড ২১০ পৃঃ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্দর কৌশল এর মধ্য থেকে একটি হল, তিনি আব্দুল্লাহ বিন সাল্লামের ইসলামের বিষয়টি গোপন করার বিষয়ে একমত হয়েছিলেন । সাথে সাথে তাদের মধ্যে তার মর্যাদার বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন । যখন তারা তার প্রশংসা করল, ও তার মর্যাদা উচ্চ করে তুলে ধরল । তখনই রাসুল তাকে বের হতে নির্দেশ দিলেন । তিনি বের হলেন, ও ইসলাম প্রকাশ করলেন, এবং ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যতার ব্যাপারে যা গোপন করত তা প্রকাশ করে দিলেন । অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ঐ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করলেন যা পরবর্তীতে আলোচনায় আসবে ।

৩- মুহাজের ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করাঃ

যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ ও ইহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে শুরু করলেন তার কর্মতৎপরতা । অনুরূপভাবে মুহাজের ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করলেন । আর এটাই হল নবুওয়তী উৎকর্ষতা, সৎপথ প্রদর্শন, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও মুহাম্মাদী প্রজ্ঞা ।[১]

তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব তৈরী করলেন আনাস বিন মালেক রা. এর ঘরে । তারা নব্বই জন ছিলেন । অর্ধেক মুহাজের, অর্ধেক আনছার । তাদের মধ্যে সহমর্মিতার বন্ধন সৃষ্টি করলেন, মৃত্যুর পর নিকট আত্মীয় না হওয়া সত্বেও পরস্পরে একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবেন । এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এ নিয়ম চলতে থাকে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত । যখন আয়াত অবতীর্ণ হলঃ

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الأنفال ٧٥)

[১] হাজাল হাবিব ইয়া মুহিব ১৭৮ পৃঃ

"এবং আল্লাহর বিধানে আত্মীয়গণ একে অন্যের অপেক্ষা অধিক হকদার ।"[১]

তখন থেকে শুধু আত্মীয়তার ভিত্তিতে উত্তরাধিকার ফিরে আসল । ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কারণে উত্তরাধিকার রহিত হয়ে গেল ।

জাহেলী যুগের স্বজনপ্রীতি ধুয়ে মুছে গেল । শুধু ইসলামের বিধান অবশিষ্ট রইল । বংশ, বর্ণ এবং ও জাতিভেদের পার্থক্য দূর হয়ে গেল । কেহ সামনে বা পিছনে যেতে পারবে না মানুষত্ব ও তাকওয়া ব্যতীত । ভ্রাতৃত্ব, কুরবানী ও সহমর্মিতার অনুভুতিই সেখানে ছিল মুখ্য । এই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা ছিল । নতুন এই সমাজ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণে পরিপূর্ণ ছিল । আর এই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ইসলামের মানবিক এবং চারিত্রিক ইনসাফের শক্তিশালী রূপ ফুটে উঠেছে ।[২]

আর এই ভ্রতৃত্ব এমন অঙ্গীকার ছিল না যা শুধু কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল । এমন কথাও ছিল না যা শুধু মুখে বলা হয়েছে । বরং এমনই এক ভ্রতৃত্ব ছিল যা অন্তরের পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল । তার প্রয়োগ হয়েছে রক্ত ও সম্পদের মাধ্যমে । শুধু মুখের কথা নয় । কথা ও কাজ, জান ও মাল, সুখ ও দুঃখের ভ্রাতৃত্ব ছিল এটি ।[৩]

এই বিষয়ের উত্তম উদাহরণ ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. ও সাআদ বিন রবিইর রা. মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক গড়ে দিলেন । সাআদ বললেন, 'আনছাররা জানে যে, আমি তাদের মধ্যে বেশি ধনী । আমি আমার সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করব । অর্ধেক থাকবে আমার, আর অর্ধেক তোমার । আমার দুইজন স্ত্রী আছে । তোমার কাছে যাকে বেশি পছন্দ হয় তাকে নিয়ে নাও । আমি তাকে তালাক দিব । যখন তার তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে, তুমি তাকে বিবাহ করবে । আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. বললেন, 'আল্লাহ তোমার সম্পদে ও সন্তান সন্ত

[১] সুরা আল- আনফাল ৭৫

[২] যাদুল মাআদ ৩য় খন্ড ৬৩পৃঃ, আর-রহীকুল মাখতুম ১৮০ পৃঃ

[৩] তারিখে ইসলামী মাহমুদ সাকের ২য় খন্ড ১৬৫, ফিকহুস সীরাহ ১৯২ পৃঃ

তিতে বরকত দান করুন। তোমাদের বাজার কোথায়?' তারা তাকে বনু কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিল। তিনি বাজার থেকে ফিরলেন। তার হাতে পনির ও মাখনের কিছু অংশ ছিল। পরের দিনও তাই করলেন। এভাবে কাজ করতে থাকলেন। অতঃপর একদিন তার শরীরে মেহেদীর রং দেখা গেল। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি অবস্থা?' তিনি বললেন, 'আমি আনছারদের এক মহিলাকে বিবাহ করেছি।' রাসুল বললেন, 'মহরানা কি দিয়েছো?' তিনি বললেন, 'খেজুরের দানার ওজন পরিমান স্বর্ণ বা খেজুরের দানা পরিমান স্বর্ণ।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অলীমা (ভৌভাতের) আয়োজন কর, একটি ছাগল দিয়ে হলেও।'[১]

এ ভ্রাতৃত্ব ছিল একটি কল্যাণকর কৌশল এবং সঠিক কুটনীতি। এবং অনেকগুলো সমস্যা মুসলমানরা যার সম্মুখীন হচ্ছিল তার সুন্দর সমাধান ছিল এ ভ্রাতৃত্ববন্ধন।

৪- বিচক্ষণ শিক্ষা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা, আত্মশুদ্ধির বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছিলেন। সুন্দর চরিত্রের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিচ্ছিলেন ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ইজ্জত, সম্মান, ইবাদত, ও আনুগত্যের বিষয়ে।[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে মানবমন্ডলী! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, লোকদেরকে খাবার দাও, এবং রাত্রিতে নামাজ পড় যখন মানুষেরা ঘুমে থাকে, তাহলে জান্নাতে নিরাপদে প্রবেশ করতে পারবে।'[৩]

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৭৮০-৩৭৮১

[২] আর-রাহীকুল মাখতুম ১৭৯-১৮১ এবং ২০৮ পৃঃ তারিখে ইসলামী মাহমুদ সাকের ২য় খন্ড ১৬৫ পৃঃ

[৩] তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ ৩২৫১, দারামী ১ম খন্ড ১৫৬ পৃঃ, আহমাদ ১ম খন্ড ১৫৬ পৃঃ

তিনি আরো বলেন, 'যার প্রতিবেশী তার কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১]

'প্রকৃত মুসলমান সেই যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।'[২]

তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে।'[৩]

তিনি বলেন, 'একজন মু'মিন আর একজন মু'মিনের জন্য প্রসাদের ন্যায় যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।' এ কথা বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আঙ্গুলীসমূহ একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দিলেন।[৪]

তিনি বলেন, 'তোমরা পরস্পরে হিংসা করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পরে শত্রুতায় লিপ্ত হয়ো না, একে অন্যের পিছনে লেগে থাকবে না, একে অপরের বেচাকেনার উপর বেচাকেনা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না। সে তাকে শত্রুর হাতে অর্পণ করবে না। সে তাকে তুচ্ছ করবে না। তাকওয়া এখানেই,'- এ কথা বলে বুকের দিকে তিনবার ইশারা করলেন- কোন লোকের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অপমান করবে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত অন্য মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ হল। এমনিভাবে নিষিদ্ধ হল তার সম্পদ।'[৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন রাতের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে

[১] সহীহ মুসলিম ৪৬

[২] সহীহ আল - বুখারী ১১, সহীহ মুসলিম ৪১

[৩] সহীহ আল - বুখারী ১৩, সহীহ মুসলিম ৪৫

[৪] সহীহ মুসলিম ২৫৬৪

[৫] সহীহ আল - বুখারী ৬০৭৭ সহীহ মুসলিম ২৫৬০

থাকবে। এটাও বৈধ নয়, যখন সাক্ষাত ঘটবে সে মুখ ফিরিয়ে নেবে বা অন্যজন মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম যে প্রথম সালাম দেবে।'[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সোমবার বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হয়, যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে না তাদের সকলকে আল্লাহ মাফ করে দেন। কিন্তু তাকে আল্লাহ মাফ করেন না, যার ভাইয়ের সাথে তার বিবাদ আছে। বলা হয়, এই দু'জনকে অবকাশ দাও, যেন সংশোধিত হয়ে যায়। এই দু'জনকে অবকাশ দাও, যেন সংশোধিত হয়ে যায়। এই দু'জনকে অবকাশ দাও, যেন সংশোধিত হয়ে যায়।'[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমল সমূহকে পেশ করা হয় প্রত্যেক বৃহস্পতি ও সোমবার। সেদিন আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির যদি তার ভাইয়ের সাথে হিংসা থাকে, তখন বলা হবে এ দুজনকে সংশোধিত হওয়া পর্যন্ত দুরে রাখ। এ দুজনকে সংশোধিত হওয়া পর্যন্ত দুরে রাখ।'[৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর। হোক সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত।' অনেকে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! একে অত্যাচারিত অবস্থায় সাহায্য করব এটা আমরা বুঝলাম। কিন্তু অত্যাচারী অবস্থায় কিভাবে সাহায্য করব?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে রাখবে, এটাই তার সাহায্য।'[৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে।' প্রশ্ন করা হল, 'হে আল্লাহর রাসুল

[১] সহীহ মুসলিম ২৫৬৫
[২] সহীহ মুসলিম ২৫৮৪, আহমাদ ৩য় খন্ড ৯৯পৃঃ সহীহ আল - বুখারী ২৪৪৩ ও ২৪৪৪
[৩] সহীহ মুসলিম ১৯৮৮/৪
[৪] সহীহ মুসলিম ১৯৯৮

সেগুলো কি?' তিনি বললেন, 'সাক্ষাতে তাকে সালাম দেবে, দাওয়াত দিলে গ্রহণ করবে, উপদেশ চাইলে উপদেশ দেবে, হাঁচি দেয়ার পর আলহামদু লিল্লাহ বললে তুমি তার উত্তর দেবে, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে।'[১]

বারা ইবনে আযেব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি বিষয় গ্রহণ এবং সাতটি বিষয় বর্জনের আদেশ করেছেন। আদেশ করেছেনঃ রোগীর সেবা, জানাযায় অংশ গ্রহণ, হাঁচি দাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে তার উত্তর প্রদান, নিমন্ত্রণকারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ, সালামের প্রসার, অত্যাচারিতের সাহায্য ও শপথকারীকে দায়মুক্ত করার। এবং নিষেধ করেছেন, স্বর্ণের আংটি ব্যবহার, স্বর্ণের পাত্রে আহার, উটের হাওদায় রেশম বা সিল্ক ব্যবহার, কাপড়ে সিল্কের কারুকাজ, সিল্কের পোষাক পরিধান, দীবাজ, এবং ইস্তিবরাক[২] থেকে। [৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমানদার হবে। আর ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি? তোমাদের এমন বস্তুর দিকে পথ নির্দেশ করব না যা করলে তোমাদের পরস্পররের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তাহল, তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার কর।'[৪]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম? বললেন, 'খাদ্য দান এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া।' [৫]

তিনি আরো বলছেন, 'মু'মিনগণের পরস্পরের বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, সহমর্মিতার উদাহরণ হল একটি দেহের মত। যদি এর কোন একটি অঙ্গ

[১] সহীহ আল - বুখারী -জানাযা অধ্যায়, সহীহ মুসলিম -সালাম অধ্যায়
[২] এ দুটি ও সিল্কের দুইটি বস্ত্র বিশেষ।
[৩] সহীহ আল - বুখারী, ১২৩৯।
[৪] সহীহ মুসলিম , ৫৪।
[৫] সহীহ আল - বুখারী ১২, সহীহ মুসলিম ৩৯

অসুস্থ হয়ে যায় তা হলে তা পুরো শরীরে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরের ন্যায় অনুভূত হয় ।'[1]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে রহম বা অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহ পায় না ।'[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামআরো বলেন, 'যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না ।'[3]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'মুসলমানকে গালি দেওয়া হল পাপ কাজ, তাকে হত্যা করা কুফরী ।'[4]

আনসারদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ সকল বাণী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি পৌঁছে থাক বা এর কিছু হিজরতের পূর্বে যে সব মুহাজির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করুক । এ সবই তার পক্ষ হতে সকল সাহাবীদের জন্য শিক্ষা । এবং কেয়ামত অবধি যার কাছেই এ উদ্ধৃতি পৌঁছবে তাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বলে বিবেচিত হবে ।

অনুরূপ তার আরো অনেক বাণী যা দ্বারা তিনি সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন । যেমন তিনি তাদের দান করার প্রতি উৎসাহ দিতেন, দানের ফযিলত বর্ণনা করতেন যা তাদের হৃদয় মনকে আকৃষ্ট করতো । ভিক্ষাবৃত্তি নিষেধ করতেন, ধৈর্যের গুণ ও অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য বলতেন । তাদের ইবাদতের প্রতি আগ্রহী করে তুলতেন; যাতে রয়েছে অনেক ফযিলত, সওয়াব, পুরস্কার এবং তাদেরকে অহীর সাথে নিবিড় সম্পর্ক করে দিতেন । তিনি তাদের পাঠ করে শুনাতেন । তারা ও তাকে পাঠ করে শুনাতো । এ সকলই ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[1] সহীহ আল - বুখারী ৬০১১, সহীহ মুসলিম ২৫৮৬

[2] সহীহ আল - বুখারী, ৬০১৩ সহীহ মুসলিম ,২৩১৯ ।

[3] সহীহ মুসলিম কিতাবুল ফাদায়িল ।

[4] সহীহ আল - বুখারী ৪৮ ।

সাল্লাম এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবর্তমানে এগুলো হল দাঈ ও আলেম-উলামাদের দায়িত্ব ।

এমনিভাবে তিনি তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়কে উন্নত করেছেন । তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সুউচ্চ মূল্যবোধ । এতে করে তারা উপনীত হয়েছিলেন মানবীয় গুণাবলির সর্বোচ্চ শিখরে ।

ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষে সম্ভব হয়ে ছিল উন্নত ও আল্লাহ-ভীরু একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ যা ইতিহাসে সুপরিচিতি লাভ করেছিল । এবং যে সমাজ পতিত ছিল বর্বরতা, মূর্খতা ও কুসংস্কারের গহীন অন্ধকারে সে সমাজ পেয়েছিল তার থেকে একটি সমাধান । অতঃপর তা পরিণত হয়েছিল এমন এক সমাজে যা মানবীয় সকল গুণাবলির দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল । আর এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর রহমতে তারপরে এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগ্রহে । তাই আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের কর্তব্য হল তারা তার পথ অনুসরণ করবে, এবং তার দেখানো পথেই তারা হেদায়েত অনুসন্ধান করবে ।[1]

৫– মুহাজির ও আনসারদের প্রতিজ্ঞা এবং ইহুদীদের সন্ধি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যার মাধ্যমে জাহেলী শেওলা এবং গোত্রীয় ঝগড়া– বিবাদ বন্ধ হয় । জাহেলী তাকলীদ বা অন্ধানুকরণ করার আর কোন অবকাশ রইল না । এবং পরস্পরের এ চুক্তির মধ্যে, মুহাজির ও আনসারদের জন্য মদীনায় অবস্থানরত ইহুদীদের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের অঙ্গীকারও ছিল । এ চুক্তি ও অঙ্গীকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে সমাজ সংস্কার এবং সমাজ বিনির্মাণে এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা । যা বিশ্বের ইতিহাসে 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত ।

[1] আররাহীকুল মাখতুম ১৮৩ ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মাঝে একটি চুক্তি করলেন। তাতে ইহুদীদের সাথেও শত্রুতা ছেড়ে সন্ধি করা হয়েছিল। ইহুদীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। তাদের সম্পদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের কল্যাণে কতিপয় শর্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।[১]

এ অঙ্গীকার ছিল বিচক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতির পরিচায়ক এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে পূর্ণ এক বিজ্ঞানময় সিদ্ধান্ত। যা মদীনার সকল মুসলিম ও ইহুদীদের একত্র করেছিল। তারা একটি জোটে পরিণত হয়েছিল। মদীনার উপর আক্রমনকারী যে কোন শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াতে তারা সক্ষম ছিল ।

এ পাঁচটি পরিকল্পনা ঃ মসজিদ নির্মাণ, ইসলামের দিকে ইহুদীদেরকে আহবান, মুমিনদের পরস্পর ভ্রাতৃত্ব , তাদের প্রশিক্ষণ ও চুক্তি সম্পাদন।

এ পরিকল্পনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অনুগ্রহে সমাধান করেছিলেন মদীনায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর একটি তিক্ত বিরোধের। এবং প্রাচীন সকল প্রভাব, বিবাদ অপসারণ করেছেন। মুসলমানের হৃদয়ে মিলন সৃষ্টি করেছেন এবং এ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মদীনায় নিখুত একটি শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। অতঃপর এ শাসনব্যবস্থা এবং আল্লাহর দিকে আহবান মদীনা হতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল।[২]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহর ভাষা অলংকার

জুবায়ের বিন মুতয়িম রা. যা বলেছেন তাতে কুরআনুল কারীম মানব মনকে প্রভাবান্বিত করে বলে প্রমাণ মিলে। তিনি বলেছেন, 'আমি নবী

[১] আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ২২৪-২২৬/৩।
[২] আর রাহিকুল মাখতুম ১৭১,১৭৮,১৮৫।

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা আত-তুর পাঠ করতে শুনেছি, যখন তিনি এ আয়াতে পৌঁছলেন

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ سورة الطور

(তারা কি কোন কিছু ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো বিশ্বাস করে না। তোমার প্রতিপালকের ভান্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রক?)[১]

তখন আমার মনটা উড়াল দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। এটা আমার হৃদয়ে ঈমানের প্রথম প্রবেশ।[২]

কুরআন যেমন মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করে তেমনি ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসও মানব মনে প্রভাব ফেলে। কারণ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অহী। এটা মানব মনকে প্রভাবান্বিত করবেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী এবং তার ভাষা-অলঙ্কার মানব মনকে যে কিভাবে প্রভাবিত করে এর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল ঃ

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ দিমাদ রা. এর ঘটনা

দিমাদ রা. যখন মক্কায় আগমন করলো – সে জিন তাড়ানোর ঝাড় ফুঁক করতো। সে শুনতে পেল মক্কাবাসী বলছে মুহাম্মাদ পাগল। তিনি বললেন যদি আমি এ ব্যক্তিকে পেতাম হয়তবা আল্লাহ তাকে আমার হাতে সুস্থতা দান করতেন। অতঃপর বলল 'হে মুহাম্মদ আমি এ ধরণের

[১] সূরা আত তুর ৩৫-৩৭।
[২] সহীহ আল - বুখারী তাফসীর অধ্যায়, সহীহ মুসলিম- সালাত অধ্যায়

বাতাসের চিকিৎসা করে থাকি। আর আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা সুস্থতা দান করেন, তোমার প্রয়োজন আছে কি আমার চিকিৎসা নেয়ার?' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله.أما بعد

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করছি। তার নিকট আমরা সাহায্য কামনা করছি। যাকে আল্লাহ হেদায়েত দেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েত দানকারী কেউ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।' অতঃপর দিমাদ বললো, 'আপনার এ বাক্যগুলো আবার বলুন', রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন। অতঃপর দিমাদ রা. বললো, আমি গনকের কথা শুনেছি। যাদুকরের কথা শুনেছি। শনেছি কবিদের কথাও কিন্তু এ ধরণের বাক্য কখনো শুনেনি। এ বাক্যগুলো অতল সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছেছে।'[১] এরপর বললো, 'আপনার হাত প্রসারিত করুন। আপনার হাতে ইসলামের শপথ নেব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার গোত্রের পক্ষে শপথ নেবে না?' সে বলল, 'আমার গোত্রের পক্ষেও।'[২]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ তোফায়েল বিন আমর রা. এর সাথে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষা-অলঙ্কার বিষয়ে একটি ঘটনা তোফায়েল বিন আমর রা. এর থেকে জানা যায়। সে ছিল কবি ও

[১] অর্থাৎ এ বাক্য গুলো শুধু মানুষের হৃদয় নয়, যদি অতল সমুদ্রে পৌঁছে সেখানেও এ গুলো প্রভাব ফেলবে। অনুবাদক

[২] সহীহ মুসলিম , ৮৬৮।

গোত্র প্রধান। মক্কায় আগমন করলে কুরাইশের লোকেরা তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ বিষয় ভীতি প্রদর্শন করলো। তাকে বলল, মুহাম্মাদের কথাগুলো যাদুর মত। তার থেকে সাবধান থেকো। যেন সে তোমার এবং গোত্রের মধ্যে তার কথা প্রবেশ করাতে না পারে। যেমন আমাদের মাঝে করেছে। সে স্বামী – স্ত্রীর মাঝে, পিতা – পুত্রের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে তারা তাকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকলো। তাদের এ প্রচারে প্রভাবিত হয়ে সে শপথ করল, কানে তুলা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্কে কথাগুলো তাকে ভাবিয়ে তুললো। মনে মনে বললো, আমি একজন সাহসী ও স্থির মানুষ। আমার কাছে তো বিষয়টি অস্পষ্ট থাকবে না। ভাল হোক বা মন্দ হোক। অবশ্যই আমি তার কাছ থেকে শুনবো। যদি বিষয় সঠিক হয় গ্রহণ করব। ভাল না লাগলে প্রত্যাখ্যান করব। এরপর কান থেকে তুলা ফেলে দিল। এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী শুনলো। বলল, 'এর চেয়ে সুন্দর কথা জীবনে আর শুনতে পাইনি।' সে রাসূলের সাথে তার বাড়ি গেল এবং তাকে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে অবগত করালো। এবং বললো, 'আপনার ধর্ম আমার কাছে পেশ করুন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করল।[১]

তাই যারা আল্লাহর পথে আহবান করে তাদের কর্তব্য হল মানুষকে ইসলামের দিকে আহবানে কুরআন এবং হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মুজিযা-অলৌকিকতা

জ্ঞান ও যুক্তির দাবী হল, ইহুদী খৃষ্টান এবং অন্যান্য কাফেরদের ইসলামে দাওয়াত কালে নিজ নবুওয়াতের দলীল এবং অকাট্য প্রমাণাদি তাদের

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩৪৫/১।

কাছে বর্ণনা করা। যাতে তার রিসালত যে সকল মানুষের জন্য, এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়।

এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে তার নবুওয়াত এবং রিসালাতের সামগ্রিকতার দলীল– প্রমাণ ও নিদর্শন অনেক। যা গনণা করে শেষ করা যাবে না।

তবে সকল প্রকার প্রমাণাদি ও নিদর্শন দুটি প্রকারে সীমাবদ্ধ করা যায় ঃ

(ক) সে সব মুজিযা বা অলৌকিকত্ব অতীতে ঘটেছে এবং বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যেমন, মুসা ও ঈসা আ. এর মুজিযা।

(খ) সে সকল মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যেমন আল-কুরআন, ইলম, ঈমান। এগুলো তার নবুওয়তের নিদর্শন। এমনিভাবে তার আনীত শরীয়ত, নিদর্শনাবলী, যা আল্লাহ কোন কোন সময় তার উম্মতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। দলীল– প্রমাণের মাধ্যমে তার ধর্মের আত্মপ্রকাশ করা। এবং তার পূর্বেকার কিতাবে তার গুণাবলি উল্লেখ থাকা ইত্যাদি।[১] এ সকল মুজিযা অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত যা গণনা করা সম্ভব নয়। তবে তার নবুওয়াত প্রমাণ করা ও তার রিসালাতের সামগ্রিকতার কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করব।

প্রথম বিষয় ঃ আল-কুরআনের মুজিযাসমূহ

দ্বিতীয় বিষয় ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত দৃশ্যমান মুজিযাসমূহ

প্রথম বিষয় ঃ কুরআনের মুজিযা - যা দিয়ে চ্যালেঞ্জের সময় বিরোধী পক্ষ পরাজিত হয়। এ হল এক অলৌকিক বস্তু যা মানুষ ব্যক্তিগত এবং দলীয় উভয়ভাবে কুরআনের সাদৃশ্য গ্রন্থ বা সূরা রচনায় অক্ষম হয়েছে। এ মুজিযা আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির হাতেই দিয়ে থাকেন যাকে আল্লাহ নবুওয়ত ও রিসালাতের জন্য নির্বাচন করেন। তার সত্যতা এবং তার রিসালাতের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য।

---

[1] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٦٧-٤/٧١

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কুরআন– আল্লাহর কালাম বা বাণী। এটা্য অনেক বড় মুজিযা। যা সকল কালে, সকল যুগে অব্যাহত থাকবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য মুজিযা হয়ে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।[১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সকল নবী কে সেই পরিমাণ নিদর্শন দেয়া হয়েছে যা তার উপর ঈমান আনায়নকারীর জন্য পর্যাপ্ত হয়। আমি প্রাপ্ত হয়েছি অহী যা আল্লাহ আমার কাছে প্রেরণ করেছেন। আমি আশাবাদী, অনুসারীর দিক দিয়ে কেয়ামতে আমি তাদের সকলে চেয়ে শ্রেষ্ঠ হব।[২]

এ কথা দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা শুধু কুরআনে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। এটাও বলা উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি কোন দৃশ্যমান মুজিযা নিয়ে আসেননি। বরং উদ্দেশ্য হল কুরআন হচ্ছে বড় মুজিযা যা বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলা এ রাসূলের জন্যই নির্ধারণ করেছেন। কারণ প্রত্যেক নবীকে নির্দিষ্ট মুজিযা প্রদান করা হয়েছে যা দিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন তার জাতিকে। প্রত্যেক নবীর মুজিযা তার জাতির অবস্থার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ হয়ে থাকে। তাইতো দেখা যায় ফেরাআউনের সময়ে যাদুর ব্যাপক প্রচলন থাকায় মুসা আলাইহিস সালাম তার নিকট লাঠি নিয়ে আগমন করেন। লাঠি দিয়ে এমন কাজই করলেন যা যাদুকররা করত। এর মাধ্যমে তিনি যাদুকরদের পরাজিত করলেন। কিন্তু মুজিযার এ পদ্ধতি অন্য নবীদের বেলায় ব্যবহৃত হয়নি।

ঈসা আ. এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ ছিল। তখন ঈসা আ. আগমন করলেন এমন মুজিযা নিয়ে আসলেন, যা সকল ডাক্তার ও চিকিৎসককে অক্ষম বানিয়ে দিল। যেমন মৃতকে জীবিত করা, শ্বেতী রোগ ভাল করা, কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করা। তখনকার চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসকরা ঈসা আ. এর কাছে পরাজিত হল।

---

[১] الداعي إلي الإسلام

[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৯৮১, সহীহ মুসলিম ১৫২

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ ছিল ভাষা, সাহিত্য কবিতা, ভাষা অলংকার ও বাগ্মীতার শ্রেষ্ঠ যুগ।

এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুজিযা হিসাবে দিলেন আল-কুরআন, যার সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

سورة فصلت

"এতে কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করবেনা– অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাবান, প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" [১]

তবে আল-কুরআনের মুজিযা অন্য সকল মুজিযা থেকে ভিন্ন। কারণ এটি এক স্থায়ী দলীল ও চ্যালেঞ্জ যা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকবে। কখনো এটাকে পরাজিত করা যাবে না। কখনো এর বিকল্প রচনা করা সম্ভব হবে না। অন্যান্য নবী রাসূলদের মুজিযা ও চ্যালেঞ্জ তাদের জীবনের সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে। তাদের নবুওয়াত কালের ঘটনাবলী পরবর্তীতে শুধু শিক্ষনীয় ইতিহাস। আর আল-কুরআন এটা এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত চলমান প্রমাণ ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজ করছে। মনে হয় যেন শ্রোতা এ প্রমাণটি এ মাত্র আল্লাহর রাসূলের মূখ থেকে শুনেছেন। এ পরিপূর্ণ প্রমাণ অব্যাহত থাকার কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আমি আশাবাদী কিয়ামত দিবসে অন্য নবীদের চেয়ে আমার অনুসারী বেশি হবে।

কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শন ও মুজিযা হল সকল দিক থেকে: শব্দের দিক থেকে, ছন্দের দিক থেকে, শব্দার্থ প্রকাশে, অলঙ্কারের দিক থেকে, অর্থ তাৎপর্য নির্দেশের দিক থেকে, আল্লাহর নামসমূহ, গুণাবলি এবং তার ফেরেশ্তা সম্পর্কীয় সংবাদ এবং লক্ষ্য উদ্দেশের দিক থেকে। এ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে যা জ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন।

[১] সূরা হামীম সাজদা ৪২

উদাহরণ স্বরূপ এখানে মাত্র চার প্রকার উল্লেখ করছি–

১. বিস্ময়কর ভাষা অলঙ্কার

কুরআনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে অলৌকিক ভাষা অলঙ্কার, শব্দ গাঁথুনী যা চ্যালেঞ্জ করল জিন ইনসানকে এরূপ একটি কুরআন পেশ করার জন্য। তারা অক্ষম হলো। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا - سورة الإسراء

"বল, যদি মানুষ ও জিন সমবেত হয় এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য, যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।"[১]

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ سورة الطور

"তারা কি বলে এ কুরআন তার নিজের বানানো? বরং তারা বিশ্বাস করতে চায়না। তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এর সদৃশ বানানো কিছু উপস্থিত করুক।"[২]

এ চ্যালেঞ্জের তারা কেটে পড়ল। কেউই সামনে আসেনি। অতঃপর তাদের অবকাশ দেয়া হলো এবং অনুরূপ দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ দেয়া হলো

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . سورة هود

[১] সূরা আল-ইসরা ৮৮
[২] সূরা আল-ফাতির ৩৩-৩৪

“তবে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও, তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।”[১]

অতঃপর তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগ হলো, অক্ষম হয়ে গেল । তাদের আবার সুযোগ দেয়া হলো ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ سورة يونس

“তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার স্বরচিত? তুমি বলে দাও, ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে নিতে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।”[২]

হিজরতের পর মদীনায় আবার এ চ্যালেঞ্জের পূনরাবৃত্তি করা হলো ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ سورة البقرة

“এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমরা যদি সন্দিহান হও তবে তৎ সদৃশ একটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকেও ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও । অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তা হলে তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর

[১] সূরা হুদ ১৩

[২] সূরা ইউনূস ৩৮

যার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তরপুঞ্জ যা অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে ।”[১]

আল্লাহর বাণী ‘ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবেনা, অর্থাৎ যদি অতীতে না পেরে থাক ভবিষ্যতেও পারবেনা’ দ্বারা চ্যালেঞ্জ প্রমাণিত হলো, তারা এর মত একটি সূরা ভবিষ্যতেও পেশ করতে পারবে না, যেমনটি একটু পূর্বে বলে দেয়া হয়েছে । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অবস্থানকালে তাকে বলার জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেনঃ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ سورة الإسراء

“বল, যদি মানুষ ও জিন সমবেত হয় এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য, যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না ।”[২]

আল্লাহর আদেশের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এ চ্যালেঞ্জ ব্যাপক করা হয় । সকল মাখলুকের মাঝে এ খবর দেয়া যে তাদের পক্ষে এ রূপ একটি কুরআন পেশ করা অসম্ভব, যদিও তারা সবাই একত্র হয়ে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে । এ চ্যালেঞ্জ সকল মাখলুকের জন্য । প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ শুনেছে যে কুরআন শ্রবণ করেছে এবং জেনেছে বিশেষ ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ সকলেই । এবং এটা জেনেছে এরপরও কেউ এর মত একটি গ্রন্থ পেশ করতে পারেনি । এমনকি তারা এর মত একটি সূরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণকাল হতে আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি । এভাবেই চ্যালেঞ্জ বহাল আছে এবং থাকবে ।

[১] সূরা আল-বাকারা ২৩-২৪

[২] সূরা আল-ইসরা ৮৮

আল-কুরআন অন্তর্ভুক্ত করেছে হাজারো মুজিযা। কারণ তার রয়েছে একশত চৌদ্দটি সূরা । আর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার প্রয়াস চালানো হলো একটি সূরায়। তা ও আবার কুরআনের সবচে ক্ষুদ্র সূরা আল কাউসার– মাত্র তিনটি ছোট আয়াত। সর্বসম্মতভাবে কুরআনে ছয় হাজার দুইশত আয়াতের চেয়ে কিছু বেশি আয়াত আছে। আর আল কাউসারের পরিমাণ হলো কয়েকটি আয়াত মাত্র। অথবা বলা যায় দীর্ঘ একটি আয়াত যার উপর একটি সূরার নাম প্রয়োগ হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলো চ্যালেঞ্জ ও অলৌকিকতা ও বিরোধী পক্ষের পরাজয়।

যার আত্মা আছে অথবা মু'মিন অবস্থায় মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনলে তার আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

২. গায়েব সম্পর্কীয় সংবাদ

কুরআনের অলৌকিকত্ব হলো তাতে অনেকগুলো গায়েবের সংবাদকে শামিল কারেছে। যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও জানা ছিল না। এবং তার মত অন্য কোন মানুষের জানার কোন পথও ছিল না। এটা প্রমাণ করে কুরআন আল্লাহর কালাম এতে কোন প্রকার গোপনীয়তা নেই।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ سورة الأنعام

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়। স্থল ও জলভাগের সব কিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তার অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ– পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না। এমনভাবে কোন

সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয় না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" [১]

গায়েব সম্পর্কীয় সংবাদ বিভিন্ন প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ অতীতের গায়েব, এটা প্রকাশ করেছে বিস্ময়কর ঘটনাবলী যা মক্কার কুরাইশ সমাজ জানত না। এবং যাবতীয় সংবাদ যা আল্লাহ অতীত কাল সম্পর্কে জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকারঃ বর্তমানের অজানা সংবাদ যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানিয়েছেন। যেমন মুনাফিকদের গোপন সংবাদ। কতিপয় মুসলমান থেকে ভূল সংঘটিত হওয়া এছাড়া আরো অন্যান্য সংবাদ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানত না, তিনি তার রাসূলকে তা অবগত করিয়েছেন।

তৃতীয় প্রকারঃ ভবিষ্যত গায়েব। যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জানিয়েছেন এবং পরে তা ঘটেছে যা সংবাদ দিয়েছেন। এসব বিষয় নির্দেশ করে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

৩. ধর্মীয় অলৌকিকত্ব

আল কুরআনুল কারীম পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। এতে সকল যুগের, সব স্থানের মানুষের প্রয়োজনীয় সমূহ নিদের্শনা বিদ্যমান। কারণ, এ কুরআন যিনি অবতীর্ণ করেছেন, তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। তিনি মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন। তার কল্যাণ, অকল্যাণ, উপকার, অপকার তিনি-ই সব চেয়ে বেশি ভাল জানেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন, সে সিদ্ধান্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার শীর্ষ স্থানের মর্যাদা পায়। এরশাদ হচ্ছেঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"জেনে রাখ! যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জনেন। তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞ দয়ালু, সর্ব জ্ঞানের অধিকারী।"[১]

[১] সূরা আল-আন আম ৫৯।

আমরা বিভিন্ন সংস্থার অবস্থা ও মানব রচিত আইনের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই দেখব যে, পরিবেশ, স্থান ও কালের পরিবর্তনের সামনে প্রচলিত আইনের অসহায়ত্ব আর নিঃশর্ত আত্মসমর্থন, কত নির্মম, নির্লজ্জ! যার প্রেক্ষিতে বার বার প্রয়োজন হয় সংস্করণ, সংযোজন ও বিয়োজন ইত্যাদির। আজকে যা প্রনয়ণ করছে, আগামী কাল তা বাতিল করছে। কারণ, ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অজ্ঞতা হল মনুষ্য প্রকৃতি। তাই এক সাথে কিংবা সম্মিলিতভাবে মানুষের পক্ষে সর্বকাল ও সর্বযুগের উপযোগী করে আইন ও বিধান প্রনয়ণ করা সম্ভব নয়।

মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রণ ও মানুষের চরিত্র সংশোধনের সামনে সংস্থা ও সংগঠনের এটাই বড় ব্যর্থতা। এর বিপরীতে আল-কুরআন সকল ত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র, মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের জিম্মাদার। ইহকাল ও পরকালের পাথেয়। যদি মানুষ এর অনুসরণ করে এবং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿الإسراء:٩﴾

"এ কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল। এবং যে সকল মু'মিন সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে যে, তাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান।"[২] মোট কথা : আল্লাহর কিতাব যে ধর্ম ও শরীয়ত নিয়ে এসেছে, তার মধ্যে তিনটি মানবস্বার্থ প্রধান্য দেয়া হয়েছে :

প্রথম মানবস্বার্থ : ছয়টি বস্তুর উপর থেকে বিকৃতি, হুমকি ও শংকা দূরভীত করা, তা হল : ধর্ম, জীবন, বিবেক, মনুষ্য বংশ, সম্মান ও সম্পদ হেফাজত করা।

দ্বিতীয় মানবস্বার্থ : মানুষের প্রয়োজনসমূহ অক্ষত রাখা ও সামনে পেশ করা, প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের উপকারী বস্তুগুলো উপার্জনের জন্য কুরআন

[১] সুরা আল মুলক : ১৪

[২] সূরা আল-ইসরা : ৯

বিরাট এক ময়দান উম্মুক্ত করে রেখেছে; সাথে সাথে ক্ষতিকর প্রতিটি পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

তৃতীয় মানবস্বার্থ : উত্তম চরিত্র ও উত্তম স্বভাব অর্জন করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ।

কুরআনুল কারীম আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের মানবিক সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে, যা মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যের বাইরে ছিল। এমন কোন দিক নেই, যেখানে সে কোনো নির্দেশনা দেয়নি। মরণের আগে ও পরে মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারেই সে ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায় সঙ্গত বিধান রচনা করে দিয়েছে।

৪. আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারে অসাধারণত্ব

পবিত্র কুরআনের আরেকটি অলৌকিকত্ব হচ্ছে, অনাগত বিষয় সম্পর্কে সংবাদ প্রদান। যার সত্যতা বর্তমান বিজ্ঞান বের করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿فصلت:٥٣﴾

"আমি সত্বরই তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ চতুর্দিকে দেখিয়ে দেব এবং তাদের নিজেদের ভিতরও। যাতে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনিই হচ্ছেন সত্য। তোমার রবের জন্য এতটুকু কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব জিনিসের উপর দৃশ্যমান ও সাক্ষ্য।"[১]

আল্লাহর এ ওয়াদা শেষ যুগে এসে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মানুষ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দিগন্তে দিগন্তে সে সকল জিনিস অবলোকন করছে। যেমন, উড়োজাহাজ, ডুবু জাহাজ ইত্যাদির মাধ্যমে। মানুষ এসব জিনিসের সবেমাত্র মালিক হয়েছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে এর সংবাদ

[১] সুরা ফুসসিলাত : ৫৩

দিয়েছেন। যা আল-কুরআনের সত্যতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যতার প্রমাণ।

আধুনিক বিজ্ঞানের এ অলৌকিকত্ব সব জায়গাতেই বিকশিত হয়েছে : আসমানে-যমীনে, সমুদ্রে-মরু ভূমিতে, মানুষের মধ্যে, জীব জন্তুর মধ্যে, বৃক্ষ-তরুলতা ও কীট পতঙ্গের ভিতর সর্বত্রই। যার উদাহরণ এখানে পেশ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিযাসমূহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অস্বাভাবিক অনেক ঘটনা রয়েছে, যে গুলোর গণনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা নমুনার জন্য নয় প্রকার অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করব :

প্রথম প্রকার : আসমানী মুজেজা বা অলৌকিক ঘটনা, যেমন ঃ

১. চন্দ্র দ্বি খণ্ডিত হওয়া : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যবাদীতা প্রমাণের এটি অনন্য ঘটনা। মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করল তার নবী হওয়ার একটি প্রমাণ দেখানোর জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চন্দ্র দ্বি খণ্ডিত করে দেখালেন। তারা স্পষ্টভাবে হেরা পর্বতকে চন্দ্রের দু টুকরার মাঝখানে দেখেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

"কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চন্দ্র দু টুকরা হয়ে গেছে। তারা যখন-ই কোনো আয়াত দেখে, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং বলে এটা হচ্ছে প্রচলিত যাদু। তারা মিথ্যারোপ করেছে এবং তারা নিজেদের

প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। প্রতিটি জিনিস-ই যথা সময়ের জন্য স্থিরকৃত।"[১]

২. ইসরা ও মিরাজ : এ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উর্ধ্ব জগত তথা আসমনের উপরে গমন। এর বিবরণ কুরআনে বর্ণিত আছে এবং হাদীসের দ্বারাও বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

"মহান সে সত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মসজিদুল হারাম থেকে আল মসজিদুল আকসা পর্যন্ত। যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি। যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[২]

এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক বড় ঘটনা। অল্প সময়ের মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তার ইসরা বা রাত্রিকালিন ভ্রমন সম্পন্ন হয় এবং সেখান থেকে তাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর সেখানে এমন জায়গায় গিয়েছেন, যেখানে গিয়ে ভাগ্যলীপির আওয়াজ শুনেছেন, জান্নাত দেখেছেন। এবং এখানেই নামাজ ফরজ হয়। সকাল হওয়ার আগে আগেই মক্কায় ফিরে আসেন। এ খবর শুনে কাফেররা এটাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করল এবং তার কাছে এর প্রমাণ চাইল। যেমন তারা রাসূলের কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের আকৃতি ও বিবরণ জানতে চাইল। কারণ, তারা জানতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেননি। আল্লাহ তার সামনে বায়তুল মুকাদ্দাস পেশ করে দিলেন আর তারা যা যা প্রশ্ন করছিল, তিনি

[১] সূরা আল কামার : ১-২

[২] সূরা আল ইসরা : ১

তার সঠিক উত্তর দিয়ে দিলেন। আরো অনেক নিদর্শন তিনি দেখেছেন উর্ধ্ব জগতে।

দ্বিতীয় প্রকার : শুন্য জগতের মুজেজা বা অলৌকিক ঘটনা :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেঘমালার আনুগত্য করণঃ আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মেঘমালার আগমন, প্রত্যাগমন এবং বৃষ্টি বর্ষণ সব কিছুই করেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুআর বরকতে হয়ছিল।

২. বাতাসের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

"স্বরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের নিকট চলে এসে ছিল, আমি তাদের উপর প্রেরণ করি সৈন্য বাহিনী এবং বাতাস যা তোমরা দেখনি।"[১] আল্লাহ তাআলা আহযাবের যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর উপর এ প্রবল বাতাস প্রেরণ করে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে পূর্ব দিগন্ত থেকে আগত বাতাস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ সম্প্রদায়কে পশ্চিমা বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।'[২]

তৃতীয় প্রকার : জীব-জন্তুর ভিতর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করণঃ মানুষ, জিন এবং চতুষ্পদ জন্তু। এ অধ্যায়টি খুবই দীর্ঘ। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল :

(ক) মানুষের ভেতর তার ক্ষমতা প্রয়োগ :

[১] সূরা আল-আহযাব : ৯

[২] সহীহ মুসলিম : ৯০০

১. আলী রা. তার চোখে ব্যথা অনুভব করতে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখের উপর থু থু দেন, ফলে তার চোখ ভাল হয়ে যায়। তার মনে হচ্ছিল, তার কোনো ব্যথা ছিল না।[১]

২. আব্দুল্লাহ ইবেন আতীকের পা ভেঙ্গে গিয়ে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পা মালিশ করে দিলেন। ফলে তার পা ভাল হয়ে গেল। যেমন ইতিপূর্বে সেখানো কোনো ব্যাথা ছিল না।[২]

৩. সালামাতা ইবনুল আকওয়া খায়বারের যুদ্ধে পায়ে ব্যথা পেয়ে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে দম করে দেন। ফলে পরে কখনো তাতে ব্যথা অনুভব হয়নি।[৩]

(খ) জিন এবং শয়তানের উপর তার কর্তৃত্ব

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদেরকে মানুষদের মধ্য হতে বের করে দিতেন। শুধু এ বাক্যের মাধ্যমে যে, 'ও আল্লাহর দুশমন বের হয়ে যাও।'[৪]

২. উসমান ইবনে আবিল আসের সীনা থেকে তিনি শয়তান তাড়িয়ে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত দিয়ে উসমানের সীনায় তিন বার আঘাত করেন এবং তার মুখে থু থু দেন। অতঃপর বলেন, 'আল্লাহর দুশমন বের হয়ে যাও।' এরকম তিন বার করেছেন। তার পর থেকে আর শয়তান কখনো উসমানের কাছে আসেনি।[৫]

(গ) জীব জন্তুর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্তৃত্ব

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩০০৯, সহীহ মুসলিম :২৪০৬

[২] সহীহ আল - বুখারী ৪০৩৯

[৩] সহীহ আল - বুখারী ৪২০৬

[৪] আহমদ : ৪/১৭০-১৭২

[৫] ইবনে মাজাহ : ৩৫৪৮

১. এ রকম ঘটনা অনেক বার হয়েছে। একবার উট এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ জন্তু আর গাছ-পালা আপনাকে সেজদা করে, তার চেয়ে আমরাই আপনাকে সেজদা করার বেশি হকদার।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা তোমাদের রবের এবাদত কর এবং তোমাদের ভাইয়ের সম্মান কর। যদি আমি কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে অবশ্যই নারীদের বলতাম, স্বামীদের সেজদা করার জন্য...'[১]

চতুর্থ প্রকার : গাছ, ফল এবং লাকড়ির উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্তৃত্ব

(ক) গাছের উপর তার প্রভাব :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফর অবস্থায় গ্রামের একজন লোক তার কাছে আসল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ব্যক্তি বলল, আপনার কথার প্রমাণ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সালামা নামক এ বৃক্ষটি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছটিকে কাছে ডাকলেন, গাছটি ছিল ময়দানের প্রান্তে। গাছটি মাটি চিরে চিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এসে উপস্থিত হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিন বার সাক্ষ্য দিতে বললেন। সে তিন বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মত সাক্ষ্য দিল। অতঃপর সে তার জায়গায় চলে গেল।[২]

---

[১] আহমদ : ৪/১৭০-১৭২

[২] সুনান আদ-দারামী : ১৬

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাকালীন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু পর্দা করার কিছু পেলেন না। একটি গাছের ডাল ধরে বললেন, 'আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার অনুসরণ কর।' সে লাগাম যুক্ত উটের ন্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করল। অতঃপর আরেকটি গাছের নিকট এসে তদ্রুপ বললেন। সে গাছও তা-ই করল। অতঃপর উভয় গাছকে মিলে যাওয়ার নির্দের্শ দিলেন। উভয় গাছ মিলে গেল। প্রয়োজন সেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় গাছকে স্ব স্ব স্থানে ফিরে যেতে বললেন। উভয় গাছ স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেল।[১]

(খ) ফলের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রভাব

গ্রামের এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নবী এটা কিভাবে বিশ্বাস করব?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি যদি এ খেজুর গাছ হতে খেজুর ডেকে নিয়ে আসি, তবে কি তুমি বিশ্বাস করবে- আমি আল্লাহর রাসূল?' অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আহ্বান করলেন। গাছ থেকে খেজুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট চলে আসল। অতঃপর তাকে পূর্বের জায়গায় চলে যেতে বললেন, 'ফিরে যাও।' বে পূর্বের জায়গায় চলে গেল। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল।[২]

(গ) কাঠের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রভাব :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় জুমার দিন একটি খেজুর গাছের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বার নিমার্ণ করা হল এবং তাতে উঠে তিনি খুতবা দিতে আরম্ভ করলেন। গাছটি বাচ্চার মত কাঁদতে লাগল। রাসূল

---

[১] সহীহ মুসলিম : ৩০১২

[২] তিরমিজি : ৩৬২৮, আহমদ : ১/১২৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে গরুর মত ঢেকুর তুলতে লাগল গাছটি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, তখনও সে কাঁদতে ছিল। অতঃপর তার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, অবশেষে সে চুপ করল।[১]

পঞ্চম প্রকার : পাহাড় এবং পাথর কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য স্বীকার

(ক) পাহাড়ের আনুগত্য স্বীকার :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাড়ারের উপর উঠলেন। তার সাথে ছিল আবু বকর, উমার এবং উসমান রা.। পাহাড়টি কাঁপতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা দ্বারা আঘাত করে বললেন, 'স্থির হও উহুদ।' তোমার উপর আছে একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ।"[২]

(খ) পাথরের আনুগত্য স্বীকার :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি এখনো সে পাথরটি চিনি, যে পাথরটি আমাকে নবুওয়ত প্রাপ্তির আগেও সালাম করত।'[৩]

(গ) যমীনের উপর তার প্রভাব :

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের ময়দানে ছিলেন এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খচ্চর থেকে নেমে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিলেন এবং শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'চেহারাগুলো মলিন করে দাও।' আল্লাহ শত্রু দলের এমন কোনো মানুষ বাকি রাখেননি, যার চোখে সে

[১] সহীহ আল- বুখারী ৩৫৮৪ আহমদ : ২/১০৯
[২] সহীহ আল- বুখারী ৩৬৭৫
[৩] সহীহ মুসলিম : ২২৭৭

মাটি যায়নি। অতঃপর আল্লাহ তাদের পরাস্ত করেন এবং মুসলমানগণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেন।[১]

ষষ্ঠ প্রকার : পানির নিঃসরণ এবং খানা, পানীয় ও ফলফলাদিতে বরকত -

(ক) পানির উৎসরণ এবং পানীয় বৃদ্ধি পাওয়া :

এ ধরনের অসাধারণ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে অনেক বার ঘটেছে। তন্মধ্যে :

১. হুদাইবিয়াতে সকলে পিপাসার্ত হয়ে গিয়ে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত একটি পাত্রের ভিতর রাখলেন, সাথে সাথে তার আঙ্গুল থেকে ঝর্ণার ন্যায় পানি বের হতে লাগল। তারা সকলে সেখান থেকে পান করল, অজু করল। জাবেরকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমরা কত জন ছিলে?' তিনি বললেন, 'আমরা যদি এক লাখও হতাম, তাহলেও যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম পনের শত মানুষের মত।'[২]
২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে এসে দেখেন এখানকার কুপগুলো খুব ছোট ছোট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে এর থেকে অল্প অল্প পানি জমা করা হল। তিনি তাতে হাত এবং চেহারা ধুয়ে পুনরায় সেখানে পানি রেখে দিলেন আর সাথে সাথে ঝর্ণার ন্যায় পানি বের হতে লাগল। সে কুপটি এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে।[৩]
৩. আবু হুরায়রা রা. এর দুধের পাত্রের ঘটনা। যে পাত্রের দুধ এতো বেশি হয়ে ছিল যে, সকল মেহমান খাওয়ার পরও অতিরিক্ত ছিল।[৪]

[১] সহীহ মুসলিম : ১৭৭৭
[২] সহীহ আল - বুখারী ৩৫৭৬
[৩] সহীহ মুসলিম : ৭০৬
[৪] সহীহ আল - বুখারী ৬৪৫২

(খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কল্যাণে খানা বৃদ্ধি, বরকত লাভ, যেমন :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে রণাঙ্গনে ছিলেন। এক সময় সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সাথে ছিল সামান্য খাদ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দস্তরখান বিছিয়ে নিজ নিজ খানা সেখানে উপস্থিত করার নিদের্শ দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কল্যাণের স্পর্শ পেয়ে খানাতে প্রচুর বরকত হল। সকলে সে খানা ভক্ষণ করল এবং স্ব স্ব পাত্রে জমা করে রাখল।[১]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম খন্দক যুদ্ধে তিন দিন পর্যন্ত কোনো খানা গ্রহণ করেননি। জাবের রা. একটি উট জবেহ করে আনল এবং তার স্ত্রী আটা পিষে দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে সকলকে তার খানার প্রতি আহ্বান জানালেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আটার খামির এবং গোশ্তের পাত্রের মধ্যে মুখের লালা দিলেন, ফলে খানা বরকতময় হয়ে গেল। জাবের রা. আল্লাহর শপথ করে বলেন, আমরা এক হাজার জন ছিলাম। সকলে খানা খেয়ে চলে আসলাম। তবুও আমাদের খানা যে পরিমাণ ছিল, সেরূপই থাকল। পাত্রগুলো খাদ্যে পুর্ণ ছিল। আটার খামির বাকি ছিল। আমার ধারণা সে খামির দিয়ে আরো রুটি তৈরী করা যেত।

এ অধ্যায়টি খুবই বড়, সবগুলো আলোচনা করা সল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

(গ) ফল ও শষ্যের বৃদ্ধি। যেমন :

১. এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে কিছু খানা চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১] সহীহ আল - বুখারী ২৯৮২, সহীহ মুসলিম : ১৭২৯

তাকে আধা অসাক তথা ত্রিশ সা'র (বাহাত্তর কেজির) মত আটা প্রদান করলেন। সে এবং তার পরিবার তা থেকে খেতে ছিল। মোটেই শেষ হচ্ছিল না। ফলে একদিন মেপে দেখল। অতঃপর এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনাটি জানাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমরা না মাপতে, তবে এর থেকে খেতে থাকতে বহু দিন।[১]

২. জাবের রা. এর পিতা ঋণগ্রস্থ ছিল। তার বাগানে যে পরিমাণ খেজুর ছিল, তাতে তাদের যথেষ্ট হত না। জাবের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মাপার জন্য সে খেজুর উপস্থিত করল, তিনি তার ভেতর জাবের রা. এর প্রয়োজন মোতাবেক মেপে দিলেন। জাবের রা. বলেন সে খেজুর আমার কাছেই ছিল, মনে হচ্ছিল, তা যেন কমছে না।[২]

সপ্তম প্রকার : আল্লাহর ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য প্রদান :

১. হিজরত প্রক্কালে ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

"আল্লাহ তাআলা তার উপর সাকিনা নামক বিশেষ অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেন। এবং তাকে তিনি এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেছেন, যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ কাফেরদের বাক্য ছোট করে দিয়েছেন। মুলতঃ আল্লাহর বাক্যই মহান।"[৩]

---

[১] সহীহ মুসলিম : ২২৮১

[২] সহীহ আল - বুখারী   ৩৫৮০

[৩] সূরা আত-তওবা : ৪০

২. বদর প্রান্তে। আল্লাহ তাআলা বলেন : إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِمُرْدِفِينَ

"স্বরণ কর! যখন তোমরা স্বীয় রবের নিকট ফরিয়াদ করতে ছিলে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব।"[১]

৩. উহুদ ময়দানে জিবরীল ও মিকাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডানে এবং বামে থেকে যুদ্ধ করেছে।

৪. খন্দকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

"স্বরণ কর! যখন তোমাদের নিকট সৈন্য বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছিল। আমি তাদের উপর বাতাস এবং বিশেষ এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছি, যা তোমরা দেখনি।"[২]

৫.বনু কুরাইযা যুদ্ধের সময়, খন্দকের যুদ্ধ থেকে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র রেখে গোসল করার পর, জিবরীল এসে বললো, 'কি, অস্ত্র রেখে দিয়েছেন?' আমরা তো এখনো অস্ত্র রাখিনি। শত্রু বাহিনীকে ধাওয়া করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোথায়? অতঃপর বনু কুরাইযার প্রতি ইংগিত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থান অভিমুখে অভিযানে বের হলেন। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তাকে বিজয় দিলেন।[৩]

৬.হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

[১] সূরা আল-আনফাল : ৯

[২] সূরা আল-আহযাব : ৯

[৩] সহীহ আল-বুখারী ৪১১৭, সহীহ মুসলিম ১৭৬৯।

وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ سورة التوبة

"এবং তিনি এমন সৈন্যদল নাযিল করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি। আর তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন; আর এটা হচ্ছে কাফিরদের কর্মফল।"[১]

অষ্টম প্রকার ঃ তার শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ যথেষ্ট হওয়া এবং তাকে মানুষ থেকে রক্ষা করা

এই প্রকারটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালতের সত্যতার ওপর বড় নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে একটি। এ প্রকারের উদাহরণঃ

১. মুশরিক এবং উপহাসকারীদের বিরুদ্ধে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হওয়াঃ ফলে তারা কোন কুমতলব নিয়ে তার কাছে পৌঁছাতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ سورة الحجر

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর, এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্যে বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে"[২]

২. ইহুদী খ্রিষ্টানের মোকাবেলায় আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হওয়াঃ আল্লাহ বলেনঃ

[১] সূরা আত-তাওবা, ২৬।

[২] সূরা আল-হিজর,৯৪-৯৫।

فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ سورة البقرة

"তোমরা যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তারাও যদি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি তারা ফিরে যায় তবে তারা বিচ্ছিন্নতায় পতিত। অতএব এখন তাদের ব্যাপারে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই মহা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"[১]

৩. এবং সকল মানুষ থেকে তাকে সুরক্ষা করা ঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ سورة المائدة

"হে রাসূল! যা কিছু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর, তবে তুমি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাওনি বলে বিবেচিত হবে। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে সুরক্ষিত রাখবেন।" [২]

এবং এটা এক ব্যাপক বার্তা যে, আল্লাহ তাকে সকল মানুষ থেকে নিরাপত্তা দিবেন। কারণ উল্লেখিত তিনটি তথ্যই সংঘটিত হয়েছে যা আল্লাহ তাআলা জানালেন। আল্লাহই তার শত্রুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিলেন বিভিন্ন অলৌকিক নিয়মে। শত্রুর আধিক্য, শক্তি সামর্থ্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে বিজয়ী করেছেন, এবং যারা তার বিরোধিতা করেছে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

[১] সূরা আল-বাকারা, ১৩৭।
[২] সূরা আল-মায়িদা, ৬৭।

এমনি একটি ঘটনা– জনৈক খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করে। সূরা বাকারা, ও আলে ইমরান পড়ে এবং সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লেখক হিসাবে কাজ শুরু করে। এরপর সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আবার খ্রিষ্টান হয়ে যায়। সে বলত, আমি যা লিখতাম মুহাম্মাদ এর বাহিরে আর কিছু জানতো না। আল্লাহর ইচ্ছায় লোকটির আকস্মিক মৃত্যু হয়। গোত্রের লোকেরা তাকে মাটিতে পুঁতে রাখলো। প্রত্যুষে তাকে মাটির উপর পাওয়া গেল। তারা খুব গভীর গর্ত করে আবার তাকে মাটিতে পুঁতে রাখলো। এবারও প্রত্যুষে তাকে মাটির উপর নিক্ষপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। তারা আবার আরো গভীর করে গর্ত করে তাকে পুঁতে রাখলো, সকালে দেখা গেল সে আজো নিক্ষিপ্ত অবস্থায় যমীনের উপরে পড়ে আছে। মানুষ বুঝল এটা কোন মানুষের কাজ নয়, তাই তারা পতিত অবস্থায়ই তার লাশ রেখে ফিরে গেল।[১]

নবম প্রকার ঃ তার দুআ কবুল হওয়া

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন এবং তার কবুল হওয়ার বিষয় মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। এটা দিবা লোকের মত স্পষ্ট এবং এর সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তা বিস্তারিত বর্ণনা করার ক্ষেত্রও এটা নয়। তবে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১.নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রা. জন্য দুআ করতে যেয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! তাকে সন্তান ও সম্পদে বৃদ্ধি দান কর, এবং যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও'[২] তার হায়াত বৃদ্ধি কর, তার গুনাহ ক্ষমা কর'[৩] আনাস বললেন, আল্লাহর শপথ! 'নিশ্চয় আমার সম্পদ অনেক হয়েছে, আমার সন্তান সন্ততি এক শতের মত।[৪] আমার মেয়ে আমিনা আমাকে সংবাদ দিয়েছে, আমার

[১] সহীহ আল - বুখারী ৩৬১৭, সহীহ মুসলিম , ২৭৮১।
[২] সহীহ মুসলিম ,২৪৮০।
[৩] আল-আদাবুল মুফরাদ,৬৫৩।
[৪] সহীহ মুসলিম ,২৪৮১,১৪৩।

বংশের একশত উনত্রিশ জন লোককে বসরার হিজাজে দাফন করা হয়েছে।'[1]

তার একটি বাগান ছিল। তাতে বছরে দুবার ফল আসত। বাগানের মাঝে এমন ফুল ছিল, যা থেকে মেশকের সুগন্ধি আসতো।'[2]

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রা. এর মায়ের হেদায়েতের জন্য দুআ করলে ততক্ষণাৎ দুআ কবুল হয় এবং তার মা মুসলমান হয়ে যায়।[3]

৩. উরওয়া বিন আবু যায়েদ আল বারিকি রা. এর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তার ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দাও।' ফলে তিনি বাড়ি ফেরার পূর্ব মূহুর্তে কুফা শহরে অবস্থান কালে ব্যবসায় চল্লিশ হাজার আয় করেন।[4] তার অবস্থা এমন হয় যে, মাটি বিক্রয় করলে তাতেও তিনি লাভবান হতেন।[5]

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কতিপয় শত্রুর বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলে তা কবুল হয়। যেমন আবু জাহেল, উমাইয়্যা, উকবা, উতবা প্রমুখ।[6]

৫. বদর যুদ্ধের সময় দু'আ, হুনাইন যুদ্ধের সময় দু'আ, সূরাকা বিন মালেকের জন্যে দু'আ ইত্যাদি সবগুলোই কবুল হয়েছে।[7]

প্রকৃত কথা হলো– সুবিচারক জ্ঞানী এবং ধর্মানুরাগী এসব দলীল ও শিহরণ সৃষ্টিকারী প্রমাণাদির সামনে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য। এবং তার ঈমান গ্রহণ না করে অন্য উপায় ও থাকে না। তাই সে হৃদয় মন থেকে

[1] সহীহ আল - বুখারী ১৯২৮।
[2] তিরমিযী, ৩৮৩৩ হাদিসটি হাসান গরিব।
[3] সহীহ মুসলিম , ২৪৯১।
[4] মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৭৬।
[5] সহীহ আল - বুখারী, মানাকেব অধ্যায়, ৩৬৪২।
[6] ফতহুল বারী, ১/৩৪৯ সহীহ মুসলিম ৩/১৪১৮।
[7] সহীহ মুসলিম ১৭৬৩, ১৭৭৫।

উচ্চারণ করে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

ঊনিশতম পরিচ্ছেদ

মানব ও জিনের প্রতি তার রিসালাতের সার্বজনীনতা

প্রকৃত কথা হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা সকলের দায়িত্ব। জিন–ইনসান, আরব–অনারব, ইহুদী–খৃষ্টান, আগুন পুজারী, সূর্য পূজারী, রাজা– প্রজাসহ সকল সৃষ্টিজীবের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহকে পেতে হলে প্রকাশ্যে এবং গোপনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এমনকি তার নবুওয়ত কালে যদি মুসা বা ঈসা কিংবা অন্য কোন নবী জীবিত থাকতেন, তবে তাদের উপরও তার আনুগত্য করা অপরিহার্য হত।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لمِاَ مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

'এবং আল্লাহ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও দৃঢ় প্রজ্ঞা যা দান করলাম তারপর যখন একজন রাসূল আগমন করবেন, যিনি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান কিতাবের সত্যতা স্বীকার করবেন। তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও বলেছিলেনঃ তোমরা কি

অঙ্গীকার গ্রহণ করলে এবং এর দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। সূতরাং এরপরে যারা ফিরে যাবে, তারাই দুষ্কার্যকারী।'[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ কোন নবী প্রেরণ করেননি তবে তার কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি তোমার জীবিত থাকাকালে মুহাম্মাদ প্রেরিত হয় তবে অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন। এবং তার প্রতি এ আদেশ ও ছিল যে, তার উম্মত থেকেও সে এ অঙ্গীকার নিবে যে তাদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ প্রেরিত হলে তারা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তাকে সাহায্য করবে।[২]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আজকে যদি মূসা তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতো তাকেও আমার আনুগত্য করতে হতো।'[৩]

যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সার্বজনীন রিসালাতের বিরোধীতা করে, সে দু কারণের কোন এক কারণে তা করে থাকে।

১. বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ; তবে তার রিসালত শুধু আরব জাতির জন্য।
২. বিরুদ্ধাচরণকারীরা তার রিসালত অস্বীকার করে আংশিকভাবে, আবার তাদের কেহ পূর্ণভাবে।

যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতকে স্বীকার করে, তবে সে তার রিসালতকে শুধু আরব জাতির জন্য নির্দিষ্ট করে। এ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই জরুরী আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অবর্তীণ সব

[১] সূরা আলে ইমরান, ৮১-৮২।
[২] আল ফুরকান বাইনা আওলিয়া ইর রাহমান ওয়া আওলিয়া ইস শয়তান, ৭৭,১৯১,২০০পৃষ্ঠা, তাফসিরে ইবনে কাসীর, ১/৩৭৮।
[৩] মুসনাদে আহমাদ,৩/৩৩৮ মাযমাউয যাওয়াইদ, ১/১৭৩-১৭৪ মিশকাত তাহকীক অঠলবানী, ১/৬৩,৬৮।

কিছুকে সত্যায়ন করা। তম্মধ্যে আছে তার রিসালতের সামগ্রিকতা এবং রিসালতে মুহাম্মাদী ব্যতীত অন্যগুলো রহিত হওয়া। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, তিনি প্রেরিত হয়েছেন সকল মানুষের জন্য। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূত প্রেরণ করেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কিসরা, কায়সার, নাজ্জাসীসহ অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি পাঠিয়েছেন। এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এবং ইহুদী, খ্রিষ্টানদের সাথে লড়াই করেছেন। তাদের বংশধরদের গ্রেফতার করেছেন। তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য্য করেছেন। যদি আপনি তাকে আল্লাহর প্রেরিত নবী হিসাবে স্বীকার করেন তখন তার কথাগুলোকে ও তিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা সবই বিশ্বাস করতে হবে, মেনে নিতে হবে আপনাকে। নয়তো আপনি নিজেকে নিজ বিশ্বাসে পরস্পর বিরোধী রোগে আক্রান্ত বলে প্রমাণিত করবেন।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালতকে অস্বীকার করে, তার জন্য বক্তব্য হল– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালতের সত্যতার উপর রয়েছে অকাট্য দলিল-প্রমাণ। এখনও কুরআনের মুজিযা জিন– ইনসানের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিরাজ করছে। তাই তাকে হয়তবা সুপ্রতিষ্ঠিত মুজিযাকে খণ্ডন ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে, নয়তবা তাকে স্বীকার করে নিতে হবে এর বক্তব্য। যদি রিসালাতকে স্বীকার করে অবশ্যই তাকে মেনে নিতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত সকল কিছু। যদি অহংকারী- বিদ্বেষী হয় তবে তাকে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রেরিত কুরআনের মত একটি কিতাব পেশ করতে হবে। এটা করতে গেলে নিঃসন্দেহে সে কলঙ্ক ও দোষে পতিত হতে হবে। কারণ ভাষা সাহিত্যিক ও অলংকারবিদরা যুগ যুগ ধরে এতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই পরবর্তিতে যারা আসবে

তাদেরও ব্যর্থ হতে হবে, কারণ কুরআন সুপ্রতিষ্ঠিত অলৌকিক গ্রন্থ অনন্ত কালের জন্য ।[১]

এর মধ্য দিয়ে কুরআন অনুযায়ী আমল করার, এবং কুরআন মত বিচার ফায়সালা করার অবশ্যকতা প্রমাণিত হয় । কুরআন তো স্পষ্টভাবে বলেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন সকল মানুষের জন্য । এবং নবীদের মধ্যে তিনি শেষ নবী । আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যে সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূ মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তার সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর । যে (নবী) আল্লাহতে ও তার কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে । তোমরা তারই অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে ।"[২]

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

"কত মহান তিনি, যিনি তার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন ।"[৩]

---

[১] আল জাওয়াবুস সাহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ । ১/১৪৪,১৬৬ ।

[২] সূরা আল-আরাফ১৫৮ ।

[৩] সূরা আল-ফুরকান ০১ ।

আল্লাহ তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করার জন্য আদেশ করছেন । আল্লাহ বলেনঃ

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

"আর এ কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক ও সাবধান করি ।"[১]

যার কাছে কুরআন পৌঁছেছে তাদের প্রত্যেকের জন্য এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা ।

আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) রিসালাতে মুহাম্মদীর অর্ন্তভূক্ত বলে আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

"যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছো? নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে । আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তোমার উপর দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেয়া মাত্র । আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা ।"[২]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী"[৩]

---

[১] সূরা আল-আনআম, ১৯ ।

[২] সূরা আলে ইমরান.২০ ।

[৩] সূরা আল আহযাব, ৪০ ।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالمِينَ

“আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি”[1]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ سورة سبأ

“আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।”[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষকে এ বার্তা পৌছে দিয়েছেন যে, তিনি নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং তার রিসালত হচ্ছে সার্বজনীন এক রিসালাত। তিনি বলেন, ‘আমাকে পাঁচটি বস্তু প্রদান করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তম্মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য নবীদের প্রেরণ করা হতো নির্দিষ্ট কাওমের প্রতি, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের প্রতি.... ।’[3]

তিনি আরো বলেনঃ ‘আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত যে খুব সুন্দর করে একটি প্রাসাদ তৈরী করল, তবে একটি কোণের একটি ইট বাদ থেকে গেল, (ঐ জায়গাটি খালি ও অপরিচ্ছন্ন) লোকেরা দেখে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, ‘আহা! যদি এ ইট খানি দেওয়া হতো কতইনা ভাল হতো! তিনি বলেন, ‘আমি ঐ কাঙ্খিত বস্তুটি, এবং আমি নবীদের মাঝে শেষ নবী।’[4]

জ্বিন- ইনসান সকলের জন্য সর্বত্র ও সর্বকালে–তার প্রেরণ কাল হতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত তার রিসালাত ব্যাপক হওয়া এবং রিসালতসমূহের মধ্যে সর্বশেষ রিসালত হওয়া, সন্দেহাতীত প্রমান করে তার পরে ঐশী বাণীর আগমন ও নবুওয়ত প্রাপ্তির অবসান করা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। এবং

[1] সূরা আম্বিয়া, ১০৭।
[2] সূরা সাবা, ২৮।
[3] সহীহ আল - বুখারী, ৪৩৮, সহীহ মুসলিম , ৫২১।
[4] সহীহ আল - বুখারী, বাবু খাতামিন নাবিয়্যিন, ৩৫৩৫, সহীহ মুসলিম ২২৮৬।

ইবাদত ও বিধান প্রণয়নের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া আর কোন মূলনীতি নেই। আর এটার দাবী হল, তার রিসালতের ব্যাপকতাকে বিশ্বাস করার এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করার। তিনি বলেন, ‘যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন এ উম্মতের ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের যে কেউ আমার সর্ম্পকে জানবে এবং আমার উপর প্রেরিত রিসালাতকে বিশ্বাস না করে মৃত্যু বরণ করবে তাহলে সে জাহান্নামীদের অর্ন্তভূক্ত হবে।’[1]

আল্লাহর অনুগ্রহে– রিসালাতে মুহাম্মদীর সার্বজনীন ও সামগ্রিতা সকল জিন–ইনসানের জন্যে প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে– কেয়ামত অবধি সর্বত্র ও সর্বকালে।

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

“নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে। এবং যে ব্যক্তি নিজে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তো তোমাদের প্রহরী নই।”[2]

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

“বলঃ সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।”[3]

বিশতম পরিচ্ছেদ

[1] সহীহ মুসলিম , ১৫৩।
[2] সূরা আল-আনআম,১০৪।
[3] সূরা আল-কাহ্ফ,২৯।

ইহুদী ও খৃষ্টান লেখক কর্তৃক রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দান

১. ন্যায়পরায়ণ ইহুদী পন্ডিতদের স্বীকৃতিঃ

ইহুদী ও খৃষ্টানদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার একটি কৌশল হল, তাদের মধ্যে যারা নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ন তাদের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা। যারা সত্য গোপন করেনি, মধ্যপন্থী, আল্লাহ সত্য গ্রহণের তাওফিক তাদের দিয়েছেন ইসলামের সমর্থনে তাদের বক্তব্য ঠিক আল্লাহর বাণী

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا

(তাদের পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো) এর মত। যে সকল ইহুদী আলেম ও পন্ডিতকে খোদ ইহুদীরা তাদের ধর্মের বিদ্বান বলে স্বীকার করত এ ক্ষেত্রে তাদের কয়েকজনের বক্তব্য উপস্থাপন করা হল ঃ

১. আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ

যদি নবী যুগে ইহুদীদের মধ্য থেকে তাদের সর্বসম্মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং তাদের শ্রেষ্ঠ নেতাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাদের বিজ্ঞ পন্ডিতদের মাঝে শ্রেষ্ঠ পন্ডিতের সন্তান, তাদের খুব প্রিয় ব্যক্তিদের মাঝে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও প্রিয় ব্যক্তির সন্তান ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে তাহলে পৃথিবীর সকল ইহুদীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য তা ছিল যথেষ্ট। কেমন হবে, যদি তার অনুসরণ করে ইহুদীদের আরো অসংখ্য ধর্মযাজক. পৌরোহিত- পাদ্রী?[১]

ঐ সেরা ব্যক্তিটি ঈমান এনেছেন আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর। আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম জেনেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করেছেন। তিনি তার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব, যার

[১] হিদায়াতুল হায়ারা ফি আজবিবাতিল ইয়াহুদে ওয়ান নাসারা, পৃ ৫১৪-৫২৫।

উত্তর নবী ছাড়া অন্য কেহ অবগত নয়। অতঃপর বললেন, 'কেয়ামতের প্রথম আলামত কি? জান্নাতীদের প্রথম খাবার কি হবে? সন্তানের মাঝে পিতা অথবা মাতার আকৃতি লক্ষ্য করা যায় কেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ মাত্র জিবরীল আমাকে জানিয়েছেন এর উত্তর।' ইবনে সাল্লাম বললেন, 'ফেরেশ্তাদের মাঝে ইনিইতো ইহুদীদের শত্রু।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কেয়ামতের প্রথম আলামত হল আগুন। যা পূর্ব থেকে মানুষকে ধাবিত করে পশ্চিমে নিয়ে একত্র করবে। আর জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা। আর সন্তানের আকৃতির রহস্য হল, যদি সঙ্গমের সময় পুরুষের বীর্য নারীর পানির উপর প্রাধান্য লাভ করে তবে সন্তান পুরুষের মত হবে আর যদি নারীর পানি পুরুষের বীর্যের উপর প্রভাব লাভ করে তবে সন্তান নারীর আকৃতি পাবে। উত্তর শুনে ইহুদী পন্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, আর নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।' তিনি আরো বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদী বড় মিথ্যারোপকারী জাতি। আপনি তাদের জিজ্ঞেস করার আগে তারা যদি আমার ইসলাম কবুলের বিষয়টি জানতে পারে তাহলে আপনার কাছে আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। তাই তারা জানার আগে আমার বিষয় তাদের প্রশ্ন করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ডেকে পাঠালেন। তারা উপস্থিত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমরা জান আমি আল্লাহর সত্য নবী। আমি সত্য কিতাব নিয়ে এসেছি, অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তিনবার বলার পরও তারা বলল, 'আমরা জানিনা।' অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম সম্পর্কে তোমাদের মন্তব্য কি?' তারা বলল, 'তিনি আমাদের নেতা, নেতার ছেলে, আমাদের মাঝে মহাজ্ঞানী, এবং মহা জ্ঞানীর ছেলে, আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আলেম এবং আলেমের সন্তান।' রাসূল বললেন, 'যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তোমারা কি মতামত দেবে?' তারা বলল,

'আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুক, কখনো তার ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।' রাসূল আবার বললেন, 'যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তোমারা কি মতামত দেবে?' তারা বলল, 'আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুক, কখনো তার ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।' রাসূল আবার বললেন, 'যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তোমারা কি মতামত দেবে?' তারা বলল, 'আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুক, কখনো তার ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ইবনে সাল্লাম বেরিয়ে এসো!' আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম তাদের সম্মুখে এলেন অতঃপর ঘোষণা করলেন 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। হে ইহুদীরা আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয় তোমরা জানো মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, এবং তিনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন।' তারা বলল, 'তুমি মিথ্যা বলেছ। এ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের সন্তান।' তারা এভাবে বলেই চলল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বের করে দিলেন।'[১]

আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম হতে বর্ণিত, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করলে লোকেরা তার দিকে দ্রুত ধাবিত হলো এবং বলতে লাগল, 'আল্লাহর রাসূল আগমন করেছেন! আল্লাহর রাসূল আগমন করেছেন!! আল্লাহর রাসূল আগমন করেছেন!!!' আমিও তাকে দেখতে মানুষের সাথে শামিল হলাম। অতঃপর তার মুখ মন্ডলের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেললাম যে, এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তখন তার মুখ থেকে প্রথম যে কথা শুনলাম তা হল, 'হে লোক সকল! সালামের প্রসার কর। মানুষকে আহার দাও। আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখ। মানুষ যখন ঘুমে থাকে তখন নামায পড়। তাহলে নিরাপদে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২]

[১] সহীহ আল - বুখারী, ৩৩২৯, ৩৯১১,৪৪৮০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২১০/৩।
[২] ইবনে মাজা, ৩২৫১, তিরমিযি, ২৪৮৫।

আল্লাহ তাআলা এ রাব্বানী, ধার্মিক আলেম আব্দুল্লাহ বিন সাল্লামের প্রশংসা করেছেন। সাআদা বিন আবু ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যমীনে বিচরণকারী কারো ব্যাপারে 'লোকটি জান্নাতবাসী' বলতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিনি, তবে আব্দুল্লাহ বিন সাল্লামের ব্যাপারে বলেছেন'[১] এবং বলেনঃ

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ

'বনী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সাক্ষ্য দিল।' আয়াতটি তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

২.যায়েদ বিন সুয়ানাহ– ইহুদী পাদ্রী ঃ

তিনি বললেন, নবুওয়াতের যত আলামত আছে, সবগুলো আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে পেয়েছি যখন তার চেহারায় দৃষ্টি দিলাম। তবে দুটি আলামত সম্পর্কে তাকে যাচাই করা বাকি থেকে যায়। তা হলঃ

১. অজ্ঞতার উপর তার ধৈর্য প্রাধান্য পেয়ে থাকে, ২. তার প্রতি অজ্ঞতাপুর্ন আচরণ তার মাঝে অজ্ঞতাকে বৃদ্ধি না করে সহিষ্ণুতাকে প্রবল করে। এ দুটিও যাচাই করার পর আমি আমার গন্তব্য পেয়ে যাই। হে উমার! তুমি সাক্ষী থাক, আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম, এবং মুহাম্মাদকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হলাম। তোমাকে আরো সাক্ষী করছি, আমার প্রচুর সম্পদ রয়েছে, তার অর্ধেক উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য দিয়ে দিলাম। উমার রা. বললেন, তোমার এ দান উম্মতে মুহাম্মাদীর অংশ বিশেষের উপর নয় কি? কারণ তুমি তো সবাইকে পাবে না। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিছু অংশের উপর।' অতঃপর আমরা উভয়ে রাসূল

[১] প্রমাণিত যে, নবী স. আরো অনেকের ব্যাপারে জান্নাতবাসী বলে সুসংবাদ দিয়েছেন, তম্মধে আশারা মুবাশ্শিরা, কারো কারো মত হলো সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাসের উদ্দেশ্য ছিল তখনকার সময় যারা জীবিত তারা। কারণ আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম তাদের পর ও জীবিত ছিলেন। আশারা মুবাশ্শিরার মধ্যে তার সময় সা'দ ও সাঈদ ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট ছিল না। তাছাড়া 'যারা যমীনে বিচরণ করছেন ' এ উক্তিটি সা'দা বিন আবু ওয়াক্কাস রা. এর নিজস্ব মন্তব্য। ফাতহুল বারি ১২৯-১৩০/৭।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম। বললাম, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

এ যায়েদ বিন সুয়ানাহ রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেন। তাকে সত্যায়ন করলেন। তার কাছে দীক্ষা নিলেন এবং তার সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাবুক অভিযানে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন। [১]

৩. যে ইসলাম গ্রহণ করল মৃত্যুর সময়ঃ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. উমার রা. একজন ইহুদী আলেমের নিকট আসলেন। যে ছিল তাওরাতের প্রচারক। সে তার প্রিয় সন্তানের মৃত্যু শয্যায় শোকে সান্তনা স্বরূপ তাওরাত পাঠ করছিলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাকে ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি তাওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তোমার কিতাবে আমার গুণাবলি ও মক্কা হতে আমাকে বের করে দেওয়া সম্পর্কে তথ্যাবলী পেয়েছো?' সে মাথা দিয়ে ইংগিত করে বলল, 'না।' তার ছেলে বলল, 'হায়! যিনি তাওরাত নাযিল করেছেন তার শপথ করে বলছি, 'আমরা আপনার গুণাবলি ও আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করে দেয়ার বিষয় তাওরাতে পেয়েছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।' এরপর সে মৃত্যু বরণ করল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইহুদীকে তোমাদের ভাই থেকে পৃথক করে দাও তারপর এর কাফনের ব্যবস্থা করা হলো, তাকে সুগন্ধি মাখানো হলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা আদায় করেন।'[২]

[১] মাজমাউয যাওয়াদে ২৩৯,২৪০/৮।
[২] মুসনাদে আহমদ ৪১১/৫ ইবনে কাসির ২৫৫/২।

এ তিনটি ঘটনা যা উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হল, এগুলোতে ইহুদী ধর্মযাজকদের এ স্বীকৃতি রয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, এবং তার গুণাবলি তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে। এবং ইহুদী সম্প্রদায় তাদের ছেলে মেয়েকে যে রূপ চিনতে পারে অনুরূপ তারা চিনে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আল্লাহ বলেনঃ

وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাসকরুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।"

৪.ইহুদীদের মধ্য থেকে যে মৃত্যু শয্যায় মুসলমান হলোঃ

আনাস রা.হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একজন ইহুদী যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করতো সে অসুস্থ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখার উদ্দেশে এসে মাথার পাশে বসলেন এবং তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর।' যুবকটি তার পিতার দিকে তাকালো। পিতা বলল, 'আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ) এর আনুগত্য কর' যুবকটি মুসলমান হয়ে গেল। নাসায়ীর বর্ণনা মতে- অতঃপর যুবকটি বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।' অতঃপর নবী কারীম বেরোবার সময় বললেন, 'সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য যিনি তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন।'[১]

দ্বিতীয়তঃ ন্যায়পরায়ণ খ্রিষ্টান পন্ডিতের থেকে স্বীকৃতিঃ

আল্লাহর দিকে আহবানের কৌশলের মধ্যে, একটি হলো খ্রিষ্টানদেরকে আল্লাহর দিকে আহবানের সময় তাদের ন্যায়পরায়ন আলেম-পন্ডিতদের স্বীকৃতিকে এবং তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা। এটা

[১] সহীহ আল - বুখারী ১৩৫৭,৫৬৫৭।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴿٢٦﴾سورة يوسف

'পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল' এর মত ।

এখানে কতিপয়ের বিবরণ দেয়া হল ঃ

১. নাজ্জাসী– ইথিওপিয়ার সম্রাট

জাফর বিন আবু তালেব রা. যখন নাজ্জাসীর সামনে সূরা মারইয়ামের প্রথম থেকে পাঠ করলেন । নাজ্জাসী এমিনভাবে কেঁদে ফেলে যে চোখের পানিতে তার দাঁড়ি ভেজে যায় এবং তার পরিষদবর্গও তেলাওয়াত শুনে কেঁদে ফেলে । নাজ্জাসী প্রতিনিধিকে বলেছিলো, 'তোমাদের সাথি মুহাম্মাদ ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে কি বলে?' জাফর বললেন, 'তার বিষয় তিনি বলেন যা কোরআনে আছে, 'ঈসা আল্লাহর রূহ, এবং তার কালেমা । আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন বাতুল– কুমারী মারিয়ামের মধ্যে– যাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি ।' অতঃপর নাজ্জাসী একটি লাঠি উত্তোলন করলো এবং বললোঃ 'ওহে পুরোহিত ও সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়! তোমরা ঈসা সম্পর্কে যা বল তা এরচেয়ে বেশি কিছু নয় ।' এবং প্রতিনিধিকে বলল, 'শুভেচ্ছা তোমাদেরকে এবং তোমরা যার নিকট থেকে এসেছো তাকেও শুভেচ্ছা । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রাসূল । আর তিনি সেই ব্যক্তিত্ব যার ব্যাপারে ঈসা সুভ সংবাদ দিয়েছে । যদি আমি রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্বে না থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তার নিকট আসতাম এবং তার পাদুকায় চুমো খেতাম ।'[১]

২. সালমান আল– ফারেসী রা.

সালমান আল– ফারেসীর ঘটনাতো আশ্চর্য জনক । তিনি খ্রিষ্টানদের একদল বড় জ্ঞানীদের মাঝে জীবন যাপন করছিলেন । যখন তিনি ঐ আলেমদের মধ্যে সর্বশেষ আলেমের সাথে রোমের আমুরিয়াতে ছিলেন, তার মৃত্যু সন্নিকটে এলে সে সালমান আল ফারেসীকে এ বলে অন্তিম উপদেশ দিল যে, 'পবিত্র ভূমি থেকে প্রেরিত, এমন একজন নবীর যুগ

[১] সিয়ার আ'লামীন নুবালা ৪২৮-৪৪৩ ।

তুমি পাবে, যার হিজরতের স্থান হবে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি অনুর্বর ভূমির খেজুর গাছ বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের দিকে । তার মধ্যে নবুওয়তের অনেক আলামত থাকবে । দুই স্কন্দের মধ্য স্থানে নবুওয়তের সীলমোহর থাকেব । তিনি উপহার গ্রহণ করবেন । তবে সাদকা খাবেন না । অতএব তোমার যদি ঐ শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়, তবে তুমি তাই কর । কারণ তুমি তার নবুওয়ত কালের একেবারে সন্নিকটে ।'

সালমান আল–ফারেসী যাত্রা করলো এবং সে সব আলামাত প্রত্যক্ষ করলো যা তাকে বলা হয়েছে অতঃপর,সে ইসলাম গ্রহণ করলো ।[১]

৩.রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসঃ

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius) আবু সুফিয়ানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে বললঃ ..... আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে প্রতারণা করে কিনা?' তুমি বললে, 'না ।' রাসূলগণ এমনি হন তারা প্রতারণা করেন না । তোমাকে প্রশ্ন করলাম, তিনি কি করতে আদেশ করে? তুমি বললে, 'তিনি আদেশ করেন আল্লাহর বন্দেগী করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে এবং নিষেধ করেন মূর্তির্র আরাধনা হতে । আর আদেশ করে নামায আদায় করতে, সত্য বলতে, নীতি নৈতিকতার উপর চলতে ।'

তুমি যা বলেছো তা যদি সত্য হয়, তবে তিনি আমার দু' পায়ের অংশটুকু পর্যন্ত অধিকার করবেন । আমি তার আগমন সম্পর্কে জানতাম । তবে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আসবে বলে ধরণা করিনি । যদি আমি তার কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে মনে করতাম, তবে অবশ্যই সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম । যদি আমি তার কাছে উপস্থিত হতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তার কদম ধুয়ে দিতাম ।'[২] অতঃপর বললেন, 'হে রোমানগণ! যদি তোমাদের সুপথ ও কামিয়াবী কামনা কর, এবং তোমাদের রাজ্য স্থিতি কামনা কর? তবে এই নবীর বাইয়াত গ্রহণ কর ।' কিন্তু হিরাক্লিয়াস

[১] সিয়ার আ'লামীন নুবালা৫০৯-৫১০/১ ।
[২] সহীহ আল - বুখারী, ০৭, ১৭৭৩ ।

রাজ্য আকঁড়ে থাকতে চাইলো, ত্যাগ করতে চাইলো না। তাই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি।

এ সব ঘটনা প্রমাণ বহন করে যে, আহলে কিতাবের ন্যায়পরায়ণ ও নীতিবানরা আল্লাহর রাসূলের জন্য প্রস্তুত ছিলো, এবং তিনি যে আল্লাহর সত্য রাসূল তা স্বীকার করেছিল। তাই পরবর্তীতে কোন মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বা ছিদ্র অনুসন্ধান গ্রহণ যোগ্য নয়। [১]

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিরাট একদল ইসলাম গ্রহণ করেছে, এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল সমগ্র মানুষের জন্যই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ سورة المائدة

"তাদের মধ্যে বহু জ্ঞানপিপাসু আলেম এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে, আর এই কারণে যে, তারা অহংকারী নয়।"[২]

তাই যুক্তির কথা হলো সকল খ্রিষ্টানগণ তাদের ন্যায়পরায়ণ, সত্যানুরাগী, ধর্মপ্রাণ বিদ্বানদের পথ অনুসরণ করবে এবং তারা আল্লাহর আনুগত্য করবে।

একুশতম পরিচ্ছেদ
তার শেষ জীবনের শ্রেষ্ঠকর্ম

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজ করতেন সুনিশ্চিত ও নিয়মিত ভাবে করতেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা স্বল্প হয়।'[১]

[১] হিদায়াতুল হিয়ারা ৫২৫।

[২] সূরা মায়েদা, ৮২।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমজান মাসে দশ দিন ইতিকাফ করতেন। যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান ঐ বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেছিলেন। তার নিকট কুরআন পেশ করা হতো বছরে একবার। তবে যে বছর তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান ঐ বছর কুরআন দু'বার পেশ করা হয়।[২]

আয়েশা রা, হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বেশি বেশি বলতেনঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

'হে আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা এবং তোমার প্রশংসা করছি, তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।'

আয়েশা রা. বললেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ বাক্যগুলো কি, যা আপনি উদ্ভাবন করে বলছেন?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে আমার জন্য একটি নিদর্শন তৈরী করা হয়েছে। আমি যখন তা দেখি তখন এগুলো বলি। তা হল,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

এ সূরা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস উমার রা. কে বললেনঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় .."

এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যু সংবাদ। এটা আমি জানি। উমার রা. বললেন, 'আপনি যা জানেন আমি তা-ই জানি।'[৩]

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৯৯৮, সহীহ মুসলিম , ৭৮২।

[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৩৩, সহীহ মুসলিম , ২৪৫০।

[৩] সহীহ আল - বুখারী, ৪৪৩০।

কারো মত হলো, এ সূরাটি বিদায় হজের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় অবস্থান কালে জিলহাজ্ব মাসের দশম তারিখে অবর্তীণ হয়।[১] কারো মত হলো আইয়্যামে তাশরীকের দিবসগুলোতে সূরাটি অবর্তীণ হয়।[২] তাবারানি বর্ণনা করেন, এ সূরা নাযিলের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালের বিষয়ে আমল জোরদার করেন। আয়েশা রা. বলেন, এর প্রেক্ষিতে রাসূল রুকু ও সিজদায় অধিক পরিমাণে বলতেন,

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

'তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ ! আর তা তোমার প্রশংসার সাথে। হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো।'

প্রকৃত পক্ষে এতে তিনি কুরআনেরই প্রতি ধ্বনি করছিলেন[৩] যা সূরা আন-নাছর এ বলা হয়েছে

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতাবাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক তাওবা গ্রহণকারী।"

সারকথা ঃ এ অধ্যায়ে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এর মধে মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. নিয়মিত নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান। অনিয়মিত অধিক আমলের চেয়ে নিয়মিত অল্প আমল অনেক উত্তম । কারণ নিয়মিত আমলের মাধ্যমে নেকআমল, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত, মুরাকাবা, আন্ত রিকতা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আগ্রহ অব্যাহত থাকে।

[১] ফাতহুল বারী, ৭৩৪/৮ কারো কারো মত হলো এ সূরা অবর্তীণ হওয়ার পর তিনি আর মাত্র ৮১ দিন হায়াত পেয়ে ছিলেন, ফাতহুল বারী, ৭৩৪/৮।
[২] ফাতহুল বারী, ১৩০/৮।

২. যে কোন ইবাদতে নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করলে আশংকা থাকে যে, বিরক্ত হয়ে সে ঐ কাজ ছেড়ে দেবে।

৩. মুসলিম ব্যক্তি যখনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তার সাধ্যানুযায়ী সে নেক কাজে অধিক সময় ব্যয় করে। যাতে সে আল্লাহর সাথে ভালভাবে সাক্ষাত করতে পারে, কারণ আমলের মূল্যায়ন শেষে হয়।

বাইশতম পরিচ্ছেদ

বিদায় হজে উম্মতের জন্য উপদেশ ও বিদায় গ্রহণ

১. মানুষের মাঝে হজের ঘোষণাঃ

সুস্পষ্ট দাওয়াত, আমানত আদায়, উম্মতকে উপদেশ, আল্লাহর পথে যথাযথ সংগ্রামের পর তিনি মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দেন। তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তিনি দশম বছর হজব্রত পালন করবেন। মদীনাতে নয়টি বছর দাওয়াত, শিক্ষা, জিহাদে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করার পর এ ঘোষণায় উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে হজ ফরযের সংবাদ পৌঁছানো–যাতে তারা তার নিকট থেকে হজের বিধি-বিধান শিখে নেয় এবং তার কাজ–কথাগুলো প্রত্যক্ষ করে। এবং তাদের অসীয়ত করবেন, উপস্থিতগণ কর্তৃক অনুপস্থিতদের কাছে এ পয়গাম পৌঁছে দেয়ার জন্য। তারা যাতে ইসলামী দাওয়াতের অনুসরণ করে এবং দূরে ও কাছের সকলের নিকট তা পৌঁছে দেয়।[১]

জাবের রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন এ সময়ে হজ করেননি। অতঃপর দশম হিজরীতে তিনি লোকদের মাঝে হজের ঘোষণা দেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করবেন। তাই মদীনায় বিশাল

[১] শরহুন নববী আলা সহীহ সহীহ মুসলিম , ৪২২/৮।

একদল লোক জমায়েত হলো। তাদের সকলের আকাঙ্খা তারা রাসূলের অনুসরণ করবে। হজে তিনি যা করবেন তারাও তার মত আমল করবেন....'এ ভাবেই জাবের রাসূলের হজের কথা বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায় তিনি বললেন , বাইদা[১] নামক স্থানে তার উষ্ট্রী তাকে নিয়ে থেমে গেল। আমি আমার দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত তার সামনে পদব্রজকারী ও আরোহনকারীদের দেখতে পেলাম। অনুরূপ তার ডানে বামে ও পেছনেও দেখলাম।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই ছিলেন। তার উপর আল-কুরআন অবর্তীণ হচ্ছিল এবং তিনি তার ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি যা আমল করেছেন আমরা ও তার সাথে আমল করতে থাকি। ...এভাবে জাবের রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজ আদায়ের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায় বললেন, 'তিনি আরাফায় পৌঁছলেন এবং নামিরাতে তার জন্য নির্মিত তাবুতে অবতরণ করলেন।'

২.আরাফয় উম্মতকে শেষ উপদেশ ও বিদায় জানানোঃ

জাবের রা. বলেন, যখন সূর্য অস্তমিত হলো 'কাসওয়া' (তার সাওয়ারী) আনার জন্য আদেশ করলেন। তাকে নিয়ে আসা হলো। 'বাতনে ওয়াদী'তে তিনি ভাষণ দিলেন এবং বললেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের কাছে সম্মানিত। যেমন পবিত্র ও সম্মানিত তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর। জেনে রাখ! জাহেলী যুগের সকল কর্মকান্ড আমার পদতলে পিষ্ট।[৩] জাহেলী যুগের রক্তের দাবী রহিত করা হলো। প্রথম যে রক্ত দাবী রহিত করছি, তাহলো আমাদের রক্তর দাবী – ইবনে রবিয়া বিন হারিসের রক্ত– সে বনি সাআদ গোত্রে দুধ পান করতো। তাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। জাহেলী সুদ রহিত করা হলো। প্রথম যে সুদ, যা রহিত করলাম তা হলো আমাদের

[১] জুল হুলাইফার একটি এলাকার নাম ।

[২] কারো কারো মত এ সংখ্যা ৯০ হাজার কারো কারো মত হলো এক লক্ষ ত্রিশ হাজার– ফাতহুল মালিকুল মাবুদ ১০৫/২/৯

[৩] অর্থাৎ তিনি জাহেলি সকল কর্ম কান্ড বাতিল করে দিলেন অতএব এটার আর কোন কার্যকরিতা নাই। ফাতহুল মালিকিল মাবুদ ১৮/২।

সুদ – আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর সুদ– তা পুরোটি রহিত করা হলো।[১] আর নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের গুপ্তাঙ্গ বৈধ করেছ আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে।[২] তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো, তোমরা যাকে অপছন্দ কর এমন কাউকে তারা বিছানায় স্থান দেবে না।[৩] যদি তারা এমন কিছু করে বসে, তাহলে তাদের মৃদু শাসন কর। তাদের আহার-বিহার, পোশাক– পরিচ্ছদ তোমাদের দায়িত্বে। তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রেখে গেলাম। যদি তা আঁকড়ে ধর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।[৪] আর আমার ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে কি বলবে?' উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, 'আমরা সাক্ষী দেব যে, আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার শাহাদত আঙ্গুলী আকাশের দিকে উত্তোলন করেন এবং মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন!'[৫] । সমাবেশস্থল বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল।[৬]

আল্লাহ তাআলা জুমার দিবসে আরাফার দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবর্তীণ করেন তার বাণীঃ

[১] এর দ্বারা উদ্দেশ্য যা মূল ধনের অতিরিক্ত, করণ মূল ধন মালিক পাবে ।

[২] কালেমার অর্থ ১. সম্মান জনক ভাবে বিদায় এবং সুন্দর ভাবে গ্রহণ ২. লাইলাহ ইল্লাল্লাহ ৩.ইজাব ও কবুল ৪.এর দ্বারা কোরআনের সূরা নিসার ৩ নং আয়াত উদ্দেশ্য 'তোমাদের মনমত দুইটি ও তিনটি ও চারটিকে বিয়ে কর; ইসলামী বিদ্বানগণ এটিকেই বিশুদ্ধ মত বলে মনে করেন কারণ এতে উল্লেখিত সবগুলো অর্থ এসে যায়। ফাতহুল মালিকল মা'বুদ ১৯/২।

[৩] অর্থাৎ নারী অথবা পরুষ কাউকে যেন স্ত্রী ঘরে আসতে অনুমতি নাদেয়। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, তারা যেন ব্যভিচারির অনুমতি নাদেয় কারণ জিনা সর্বাবস্থায় হারাম স্বামী পছন্দ হোক অথবা অপছন্দ। প্রাগুপ্ত।

[৪] অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে গেলাম যদি তা বিশ্বাসে ও আমলে মজবুত হয় ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হলো আল্লাহর কিতাব যা সামনে পেছনে কোন দিক থেকে বাতিল আসতে পারে না, হাদীসের উল্লেখ এজন্যে করা হয়নি, কারণ কোরআন হলো দ্বীনের মূল, অথবা এ জন্যে যে কোরআনেই তো হাদীসের অনুসরণ করতে বলেছে। ফাতহুল মালিকিল মা'বুদ, ২০/২।

[৫] সহীহ মুসলিম , ১২১৮।

[৬] কারো কারো মত হলো একলক্ষ্য ত্রিশ হাজার ফাতহুল মালিকিল মা'বুদ ১০৫/২।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾ سورة المائدة

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।'[১] এ উম্মতের উপর এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশাল নেআমত; যে আল্লাহ তাদের জন্য তাদের দীন পরিপূর্ণ করেছেন। তাই তাদের অন্য কোন দীনের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবীর মুখাপেক্ষীরও প্রয়োজন পড়বে না। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাকে শেষ নবী বানিয়েছেন। এবং তাকে প্রেরণ করেছেন সকল জিন ইনসানের জন্য। তাই ঐ বস্তু হালাল বলে গণ্য হবে, যা তিনি হালাল বলেন। ঐ বস্তু হারাম হবে, যা তিনি হারাম বলেন। এবং তিনি যা বিধান হিসাবে বলবেন, তাই হবে বিধান। আর তিনি যত সংবাদ দিয়েছেন সবই সত্য–হক্ব, তাতে মিথ্যা – পশ্চাৎপদতা নেই।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

"তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে।" অর্থাৎ সত্যতা সংবাদ পরিবেশনে আর ইনসাফ আদেশ ও নিষেধ প্রদানে। তাই আল্লাহ যখন তাদের জন্য দীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন তাদের উপর নেয়ামত ও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।[২]

বর্ণিত আছে, আরাফা দিবসে এ আয়াত অবতরণ প্রাক্কালে, উমার রা. কেঁদে ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে বললেন, 'এর কারণ হলো আমরা দীনের সমৃদ্ধিতে ছিলাম। এখন পূর্ণাঙ্গ করা হলো। আর কোন বস্তু পূর্ণাঙ্গ হলে তার তা আর বৃদ্ধি পায় না।

[১] সহীহ আল - বুখারী, ৪৫, সহীহ মুসলিম ৩০১৬-৩০১৭।

[২] ইবনে কাসির, ১২/২।

সমৃদ্ধ হয় না।'[১] তিনি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পূর্বাভাস দেখছিলেন এ আয়াতে।

৩. জামরাতে উম্মতকে উপদেশ দান ও বিদায় জানানোঃ

জাবের রা. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দশম তারিখে বাহনে থেকে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি 'তোমরা আমার থেকে তোমাদের বিধি-বিধানগুলো শিখে নাও, আমি জানি না, হতে পারে এ হজের পর আমি আর হজ করব না।'[২]

উম্মে হুসাইন রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ পালন করেছি, এবং তাকে দেখেছি জামরাতুল আকাবা নিক্ষেপ শেষে ফেরার পথে তিনি সাওয়ারীর উপর ছিলেন। তার সাথে বেলাল ও উসামা রা. ও ছিলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কথাই বললেন। তবে আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের উপর যদি কোন কালো বিকলাঙ্গ কৃতদাস আমীর নিযুক্ত করা হয়, সে যদি আল্লাহর কিতাব দিয়ে তোমাদের পরিচালিত করে, তার আনুগত্য কর, অনুসরন কর।'[৩]

৪. কুরবানীর দিনে উম্মতকে উপদেশ দান ও বিদায় জানানোঃ

আবু বকরা রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বহনকারী উটে বসা ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি লাগাম ধরলেন। তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি জানো এটা কোন দিন?' তারা বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।' এবং তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমরা মনে করলাম তিনি আজকের দিনের অন্য কোন নাম ঘোষণা করবেন। অতঃপর বললেন, 'এটা কি কুরবানীর দিন নয়?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, 'এটা কোন মাস?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল

[১] ইবনে কাসির ১২/২।

[২] সহীহ মুসলিম, ১২৯৭।

[৩] সহীহ মুসলিম, ১২৯৮।

ভাল জানেন।' এবং তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমরা মনে করলাম, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম দেবেন। অতঃপর বললেন, 'এটা কি জিলহজ মাস নয়?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, 'এটা কোন শহর?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন।' তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমরা মনে করলাম, তিনি এ শহরের অন্য কোন নতুন নাম বলবেন। বললেন, 'এটা কি পবিত্র নগরী নয়?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ রাসূল!' তিনি বললেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত-আব্রু, তোমাদের শরীর তোমাদের কাছে সম্মানিত ও হারাম। যেমন সম্মানিত এ নগরী, এ মাস, আজকের এ দিন। অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই আমার পর তোমরা ভ্রষ্টতার দিকে যাবে না- যা তোমাদের পরস্পরকে হত্যার দিকে ধাবিত করে। জেনে রাখ! তোমরা যারা আজ উপস্থিত আছ তারা এ বাণী পৌঁছাবে অনুপস্থিতদের কাছে। কারণ বহু বর্ণনাকারী হতে শ্রবণকারী অধিক জ্ঞানী, ও সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। আমি কি পৌঁছিয়েছি?' অতঃপর পেছনে গেলেন এবং দুটি লাবণ্যময় মেষ জবেহ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি – 'উপস্থিতিগণ অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছাবে' এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে উম্মতের জন্য অসীয়ত। তিনটি প্রশ্নের প্রতিটির পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকার উদ্দেশ্য ছিল ঃ তাদের বোধশক্তিকে উপস্থিত করা, সকলের মনোযোগ পুরোপুরি আকর্ষণ করা এং সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করানো।[১]

ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানী দিবসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামারাতে অবস্থান করেন...এবং বলেন, 'এটা হচ্ছে বড় হজের দিন। আরো বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী

[১] ফাতহুল বারী, ১৫৯/১।

থাকুন।' এবং লোকদের বিদায় জানালেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, 'এটা বিদায় হজ।'[১]

মীনাতে আল্লাহ সকল হাজীদের কানগুলো ব্যাপক ভাবে খুলে দিলেন, যেন কুরবানী দিবসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদত্ত খুতবা সবাই শুনতে পায়। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজিযা যে আল্লাহ তাদের কানে বরকত দিলেন এবং শ্রবণ শক্তিকে বৃদ্ধি করলেন। যাতে দূরে কাছে সবাই তার ভাষণ শুনতে পায়। এমনকি তারা অনেকে তাদের বাড়িতে বসে ও শুনতে পেয়ে ছিলেন।[২]

আব্দুর রহমান বিন মুয়ায আত তাইমী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা মিনায় অবস্থানকালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন, আর আমাদের কানগুলো খুলে দেওয়া হলো। এমনকি তিনি কি বলছেন তা আমরা গৃহে বসেও শুনছিলাম।[৩]

৫.আইয়্যামে তাশরীকে উম্মতের জন্যে তার অসীয়ত ঃ

জিলহজ মাসের বারো তারিখে আইয়্যামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, এ দিনটিকে ইয়াওমুর রা'স– মাথা দিবস– বলা হতো। এ দিনে তারা জবেহকৃত পশুর মাথা আহার করতো বলে মক্কার লোকেরা এ নামে দিনটিকে উল্লেখ করতো। এবং এটা ছিল তাশরীক দিনগুলোর অন্ত র্ভুক্ত।[৪]

বাকার গোত্রের দুইজন লোক যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ছিলেন, বললেন, তাশরীক দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা খুতবা দিতে দেখেছি, আমরা তার উষ্ট্রীর কাছে ছিলাম। এটা ছিল মিনায় প্রদত্ত খুতবার মত।

[১] সহীহ আল - বুখারী, ১৭৪২।
[২] আউনুল মাবুদ, ৪৩৬/৫।
[৩] আবু দাউদ ১৯৫৭।
[৪] আউনুল মাবুদ ৪৩২/৫।

আবু নাদরা রা. হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তাশরীক দিবসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবা শুনেছেন, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের প্রভু একজন। তোমাদের পিতা একজন। জেনে রাখ, অনারবের উপর আরবের কোন প্রাধান্য নেই। কালোর উপর সাদারও নেই কোন শ্রেষ্ঠত্ব। সাদার ও নেই কালোর উপর কোন প্রাধান্য। তবে শ্রেষ্ঠত্ব হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি তোমাদের কাছে? তারা বললো, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!' অতঃপর বললেন, 'এটা কোন দিন? তারা বলল, 'এটা সম্মানিত দিন।' তিনি আবার বললেন, 'এটা কোন মাস?' তারা বলল, 'এটা পবিত্র মাস।' আবার বললেন, 'এটা কোন নগরী?' তারা বলল, 'সম্মানিত নগরী।' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ সম্মানিত করেছেন তোমাদের পরস্পরের রক্ত, সম্পদ, ইজ্জত আব্রু, ঠিক আজকের সম্মানিত দিন, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত নগরীর মত। আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি?' তারা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পৌঁছিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদের কাছে যেন এ বাণী পৌঁছে দেয়।'[১]

এখানে বিদায় হজে পবিত্র স্থানসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষণের সংক্ষেপ বর্ণিত হলো।

এর মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং বললেন, 'শয়তান আশাহত হয়েছে এ বিষয়ে যে, এ ভূমিতে তার উপাসনা হবে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য আমল যা তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান কর, তার বিষয়ে সে উপাসনা পাওয়ার আশা করবে। অতএব! তোমরা সাবধান থেকো! আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন বিষয়, যা তোমরা আকড়ে ধরলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব, তাঁর নবীর সুন্নাত।'[২]

---

[১] মাজমাউযাওয়ায়েদ ২৬৬/৩ রিজাল ছহিহ।

[২] আত তরগীব– আলবানী.৩৬/১

আবু উমামাহ রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার জাদআ উটের উপর থেকে বিদায় হজে জনতার উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদানকালে বলতে শুনেছি, 'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর আনুগত্য কর। পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম কর। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর। রমযানের সিয়াম পালন কর। এবং তোমাদের শাসকের আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজের আহবানে সাড়া দিয়ে যে-ই মদীনায় উপস্থিত হয়েছেন, সে-ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই হজ করেছেন। জাবের রা. হতে বর্ণিত হাদীস তাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন, মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়েছিল। প্রত্যেকের ইচ্ছা আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করবে। তিনি যা আমল করবেন তারা তা-ই করবে।

২. হাজীদের জন্য উত্তম হলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর আরাফায় অবতরণ করা, যদি সম্ভব হয়।

৩. আরাফায় হাজীদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করা উত্তম, এতে থাকবে মানুষের জরুরী বিষয়ের ব্যাখ্যা, তাওহীদ ও দীনের মৌলনীতির ব্যাখ্যা। তাতে সতর্ক করা হবে শিরক, বিদআত ও পাপ ও মুসলিম জাতির দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে এবং উপদেশ থাকবে মানুষের প্রতি কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করার।

বিদায় হজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি খুতবা প্রদান করেছেন। আরাফা দিবসে খুতবা, মীনায় কুরবানী দিবসের খুতবা, মীনায় জিলহজ মাসের ১২ তারিখে খুতবা। ইমাম শাফী র. এর মত হলো ইমাম অনুরূপ খুতবা দেবে। জিলহাজ মাসের

---

[১] হাকেম ৪৭৩/১ মুসলিমের শর্তে।

সাত তারিখে[১] এবং এর মধ্যে আগামী খুতবার পূর্ব পর্যন্ত সব বিষয় ইমাম শিক্ষা দেবে।

৪. রক্ত, ইজ্জত, সম্পদ, শরীর ইত্যাদি পবিত্র হওয়ার বিষয় দৃঢ়ভাবে গুরুত্ব প্রদান। এক মুসলিমের জান, মাল-সম্পদ, ইয্যত-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম ও সম্মানিত। সে এগুলোর কোন ক্ষতি করতে পারে না। বরং এগুলোকে সম্মান করতে হবে।

৫. উদাহরণ ব্যবহার এবং একটি উপমার সাথে অন্য একটি উপমার তুলনা। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী– 'এ দিনের মত সম্মানিত, এ মাসের মত হারাম, এ শহরের মত পবিত্র।

৬. জাহেলী যুগের সকল কর্মকান্ড ও সুদ রহিত করা। এটাও জেনে রাখা যে, জাহেলী যুগের হত্যাকান্ডের কোন কেসাস নেই।

৭. ইমাম অথবা যে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে, সে প্রথমে নিজেকে এবং নিজের পরিবার থেকে শুরু করবে। কারণ এরা তার কথা গ্রহণের উপযুক্ত। এবং নবদীক্ষিত মুসলিমের সাথে ভাল আচরণ করা।

৮. সুদের মধ্যে মূলধনের অতিরিক্ত হলো হারাম। মূলধন মালিকেরই প্রাপ্য।

৯. নারী অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা, এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

১০. স্ত্রীর ভরণ–পোষণ দেয়া ফরয। সে যদি কোন অন্যায় করে এর জন্য তাকে শর্তসাপেক্ষে এবং কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত নিয়মে শাস্তি দেয়া যাবে এবং এর ফলে যেন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।

[১] ফাতহুল মালিকিল মাবুদ ২০/২।

১১. উপদেশ হবে আল্লাহর কিতাব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমে।

১২. 'তোমরা হজের বিধানাবলী আমার থেকে গ্রহণ কর', এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে আদেশ অর্থাৎ আমার এ হজে আমি যা আনয়ন করেছি– কথা, কাজ, আচরণ সবই গ্রহণ কর।

হজের এ সকল আহকাম তোমরা শিখে নাও, সংরক্ষণ কর, আমল কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। হজের আহকাম বিষয়ে এটি একটি মৌলিক হাদীস, যা নামাজের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী صلوا كما رأيتموني أصلي (তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ সেভাবে নামাজ পড়) এর মত।

১৩. 'সম্ভবত এরপর আমি হজ করবো না' এর মাধ্যমে উম্মতকে বিদায় জানানোর প্রতি ইঙ্গিত। এবং তাদের জানিয়ে দেয়া যে, মৃত্যু অতি নিকটে। তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তার কাছ থেকে শিক্ষা নেয়ার এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য। আর এ কারণেই এটাকে বিদায় হজ বলা হয়।

১৪. জ্ঞানের প্রচার প্রসারের জন্য উৎসাহ প্রদান করা, এবং এ প্রচার প্রসারের জন্য খুব বড় পন্ডিত হওয়া শর্ত নয়। কারণ, হতে পারে তারপর অন্য কেহ আসবে, যে পূর্বের ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিদ্বান হবে। উত্তম হলো খতীব উঁচু স্থানে থাকবে যাতে সবাই দেখতে ও শুনতে পায়।

১৫. প্রশ্ন করা অতঃপর নীরব থেকে আবার তার উত্তর প্রদান, বিষয়টি শ্রোতা ও ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষনের একটি সুন্দর মাধ্যম।

১৬. 'ওয়ালিউল আমর' বা দায়িত্বশীল এর আদেশ সর্বদা মান্য করা। যতক্ষণ তিনি মানুষকে কুরআন অনুসারে পরিচালিত করেন। যদি তার থেকে কোন গুনাহ এবং নিষিদ্ধকাজ প্রকাশ পায় তাহলে

তাকে উপদেশ দেয়া, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, আল্লাহর ভয় দেখানো উচিত। তবে তা হবে হিকমত ও উত্তম পদ্ধতিতে।

১৭. আল্লাহর আনুগত্য, নামায, যাকাত, রোযার নির্দেশ দেয়া এবং এ অসীয়ত করা যে মানুষের মাঝে কোন শ্রেণি বিভক্তি নেই, নেই কোন বর্ণ বিভক্তি। কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতে মান-মর্যাদার স্তর নির্ণয় করা হবে।।

১৮. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকাশিত মুজিযা – কুরবানী দিবসে তার খুতবা গৃহে অবস্থান করেও মানুষেরা শুনতে পেরেছে। আল্লাহ্ তাআলা সকলের কানগুলো বিশেষভাবে খুলে দিয়েছেন। যা রাসূলের রিসালাতের সত্যতার আরেকটি নিদর্শন।

১৯. ইসলামী বিদ্বানদের মতে কুরবানী হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এটা হাজী এবং হাজী ভিন্ন সকলের জন্য। এর মাধ্যমে হাদি[১] আদায় হবে না। হাদি জবেহ করা স্বতন্ত্র সুন্নাত। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় খুতবা প্রদান করার পর যে দুটি মেষ যবেহ করেছেন[২] তা ঐ সকল হাদির থেকে পৃথক ছিল, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে যবেহ করেন এবং বাকীগুলো আলী রা. কে যবেহ করতে বলেছেন।

তেইশতম পরিচ্ছেদ
মৃত ও জীবিতকে বিদায় দান

[১] হাদি বলা হয় : হজের অংশ হিসাবে যে পশু জবেহ করা হয়।

[২] ফাতহুল বারী ৫৭৭,৫৭৪/৩ ফাতহুল মালিকিল মাবুদ।

আয়েশা রা. বলেন, যখন আমার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত্রি যাপনের পালা আসতো, তিনি শেষ রাতে বাকী নামক কবর স্থানের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যেতেন। অতঃপর তিনি বলতেন[১] :

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيح الغرقد.

(হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি সালাম। যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাতো এসে গেছে। আগামী কাল আমাদের সময়। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে যোগ দেব। হে আল্লাহ! আপনি বাকী গারকদ বাসীকে ক্ষমা করুন)

অপর একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরীল আমার কাছে এসেছে.. অতঃপর সে বলে, 'আপনার প্রভু আপনাকে বাকীতে দাফনকৃত কবরবাসীদের নিকট গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।' তখন আয়েশা রা. বলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি তাদের জন্য কি বলব? তিনি বললেন, 'তুমি এ কথাগুলো বলবে। [২]

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون.

(তোমাদের প্রতি সালাম হে মু'মিন ও মুসলিম অধিবাসীগণ! আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের রহম করুন! আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।)

[১] বাকিউল গারকাদ : মদীনাবাসীদের কবর স্থান। গাকাদ মূলতঃ একপ্রকার কাটা গাছ, এখানে কোনো এক সময় এ গাছগুলো ছিল, তাই এর নাম হয়ে গেছে গারকাদ বলে। নববির ব্যাখ্যা গ্রন্থ ৭/৪৬, ইমাম উব্বির ব্যাখ্যা গ্রন্থ ৪/৩৯০

[২] সহীহ মুসলিম : ৯৭৪

ইমাম উব্বি রহ. বলেন, ‘এ সকল কবর যিয়ারতের ঘটনা হচ্ছে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ জীবনের।'[1] এর দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, তিনি মৃত ব্যক্তিদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। যেমন তিনি তা করেছেন উহুদের ময়দানে শহীদগণের ক্ষেত্রেও। আর এ জন্যই তিনি বাকীর কবরবাসীদের জন্য দুআ করার নিমিত্তে শেষ রাতে ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতেন। আয়েশা রা. বলেন, ‘...আমিও তার পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলাম। তিনি বাকীর কবর স্থানে এসে দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন। তিনবার তাদের জন্য হাত উঠালেন। অতঃপর রওয়ানা করলেন... ।”[2]

উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, আট বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মদীনা থেকে বের হয়ে উহুদের শহীদদের উপর নামাজ পড়লেন; যেভাবে মৃত ব্যক্তিদের জন্য জানাযা নামাজ পড়ার নিয়ম—সেভাবে। অতঃপর মিম্বারে উঠে বললেন, ‘তোমাদের মধ্য হতে আমিই সবার অগ্রগামী। আমি তোমাদের সকলের জন্য সাক্ষী হবো। তোমাদের সাথে আমার হাউজে কাউসারে সাক্ষাত হবে। আল্লাহর শপথ! আমি আমার এ স্থানে দাড়িয়ে হাউসে কাউসার অবলোকন করছি। আমাকে দুনিয়ার ধনভান্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে। অথবা বলেছেন, দুনিয়ার চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার পরে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করবে, এ আশংকা আমি করি না। তবে, আমি দুনিয়ার বিষয়টি নিয়ে তোমাদের ব্যাপারে শঙ্কিত—তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। নিজেরা ঝগড়া ফাসাদ ও মারামারিতে লিপ্ত হবে। অতঃপর তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও ধ্বংস হয়েছে।’

[1] উব্বির ব্যাখ্যা গ্রন্থ : ৩/৩৮৮ ফাতহুল বারি : ৭/৩৪৯

[2] সহীহ মুসলিম : ৯৭৪

উকবা রা. বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপরে এটাই আমার সর্বশেষ দেখা।’[1]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ব্যক্তিদের থেকে বিদায় নেয়ার বিষয়টি এ হাদীসের ভাষা থেকেই স্পষ্ট। কারণ ভাষণটি ছিল তার জীবনের শেষের ঘটনা। মৃত ব্যক্তিদের থেকে বিদায় নেয়ার উদাহরণ হচ্ছে, বাকী কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, উহুদের শহীদদের জন্য দুআ করা এবং স্বশরীরে তাদের যিয়ারত থেকে ফিরে আসা।[2]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতদের কল্যাণ করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছেন। জীবিত এবং মৃত সকলের কল্যাণ কামনায় ব্রতী ছিলেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ : আট বছর গত হওয়ার পরও তিনি উহুদের শহীদদের উপর জানাযার ন্যায় নামাজ পড়েছেন। বাকীর কবরস্থানে কবরবাসীদের যিয়ারত করেছেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছেন। জীবিত ব্যক্তিদের উপদেশ, নসীহত ও কল্যাণের নির্দেশনা দিয়েছেন। এমন কোনো কল্যাণ নেই, যা তিনি স্বীয় উম্মতকে বলেননি। এমন কোনো অকল্যাণও নেই, যা থেকে তিনি নিজ উম্মতকে সতর্ক করেননি।

২. যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া এবং তার ঐশ্বর্য প্রদান করেছেন, তাকে দুনিয়ার চাক্যচিক্য থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তার উচিত অশুভ পরিণতির ভয় করা। দুনিয়া নিয়ে আত্মতুষ্টিতে না থাকা। এ ব্যাপারে কারো সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না

[1] সহীহ আল - বুখারী ১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৪২, ৪০৮৫,৬৪২৬, ৬৫৯০, সহীহ মুসলিম ২২৯৬

[2] আল-ফাতহ : ৭/৩৪৯

হওয়া। বরং নিজের কাছে যা আছে, তা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যবহার করা।[১]

চব্বিশতম পরিচ্ছেদ

অসুস্থতার সূচনা ও আবু বকর রা. কে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান

নবুওয়তের দশম বছর হজ সম্পাদন শেষে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতেই অবস্থান করেন। জিলহজের বাকি অংশ, মহররম এবং সফর মাসে তিনি সুস্থই ছিলেন। এ সময়ে তিনি উসামা বিন যায়েদকে প্রধান করে একটি সৈন্যদল গঠন করেন। মুসলিম মুজাহিদগণ যার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। সফর মাসের প্রায় শেষ অংশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতা বোধ করতে আরম্ভ করেন। ২২ সফর, ২৯ সফর আবার কেউ সফর পরবর্তী রবিউল আউয়ালের প্রথমাংশের কথাও বলেছে। এ সময়ের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের জন্য জানাযার ন্যায় নামাজ পড়েছেন। বাকীর কবরস্থানে গিয়ে সালাম করেছেন এবং শেষ বারের মত তাদের জন্য দুআ করেছেন। একবার বাকী হতে ফেরার সময় দেখেন, আয়েশা রা. মাথার ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। আর বলছেন, হায় মাথা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার বলার প্রয়োজন নেই, বরং আমিই বলছি, আমার মাথা ব্যথা করছে। হায় মাথা!' আয়েশা রা. বলেন, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আয়েশা, তোমার এতে অসুবিধা কোথায়? তুমি যদি আমার আগে মারা যাও, আমি তোমার কাফনের ব্যবস্থা করব, তোমার জানাযার নামাজ পড়ব এবং আমি নিজেই তোমার দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন করব।' আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, 'আমি মারা গেলে তো মজাই হবে, আরেক জন নারী

[১] ফাতহুলবারী : ১১/২৪৫

নিয়ে আমার ঘরে নতুন করে সংসার পাততে পারবেন।' আয়েশা রা. বলেন, 'এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন।[১] অসুস্থতা বাড়তে বাড়তে তীব্র আকার ধারণ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মায়মুনার ঘরে। তিনি সকল স্ত্রীদের ডেকে আমার ঘরে অসুস্থকালীন সময়টি থাকার অনুমতি নিলেন।'[২]

আয়েশা রা. বলেন, প্রথম যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুস্থতা আরম্ভ হয়, তখন তিনি মায়মুনার ঘরে অবস্থান করছিলেন। ধীরে ধীরে রোগ বৃদ্ধি পেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল স্ত্রীদের কাছে আমার ঘরে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সকলে আমার ঘরে থাকার জন্য মত দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা. এবং অপর এক জন লোকের কাঁধে ভর করে, মাটির সাথে পা হেচরে হেচরে আমার ঘরে প্রবেশ করেন। আয়েশা রা. বলতেন, আমার ঘরে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখ বৃদ্ধি পায়, তখন তিনি বললেন, 'পরিস্কার সাত কলস পানি আমার গায়ে ঢেলে দাও, আমি যাতে সুস্থ হয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে পারি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর স্ত্রী হাফসা রা. এর গোসল খানায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসিয়ে আমরা তার উপর সে কলসগুলোর পানি ঢালতে থাকি। এক সময় হাতের ইশারায় বলতে লাগলেন যে, 'তোমরা যথেষ্ট করেছো।' অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে গেলেন, সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়লেন এবং সকলকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন।[৩]

[১] ইবনে হিশাম : ৪/৩২০ আল-বিদায়া ও আল-নেহায়া : ৫/২২৪ ফাতহুল বারী : ৮/১২৯-১৩০ আহমদ : ৬/১৪৪ সুনানে দারামি : ৮০

[২] ইবনে হিশাম : ৪/৩২০ আল-বিদায়া ও আল-নেহায়া : ৫/২২৩-২৩১ কেউ কেউ বলেছেন ঘটনাটি হল সফরের ২৯ তারিখ, বৃহস্পতিবারের। তের দিন ছিলেন অসুস্থ অবস্থায়। এটাই অনেকের বক্তব্য। ফাতহুল বারী : ৮/১২৯

[৩] সহীহ আল - বুখারী ১৯৮, সহীহ মুসলিম : ৪১৮

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বলেন, 'লোকজন কি নামাজ পড়ে নিয়েছে?' আমরা বললাম, 'না, তারা নামাজ পড়েনি। হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' তিনি বললেন, 'গোসলখানায় আমার জন্য কিছু পানি রাখ।' আমরা পানি রেখে দিলাম। তিনি গা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর খুব কষ্ট করে উঠতে চাইলেন, সক্ষম হলেন না। বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুশ ফিরে আসলে আবার বলেন, 'লোকজন কি নামাজ পড়ে নিয়েছে?' আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' তিনি বললেন, 'গোসলখানায় আমার জন্য কিছু পানি রাখ।' আয়েশা বললেন, আমরা পানি রেখে দিলাম। তিনি বসে গাঁ ধুলেন। অতঃপর উঠে দাড়াতে চাইলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না, বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। আবার হুশ ফিরে এলে বলেন, 'লোকজন কি নামাজ পড়ে নিয়েছে?' আমরা বললাম, 'না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, 'গোসলখানায় আমার জন্য কিছু পানি রাখ। আমরা পানি রেখে দিলাম, তিনি বসে গাঁ ধুয়ে নিলেন। অতঃপর উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না। বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। আবার হুশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'লোকজন কি নামাজ পড়ে নিয়েছে?' আমরা বললাম, 'না, তারা আপনার অপেক্ষা করছে, হে আল্লাহর রাসূল! আয়েশা রা. বলেন, তখন লোকজন এশার নামাজের জন্য মসজিদে বসে বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপেক্ষা করতে ছিল। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বল। লোকটি এসে আবু বকরকে বলল, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে নামাজ পড়াতে বলেছেন।' আবু বকর রা. ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি উমার রা.কে বললেন, 'উমার! আপনি নামাজ পড়ান।' উমার রা. তাকে বললেন, 'আপনি এর জন্য আমার চেয়ে বেশি উপযোগী।' আয়েশা রা. বলেন, 'কয়েক দিন আবু বকর নামাজ পড়ালেন। এরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে

কিছুটা হালকা মনে করলেন, তখন তিনি দু'জন লোকের কাধে ভর করে জোহর নামাজের জন্য মসজিদে গেলেন। আবু বকর রা. অন্যান্য সাহাবাদের নিয়ে নামাজ পড়তে ছিলেন। আবু বকর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পিছনে সরে আসার প্রস্তুতি নিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করে পিছে সরে আসতে বারণ করলেন। তাদের দু'জনকে বললেন, 'আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও।' আবু বকর দাড়িয়ে দাড়িয়ে রাসূল রা. এর অনুসরণ করছেন, অন্যান্য লোকজন আবু বকরকে অনুসরণ করছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামাজ পড়ছেন।[১] এ নামাজটি ছিল জোহরের, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[২] আবু বকরকে ইমাম বানানোর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুব আগ্রহ ছিল। এ জন্য তিনি বার বার তাগিদও করেছেন। আয়েশা রা. বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুখ বেড়ে যাওয়ার পর বেলাল এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজের সংবাদ দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আবু বকরকে নামাজ পড়াতে

---

[১] সহীহ আল - বুখারী ৬৮৭, সহীহ মুসলিম ৪১৮

[২] কারো ধারণা এ নামাজটি ছিল, ফজরের। তাদের দলিল, ইবনে আব্বাস হতে আরকাম বিন শারাহবিল এর রেওয়াতে। আবু বকর যেখানে শেষ করেছেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে কেরাত পড়া আরাম্ভ করেছেন। ইবনে মাজার বর্ণাকৃত এ হাদিসটির সনদ যদিও হাসান, তবে এর দ্বারা দলিল দেয়া সংঘত নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের অতি নিকটে গিয়েছেন ফলে কেরাত শুনেছেন এরও তো সম্ভাবনা রয়েছে। তার ব্যাপারে আছে, আস্তে কেরাত পড়ার নামাজেও তিনি অনেক সময় অপরকে শুনার মতো আওয়াজ করে কেরাত পড়তেন। যেমন আবু কাতাদার হাদীসে এর প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এর পরেও যদি মেনে নেই যে, জোরে কেরাত পড়ার নামাজ ছিল, তবু প্রমাণিত হয় না যে, এটা ফজরের নামাজ ছিল, বরং মাগরিবের নামাজ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে। সহীহ আল - বুখারী ও মুসলিমে উম্মে ফজল হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আমি মাগরিবের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে والمرسلات عرفا সুরা পড়তে শুনেছি। এর পরে কোনো দিন জমাতের সহিত নামাজ পড়েননি, ইহধাম ত্যাগ করে যান। সহীহ আল-সহীহ আল - বুখারী ৭৬৩, ৪৪২৯ সহীহ সহীহ মুসলিম ৪৬২, ইবনে হাজার রহ. বলেন, নাসায়ীর একটি বর্ণনায় আছে, উম্মে ফজল যে নামাজের কথা উল্লেখ করেছে, সে নামাজ তার বাড়িতে ছিল। ইমাম শাফি রহ. বলেছেন, যে অসুখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন, সে অসুখে এক ওয়াক্ত নামাজ শুধু মসজিদে পড়েছেন। আর সেটা এ নামাজই যে নামাজে তিনি বসে নামাজ পড়েছেন এবং যেখানে আবু বকর প্রথমে ইমাম ছিল পরবর্তীতে মুক্তাদি হয়েছেন। আর অন্যদের তাকবীর শুনাতেন। আল-ফাতহ : ২/১৭৫

বল ।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ । যখন সে নামাজ পড়াতে দাড়াবে, তখন মানুষ তার আওয়াজ শুনতে পাবে না । আপনি বরং উমারকে নামাজ পড়াতে বলুন ।' তিনি বললেন, 'আবু বকরকে বল নামাজের ইমামতি করার জন্য ।' তখন আমি হাফসাকে বললাম, 'তুমি বল, আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ, আপনার জায়গায় সে দাড়ালে মানুষ তার আওয়াজ শুনতে পাবে না । আপনি যদি উমারকে হুকুম করতেন...' সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাই বলল । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বলেন, 'তোমরা তো ইউসুফকে ধোকা দেয়া নারীদের মতো হয়ে গেছ । আবু বকরকে বল, সে নামাজের ইমামতি করবে ।' হাফসা আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে কোনো ভাল কিছুর আশা করতে পারি না ।' আয়েশা রা. বলেন, 'তারা সকলে আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বলে । আবু বকর নামাজ আরম্ভ করলেন । এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিছু সুস্থতা অনুভব করলেন । তখন তিনি দু'জন ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদে রওয়ানা হলেন । তার পা দু'টি মাটিতে হেচরে চলছিল । এভাবেই তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন । আবু বকর টের পেয়ে পিছু হটতে লাগলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করে নিজ স্থানে স্থির থাকতে বললেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হয়ে আবু বকরের ডান পাশে বসলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামাজের ইমামতি করছেন, আর আবু বকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করছেন, অন্যান্য মানুষ অনুসরণ করছে আবু বকরকে ।'

যে কারণে আয়েশা রা. আবু বকরের ইমামতি অপছন্দ করেছেন তা হল, আয়েশা রা. বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বার বার আবু বকরের ইমামিতে আপত্তি জানানোর কারণ ছিল যে, এটাকে মানুষ অশুভ লক্ষণ মনে করবে । আমি এটাকে আবু বকর হতে হটাতে চেয়ে ছিলাম । আর এ জন্যই তাকে ও হাফসাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরাতো ইউসুফের সাথে প্রতারণাকারী নারীদের মতো ।'[১]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে ইমামতির জন্য প্রাধান্য দিয়েছেন । এর অর্থ, তিনি সকল সাহাবাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং কুরআন ভাল করে তেলাওয়াত করতে পারেন । সহীহ মুসলিমে আছে, 'ভাল করে কুরআন তেলাওয়াতকারীই ইমামতি করবে..."[২] আর আবু বকরের মধ্যে এ সকল গুনই বিদ্যমান ছিল ।[৩]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. উহুদের শহীদ ও বাকী কবরস্থানে শায়িত কবরবাসীদের যিয়ারত করা, তাদের জন্য দুআ করা মুস্তাহাব । তবে এর জন্য স্বতন্ত্রভাবে সফর করা কিংবা এতে কোনো ধরনের বেদআতের সংমিশ্রন অনাকাঙ্খিত ও পরিত্যাজ্য ।

২. স্বামীর জন্য নিজ স্ত্রীর গোসল, কাফন-দাফন ইত্যাদির বৈধতা । তদ্রুপ নারীর জন্য নিজ স্বামীর গোসল, কাফন-দাফন ইত্যাদির বৈধতা প্রমাণিত হয় ।

৩. মুমুর্ষ অবস্থায় কোনো অসুবিধার কারণে একাধিক স্ত্রীর বর্তমানে এক স্ত্রীর ঘরে থাকার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে অনুমতি নেয়া । তারা অনুমিত দিলে ভাল । অন্যথায় লটারীর মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে ।

৪. মানব প্রকৃতি, রোগ ও বেহুশ হওয়া থেকে নবীগণও নিরাপদ নয় । তবে তারা উম্মাদ হন না । কারণ এটা একটা বড় ত্রুটি; এ থেকে নবীগণ মুক্ত । এর দ্বারা তাদের সওয়াব বৃদ্ধি পায়, মর্যাদা

[১] সহীহ আল - বুখারী ৭১৩, সহীহ মুসলিম : ৪১৮
[২] সহীহ মুসলিম : ৬৭৩
[৩] আল-বিদায়া ও আল-নিহায়া : ৫/২৩৪

উন্নত হয় এবং অন্যদেরও সান্ত্বনা মিলে। এর আরেকটি ইতিবাচক দিক হল, নবীদের মধ্যে অলৌকিক নিদর্শন, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেখে অনেকের বিভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল। এর দ্বারা তাদের ভ্রম দূর হবে। তারাও দেখে নিবে যে, নবীগণও আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে নিজের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে সক্ষম নন।

৫. বেহুশ হয়ে গেলে গাঁ ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব। এর দ্বারা বেহুশ অবস্থার ক্লান্তিভাব দূর হয়, শক্তি ফিরে আসে এবং শরীরের তাপ কমে।

৬. ইমামের আসতে সামান্য দেরী হলে, মুসল্লীগণ তার অপেক্ষা করবে, আর যদি তার আসতে অনেক দেরী হয়, মুসল্লীদেরও কষ্ট হয়, তবে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী সেই নামাজ পড়াবে।

৭. সকল সাহাবাদের উপর আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এর ঘটনায় তার এবং অন্যদের জন্যও ইঙ্গিত যে, খেলাফতের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। কারণ, সাধারণ জনগণ নিয়ে নামাজ পড়ার অধিকার একমাত্র খলীফারই। দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাও বলেছেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে আমাদের দ্বীনের জন্য মনোনীত করেছেন, আমরা তাকে আমাদের দুনিয়ার জন্যও মনোনীত করলাম।'

৮. জামাতে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব এমন কোনো কারণ থাকলে ইমাম বা খলীফা অন্য কাউকে প্রতিনিধি করতে পারেন। তবে, সে যেন সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি হয়।

৯. উমর রা. এর ফজিলতের বিষয়টি লক্ষণীয়। কারণ, আবু বকর রা. তার উপর নির্ভর করেছেন, তাকে নামাজ পড়াতে অনুরোধ করেছেন। অন্য কাউকে নামাজ পড়াতে বলেননি।

১০. সম্মুখে প্রশংসা করার বৈধতা : যদি অহংবোধ, গরিমার আশংকা না থাকে। এ হাদীসে উমার রা. আবু বকর রা. কে 'আপনি এর জন্য উপযুক্ত বলে' তার সম্মুখে প্রসংশা করেছেন।

১১. উপযুক্ত ব্যক্তিদের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ না করার বৈধতা প্রমাণিত হল, যদি সেখানে এমন কেউ বিদ্যমান থাকে, যে উত্তম রূপে সে দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবে।

১২. প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিও অপর নির্ভরযোগ্য কাউকে খলীফা বা প্রতিনিধি করার অধিকার রাখে। যেমন এখানে আবু বকর রা. উমার রা. কে প্রতিনিধি বানাতে চেয়েছেন।

১৩. যে সকল ইবাদত সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, তার মধ্যে নামাজ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত।

১৪. সে সময় জীবিত নয়জন স্ত্রীদের ভেতর আয়েশা রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল।

১৫. আদব, সম্মান, মর্যাদা ও স্থান কাল বিবেচনায় রেখে খলীফাদের পরামর্শ দেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

১৬. কোনো কারণ বশত মুক্তাদিদের ইমামের পাশে দাড়ানোর বৈধতা প্রমাণিত হয়। যেমন তাকবীর পৌঁছানোর জন্য, জায়গার সংকীর্ণতার দরুন, নারীদের জন্য নারী ইমাম হলে, মুক্তাদী একজন হলে এবং বস্ত্রহীন লোকদের ইমাম হলে ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

১৭. ইমামের তাকবীর শোনা না গেলে মুক্তাদিদের উচ্চ স্বরে তাকবীর বলার বৈধতা।

১৮. পূর্ণ অক্ষম না হলে জামাতে অবশ্যই উপস্থিত হওয়া।

১৯. সাধারণ জ্ঞানী ও উত্তম ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও পরহেজগার ব্যক্তিই ইমামতির অধিক হকদার।

২০. ইমাম হলেন অনুসরণীয় ব্যক্তি। সে যখন বসে নামাজ পড়বে, মুক্তাদিগণও বসে নামাজ পড়বে। সে যখন দাড়িয়ে নামাজ পড়বে, মুক্তাদিগণও দাড়িয়ে নামাজ পড়বে।

২১. নামাজে কাঁদাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা নিষেধ।

পঁচিশতম পরিচ্ছেদ

তার শ্রেষ্ঠ ভাষণসমূহ ও মানুষের জন্য উপদেশ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রদান করেন। এতে তিনি আবু বকর সিদ্দীকের শ্রেষ্টত্বের কথা বর্ণনা করেন। যদিও তিনি এর আগেই সকল সাহাবীকে তার আনুগত্য করার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মুমুর্ষ অবস্থায় যা লিখতে চেয়ে ছিলেন, এখানে সম্ভবত তাই বর্ণনা করে দিয়েছেন। এ ভাষণের পূর্বে তিনি গোসল করেছেন। তার গাঁয়ে পরিস্কার সাত কলস পানি ঢালা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসের ভাষ্যমতে সাত সংখ্যাটি তিনি বরকতের জন্য গ্রহণ করেছেন। মূল কথা হল, তিনি গোসল করেছেন, ঘর থেকে বের হয়ে নামাজ পড়েছেন, অতঃপর ভাষণ দিয়েছেন। জুনদাব রা. বলেন, মুত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘আমি ঘোষণা করছি, তোমাদের কেউ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের ন্যায় আমাকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমার উম্মতের কাউকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানালে অবশ্যই আবু বকরকে বানাতাম। খুব ভালকরে শুনে নাও, তোমাদের পূর্বের লোকেরা নবীগণের কবর এবং নেককার লোকদের কবরগুলোকে মসজিদ বানাত। সাবধান!

তোমরা কিন্তু কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করবে না। আমি এর থেকে তোমাদের নিষেধ করছি।’[১]

আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবায় বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা তার এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য এবং নিজের কাছে রক্ষিত নেআমতসমূহ হতে কোনো একটি নির্বাচন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে বান্দা আল্লাহর কাছে রক্ষিত নেআমতকেই প্রধান্য দিয়েছেন।’ এ কথা শুনে আবু বকর রা. কেঁদে ফেললেন। এবং বললেন, ‘আপনার প্রতি আমাদের মাতা, পিতা সকলেই উৎসর্গ।’ আমরা তার কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হলাম। লোকজন বলাবলি করল, ‘এ বৃদ্ধের কীর্তি দেখ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নেআমতসমূহের ভেতর একটি বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর সে আল্লাহর কাছে রক্ষিত নেআমতকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এ কথা শুনে আবু বকর তার মাতা পিতাকে উৎসর্গ করছে।’ পরে জানলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন সে বান্দা। আবু বকর ছিলেন, আমাদের ভেতর সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আবু বকর তুমি কেঁদো না। সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে সবচেয়ে বেশি উপকার করছে আমাকে আবু বকর। আমার উম্মত হতে আমি যদি কাউকে খলিল রূপে গ্রহণ করতাম তবে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে, এখন তার সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতা অটুট থাকবে। মসজিদের ভেতর কারো দরজা খুলে রাখা যাবে না, শুধু আবু বকরের দরজা ব্যতীত।’[২]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. মসজিদে নববীতে শুধু আবু বকরের দরজা বহাল রাখার অনুমিত, সে সব ইঙ্গিতের একটি, যার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, আবু

[১] সহীহ মুসলিম : ৫৩২

[২] সহীহ আল-বুখারী ৪৬৬, ৩৬৫৪, ৩৯০৪, সহীহ মুসলিম ২৩৮২

বকরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তী খলীফা বা প্রতিনিধি।

২. আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব। সে সকলের চাইতে অধিক জ্ঞানী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। এ বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়।

৩. আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া। এবং এ অনুভূতি জাগ্রত করা যে, দুনিয়াতে এক মুহূর্ত থাকার উদ্দেশ্য হল, আখেরাতের জন্য কাজ করা। অর্থাৎ দুনিয়াতে বেশি বেশি নেককাজ করা।

৪. উপকারীর উপকার স্বীকার করা। যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করতে পারে না।

৫. কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত না করার ব্যাপারে সাবধানতা। কোনো কবরকে মসজিদের ভিতর না ঢুকানো কিংবা কোনো ছবি মসজিদের ভেতর না রাখা। যে এ সব করে, সে অভিশপ্ত। সে আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্টতর; সে যে কেউ হোক।

৬. সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের জান, মাল এবং মাতা-পিতা ও সন্তানাদি হতে বেশি মহব্বত করতেন।

ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুস্থতার বৃদ্ধি, বিদায় গ্রহণ ও উপদেশ প্রদান

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতা বোধ করলে সুরায়ে নাস, ফালাক এবং ইখলাস পড়ে পড়ে নিজের উপর

দম করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যু কালীন অসুস্থতা যখন বেড়ে গেল, তখন আমি উক্ত সুরাগুলো পড়ে দম করতাম। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি তার উপর দম করতাম এবং বরকতের জন্য তারই হাত দিয়ে মালিশ করতাম। ইবনে শিহাব জুহরী রহ. বলেন, 'আয়েশা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে দম করতেন, অতঃপর তারই হাত দিয়ে চেহারা মালিশ করতেন।'[১]

সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সুরায়ে নাস, ফালাক এবং ইখলাস পড়ে দম করতেন। যখন তিনি নিজেই শেষবারে মত অসুস্থ হলেন, তখন আমি নিজে এ সুরাগুলো পড়ে তার উপর দম করি, আর তারই হাত দিয়ে তাকে মালিশ করি। কারণ, তার হাত আমার হাতের চেয়ে বেশি বরকতপূর্ণ।[২]

আয়েশা রা বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল স্ত্রীগণ তার নিকট জড়ো হয়ে বসে ছিল। এমন সময় ফাতেমা হাঁটে হাঁটে তার কাছে আসে। তার হাঁটার ধরণ ছিল, রাসূলের হাঁটার ন্যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'স্বাগতম! আসো আমার মেয়ে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডানে অথবা বায়ে বসালেন। অতঃপর তার সাথে কানে কানে কিছু কথা বললেন, যা শুনে ফাতেমা কাঁদলেন। দ্বিতীয়বার তার সাথে কানে কানে কথা বললেন, এবার ফাতেমা হাসলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেঁদেছো কেন? সে বলল, আমি রাসূলের গোপনে বলা কথা কাউকে বলতে চাই না। আমি বললাম, 'কাঁদার সাথে সাথে এতো দ্রুত হাসতে আজকের মত তোমাকে আর কখনো দেখেনি।' আমি তাকে বললাম, 'আরে

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫৭৩৫, ৫৭৫১, সহীহ সহীহ মুসলিম ২১৯২, এ আমলটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের সময়ও করতেন। তিনি ঘুমের সময় সুরায়ে নাস, ফালাক এবং ইখলাস পড়ে হাতের উপর দম করে চেহারা এবং হাত পৌঁছে এমন সকল স্থান মেসেজ করতেন। সহীহ আল - বুখারী ৫৭৪৮

[২] সহীহ মুসলিম ২১৯২

আমাদের রেখে শুধু তোমার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন কথা বললেন, তারপরও তুমি কাঁদো?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন?' সে বলল, 'আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা গোপনে বলেছেন তা ফাঁস করতে পারি না।' যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, তখন আমি তাকে বলি, 'তোমাকে আমার আত্মীয়তার কথা স্বরণ করিয়ে বলছি, তুমি বল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছিলেন?' ফাতেমা বলল, 'এখন বলতে পারি। প্রথমবার তিনি আমাকে বললেন, 'জিবরীল প্রতি বছর একবার করে আমার সাথে কুরআনের অনুশীলন করে, এ বছর দু'বার করেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি তাকওয়ার অবলম্বন কর এবং ধৈর্যধারণ কর। আমি তোমার জন্য খুব ভাল এক পূর্বসূরী।' আপনি যে আমাকে কাঁদতে দেখেছেন, তার কারণ ছিল এটা। তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার বললেন, 'ফাতেমা! তুমি মুমিনদের সকল নারীদের নেত্রী অথবা বলেছেন, তুমি এ উম্মতের সকল নারীদের শ্রেষ্ঠতম। এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নয়?' আপনি যে আমাকে হাসতে দেখেছেন, তার কারণ ছিল এটা।'[১] আরেকটি বর্ণনায় আছে, 'তিনি আমাকে বলেছেন, আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।'[২]

ফাতেমার হাসার কারণ ছিল, তিনি সকল মু'মিন নারীদের নেত্রী এবং তিনিই সর্ব প্রথম রাসূলের পরিবারের মধ্য থেকে তার সাথে মিলিত হবেন। কান্নার কারণ ছিল, তিনি নিজের মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন এ জন্য। ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'ইমাম নাসায়ী রহ. ফাতেমার কান্নার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।'[৩] একটি হল, সুসংবাদ; যে তিনি এ উম্মতের নারীদের নেত্রী। অপরটি হল, তিনি রাসূলের সাথে সবার আগে

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৩৩, ৪৪৩৪ সহীহ মুসলিম ২৪৫০
[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৩৩, ৪৪৩৪ সহীহ মুসলিম ২৪৫০
[৩] ফাতহুল বারি : ৮/১৩৮

মিলিত হবেন। সকল ঐতিহাসিকগণ এক মত যে, ফাতেমা রা. রাসূলের ওফাতের পর রাসূলের পরিবারের মধ্যে সকলের আগে ইন্তেকাল করেন। এমনকি রাসূলের স্ত্রীদেরও আগে।[১]

আয়েশা রা. বলেন, 'কাউকে আমি রাসূলের চেয়ে বেশি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখিনি।'[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি খুব জ্বরাক্রান্ত হয়ে আছেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর জ্বরের প্রকোপ খুব বেশি। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের উপর যে পরিমাণ জ্বর আসে, একা আমার উপর সে পরিমাণ জ্বর এসেছে। আমি বললাম, 'এর কারণ হল, আপনাকে দ্বিগুন সওয়াব দেয়া হয়।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি ঠিক-ই বলেছ। যে কোনো মুসলমানের গাঁয়ে কাঁটা কিংবা তার চেয়ে ছোট কোনো জিনিস বিদ্ধ হলেও আল্লাহ এর বিনিময়ে গুনাহ ঝরিয়ে দেন, যেমন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে ফেলে।'[৩]

আয়েশা রা. এবং ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তারা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যখন জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি একটি নকশি চাদর চেহারার উপর টেনে তুলছিলেন, আর রেখে দিচ্ছিলেন। যখন জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেত, মুখ হতে কাপড় সরিয়ে নিতেন। এমন অবস্থায় তিনি বললেন, 'ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।' তিনি তাদের কর্ম হতে আমাদের সতর্ক করছিলেন।[৪]

[১] ফাতহুল বারি : ৮/১৩৬
[২] সহীহ আল - বুখারী ৫৬৪৬, সহীহ মুসলিম ২৫৭০
[৩] ফাতহুল বারি : ১০/১১১, সহীহ আল - বুখারী ৫৬৪৭, ৫৬৪৮, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭ সহীহ মুসলিম : ২৫৭১
[৪] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৪৩, ৪৪৪৪ সহীহ মুসলিম : ৫৩১

আয়েশা রা. বলেন, আমরা রাসূলের অসুস্থ অবস্থায় আলোচনা করতে ছিলাম। এমন সময় উম্মে সালামা এবং উম্মে হাবীবা হাবশার (ইথিওপিয়ার) গীর্জা এবং তাতে দেখা ছবির স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করতে ছিলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাদের অভ্যাস হল, তাদের মধ্যে কোনো ভাল লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে তার ছবি অংকন করে রাখত। তারা আল্লাহর কাছে কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে পরিগনিত হবে।'[1]

আয়েশা রা. হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সর্বশেষ অসুস্থতায় বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর অভিশম্পাত করুন, তারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।' আয়েশা রা. বলেন, যদি সে আশংকা না থাকত, তবে রাসূলের কবরও উচু করা হতো। আমার আশংকা হচ্ছে একে মসজিদে রূপান্তরিত করা হবে।'[2]

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না, আবার আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিয়ো না। তোমরা আমার উপর দরুদ পড়। তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের দরুদ আমার পর্যন্ত পৌঁছে যায়।'[3]

আনাস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার প্রকোপে বেহুশ হয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে ফাতেমা রা. বলেন, 'হায় বিপদ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তোমার পিতার উপর আজকের পর আর কোনো বিপদ নেই।' ইন্তেকাল হয়ে গেলে, ফাতেমা রা. বলেন, 'হে আমার প্রাণের পিতা! আপনি আল্লাহর ডাকে সারা দিয়েছেন। হে আমার প্রাণের পিতা! আপনার ঠিকানা জান্নাতুল ফেরদাউস। হে আমার প্রাণের পিতা! আপনার বিয়োগ

[1] সহীহ আল - বুখারী ৪২৭, ৪৩৪, ১৩৪১, ৩৮৭৮ সহীহ মুসলিম : ৫২৮

[2] সহীহ আল - বুখারী ৪৩৫, ১৩৩০, ১৩৯০, ৩৪৫৩, ৪৪৪১, ৫৮১৫, সহীহ মুসলিম ৫২৯

[3] আবু দাউদ : ২/২১৮ হাদীস নং : ২০৪২ আহমদ : ২/৩৬৭ সহীহ আবু দাউদ : ১/৩৮৩

ব্যথা জিবরীলের নিকট প্রকাশ করছি। যখন দাফনকর্ম শেষ হল, ফাতেম রা. বললেন, 'হে আনাস! রাসূলের উপর কিভাবে তোমরা মাটি রাখলে! তোমাদের মন কিভাবে সায় দিল?'[1]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. কুরআন এবং হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন সুরা ও দুআ-জিকির দিয়ে ঝাড় ফুক করা মুস্তাহাব। বিশেষ করে সুরা নাস, সূরাফালাক এবং সুরা ইখলাসের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া।[2]

২. ফাতেমার প্রতি রাসুলের বিশেষ দৃষ্টি ও আন্তরিক মহব্বত। যেমন, তিনি স্বাগতম বলে ফাতেমাকে কাছে নিয়েছেন। আরো বর্ণিত আছে, ফাতেমা যখন রাসুলের কাছে যেতেন, তখন তাকে তিনি কাছে বসাতেন, চুমু খেতেন, দাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন। তদ্রুপ ফাতেমাও রাসুলের সাথে করতেন, যখন তিনি তার বাড়িতে যেতেন।[3]

৩. এ ঘটনা থেকে জানা যায়, মেয়েদের সাথে সদাচারণ করা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং আচার ব্যবহারের তালিম দেয়া জরুরী বিষয়, রাসুলের সুন্নত। এবং তারা যখন বড় হয়ে যাবে, তখন তাদের জন্য সৎ পাত্রের ব্যবস্থা করা।

৪. বাচ্চাদের উচিত পিতা, মাতার প্রতি যত্নশীল হওয়া। তাদের অবাধ্যতা কিংবা নাফরমানী না করা। করলে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।

৫. রাসুলের সত্যতার প্রমাণ যে, তিনি সংবাদ দিয়েছেন, ফাতেমা সবার আগে তার সাথে মিলিত হবে। বাস্তবে তা-ই হয়েছে।

[1] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৬২

[2] নববীর ব্যখ্যা গ্রন্থ : ১৪/৪৩৩, উব্বীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ : ৭/৩৭৫

[3] ফাত্হুল বারি : ৮/১৩৫, ১৩৬

৬. পরপারে যাওয়ার কথা শুনে ঈমানদারদের খুশী হওয়া। এর অর্থ এ নয় যে, কোনো বিপদ-মুসিবতের কারণে মৃত্যু কামনা করা। বরং নেক আমেলের সুযোগ মনে করে দুনিয়ার জীবনকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা। হাদীসে এসেছে মানুষ মারা গেলে তার সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি জিনিস ব্যতীত। তাই জীবনকে সুযোগ মনে করে কাজ করতে থাকা মু'মিনের কর্তব্য।

৭. মৃত্যু ঘনিয়ে এলে মুমূর্ষ ব্যক্তির উচিত পরিবারের লোকজনকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া। যেমন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে দিয়েছেন।

৮. ফাতেমা রা. এর ফজিলত, তিনি সকল মুমিন নারীদের নেত্রী।

৯. অসুস্থ ব্যক্তিরা যদি স্বীয় অসুস্থতাকে সওয়াব মনে করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে সওয়াব দিবেন, গুনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থানের যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি মুসীবতের সম্মুখীন হন নবী ও রাসূলগণ। এরপর যারা তাদের সাথে নীতি, আদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে তারা। যেহেতু তারা ধৈর্য ও আল্লাহ নির্ভরতায় সবার উর্ধ্বে। তারা আরো জানেন এগুলো আল্লাহর নেআমত ও প্রতিদান বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। এর মধ্য দিয়ে তাদের ধৈর্য ও সন্তুষ্টির পরীক্ষা নেয়া হবে। কম মর্যাদার হওয়া সত্বেও নবী ও রাসূলদের অনুসরণ, আনুগত্য এবং ঘনিষ্টতার কারণে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এতে সম্ভাব্য রহস্য হয়তো এটা যে, বিপদ-মুসিবত নেআমতের বিপরীতে প্রদান করা হয়। সুতরাং যার উপর আল্লাহর নেআমত বেশি হবে, তার উপর বিপদ-মুসিবতও বেশি হবে, সন্দেহ নেই। এ জন্যই পরাধীন ব্যক্তির উপর স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের ভেতর যে স্পষ্ট অশ্লীলতায়

লিপ্ত হবে, তাকে দ্বিগুন শাস্তি দেয়া হবে।"[1] শক্তিশালী ব্যক্তির উপর বড় বোঝাটাই রাখা হয়। দুর্বলের সাথে সহানুভূতি দেখানো হয়। তবে এটা ঠিক যে, যার ঈমান দৃঢ়, তার জন্য মুসিবত সহনীয়। কারণ, তার ধারণা মুসিবতের বিনিময়ে সওয়াব অর্জিত হবে, বিধায় তার জন্য মুসিবত সহনীয় হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করে, এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তাই তার তাকদীরের উপর বিশ্বাস রেখে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়। কোনও আপত্তি জানায় না।

১০. কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা কিংবা মসজিদের ভিতর কবর প্রবেশ করানো হতে বিরত থাকা। যে এ রকম কাজ করবে, সে অভিশপ্ত। কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সে সর্ব নিকৃষ্ট জীব হিসেবে পরিগণিত হবে। এটা রাসুলের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের একটি। মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে তিনি এ কথা বলে গেছেন।

সাতাশতম পরিচ্ছেদ

ওফাতপূর্ব অসীয়ত

ইবেন আব্বাস রা. বলেন, বৃহস্পতিবার দিন রসুলের অসুখ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে তিনি বলেন, 'আমার কাছে কিছু একটা নিয়ে আসো, আমি তোমাদের জন্য একটি উপদেশনামা লিখে দেই। যার পরে তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।' সাহাবারা এ নিয়ে পরস্পর দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত হয়ে গেল। অথচ রাসুলের সামনে এমন করা উচিত ছিল না। কেউ বলল, 'এখন রসুলের উপর রোগের প্রকোপ খুব বেশি, তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব রয়েছে, আমাদের জন্য এ কিতাবই যথেষ্ট।' ঘরে উপবিষ্ট লোকজন মতদ্বৈততায় লিপ্ত হয়ে গেল। কেউ বলল, 'কিছু একটা সামনে দাও, তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিক, তাহলে

[1] সূরা আল-আহযাব : ৩০

তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।' অন্যেরা অন্য কিছু বলতে ছিল। যখন হৈ চৈ আর দ্বিরুক্তি কথাবার্তা বৃদ্ধি পেল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা আমার এখান থেকে দূরে সরে যাও।' আরেকটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, 'আমি যে অবস্থায় আছি, সেভাবে থাকতে দাও, তোমাদের কথা শুনার চেয়ে এটাই আমার জন্য উত্তম। আমি তোমাদেরকে তিনটি উপদেশ দিচ্ছি, জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বের করে দেবে। আগত মুসাফিরের দল, পথিক ও মেহমানদের মেহমানদারী এবং আমার নীতি অনুসারে তাদের সাহায্য, সহযোগিতা প্রদান করবে। তৃতীয়টি ভুলে গেছেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'[১] ইবনে হাজার রহ. বলেন, সেই কঠিন মুহূর্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিনটি উপদেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝে আসে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা লিখতে চেয়েছেন, তা লেখা জরুরী ছিল না। কেননা যদি জরুরী হতো, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে বিরত থাকতেন না। অধিকন্তু যারা এর প্রতিবন্ধক হয়েছে, তাদের উপর শাস্তি নাযিল হত। পারতপক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখে হলেও বলে দিতেন। যেমন তিনি বলেছেন, মুশরিকদেরকে বের করে দিতে। তার পরেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক দিন জীবিত ছিলেন, তার থেকে অনেক হাদীস সাহাবায়ে কেরাম লিপিবদ্ধ করেছেন, হতে পারে তার মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরী সে বিষয়কেও বলে দেয়া হয়েছে, যা তিনি লিখতে চেয়ে ছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।[২]

তৃতীয় উপদেশের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে যে, সে উপদেশ হচ্ছে আল-কুরআন। অথবা উসামা বিন যায়েদের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার উপদেশ। অথবা নামাজ এবং অধীনস্থদের ব্যাপারে কিংবা তার কবরকে

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৩১, ৪৪৩২ সহীহ মুসলিম : ১৬৩৭

[২] ফাতহুল বারি : ৮/১৩৪

ঈদ-উৎসবের স্থান না বানানোর উপদেশ। এ সকল উপদেশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে।[১]

আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা রা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোনো অসীয়ত করে গেছেন? তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।' আল্লাহর কিতাবের অসীয়তের অর্থ হল, তার অর্থ ও শব্দ সংরক্ষণ করা। এর সম্মান করা, অসম্মান না করা এবং এর অনুসরণ করা। আদেশগুলো পালন করা। নিষেধ হতে বিরত থাকা। রীতিমত এর তেলাওয়াত করা, শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করা ইত্যাদি।[২]

পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন জায়গায় উপদেশ প্রদান করেছেন। আরাফা এবং মিনার খুতবাতে, মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় গাদিরে খুমের নিকট। তিনি বলেছেন, '...আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি : একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। এতে রয়েছে পথ নিদের্শনা, আলোকবর্তিকা। এটা আল্লাহর শক্ত রজ্জু। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে, সে সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে এটাকে ছেড়ে দেবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধর এবং এর দ্বারা অটল-অবিচলতার সাথে পরিচালিত হও।' তিনি কুরআন প্রসংগের পরে বলেন, 'এবং আমার পরিবারবর্গ, তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি...' তিনবার বলেছেন।[৩] মৃত্যুর সময় তিনি আল্লাহর কুরআনের উপদেশ দিয়েছেন।[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা বিন যায়েদের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার নিদের্শও দিয়েছেন। ইবনে হাজার রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে, শনিবার দিন

[১] ফাতহুল বারি : ৮/১৩৪

[২] আল ফাতহ : ৯/৬৭

[৩] সহীহ মুসলিম : ২৪০৮

[৪] সহীহ আল - বুখারী ২৭৪০, মসুলিম : ১৬৩৪, ২৪০৮

উসামা বিন যায়েদের সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল রাসুলের অসুস্থতারও আগে। সফর মাসের শেষে রোমের সাথে যুদ্ধের জন্য মুসলিম সৈনিকরা প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে ডেকে বলেন, 'তোমার পিতার শাহাদাতের ময়দানের পানে ধাবিত হও। সে দিকে ঘোড়া চালাও। আমি তোমাকে এ সেনাদলের দায়িত্ব প্রদান করলাম...' তৃতীয় দিন তার অসুখের সূচনা হয়। তিনি নিজ হাতে উসামা বিন যায়েদের পতাকা তৈরী করে দিলেন, উসামা তার হাত থেকে পতাকা তুলে নেন। উসামার সাথে মুহাজির, আনসারদের বড় বড় সাহাবী সঙ্গী হলেন। অতঃপর রাসুলের রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন, 'উসামার সৈন্যদল পাঠিয়ে দাও।' আবু বকর রা. খলীফা হয়ে উসামার সৈন্যদল প্রেরণ করেন। বিশ দিন পর্যন্ত সফর করলেন, তার পিতার যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছানোর জন্য। তিনি খুব পারঙ্গমতার সহিত যুদ্ধ করলেন। অবশেষে অনেক গণীমত নিয়ে বিজয় বেশে ফিরে আসেন।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছেন, যার দায়িত্ব দিয়েছেন উসামা বিন যায়েদকে। এতে কেউ কেউ তার নেতৃত্বে আপত্তি জানাতে ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এখন তোমরা তার নেতৃত্বে আপত্তি জানাচ্ছ, এক সময় তার পিতার নেতৃত্বেও তোমরা আপত্তি জানিয়েছিলে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে-ই নেতৃত্বের উপযুক্ত। তার পিতা যেমন আমার কাছে সবার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল, সেও আমার নিকট সবার চেয়ে বেশি প্রিয়।'[২] রাসুলের ইন্তেকালের সময় উসামার বয়স ছিল আঠারো বছর।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ এবং অধীনস্থদের ব্যাপারেও উপদেশ বাণী প্রদান করেছেন। আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি

[১] ফাতহুল বারি : ৮/১৫২, সিরাতে ইবনে হিশাম : ৪/৩২৮
[২] সহীহ আল - বুখারী ৩৭৩০, ৪২৫০, ৪৪৬৮, ৪৪৬৯, ৬৬২৭, ৭১৮৭ সহীহ মুসলিম : ২৪২৬
[৩] শরহে নববি : সহীহ মুসলিম : ১৫/২০৫

বলেন, 'মৃত্যুকালীন সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ উপদেশ-ই ছিল এরকম যে, 'নামাজ! নামাজ! আর তোমাদের যারা অধীনস্থ! বলতে বলতে তার বুকের ঢেকুর আরম্ভ হয়ে যেত। তবুও মুখে উচ্চারণ করতেই থাকতেন।[১]

আলী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ বাণী ছিল : 'নামাজ! নামাজ! আর তোমাদের অধীনস্থ যারা![২]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদের বের করা অবশ্য কর্তব্য। মৃত্যুকালীন সময়ে এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। যা উমার রা. স্বীয় খেলাফতের শুরুতেই বাস্তবায়ন করেন। মুরতাদদের সাথে বোঝা-পড়া আর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে করতেই আবু বকর রা. এর খেলাফত যুগ শেষ হয়ে যায়। তাই তার পক্ষে এ হুকুম পালন করা সম্ভব হয়নি।

২. আগত মেহমান ও পথিকদের মেহমানদারী, সম্মান এবং উপযুক্ত হাদিয়া ইত্যাদি প্রদান করা। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং করতেন। আর এটা তার নির্দেশও বটে।

৩. কুরআনের শব্দ ও অর্থের প্রতি যত্নশীল হওয়া, একে সম্মান করা, হেফাজত করা, এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অনুসরণ করা, এর আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথ পালন করা এবং রীতিমত এর তেলাওয়াত করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন জায়গায় এর জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

[১] আহমদ : ৩/১১৭ সহীহ, ইবনে মাজাহ : ২/৯০০, সহীহ ইবনে মাজাহ : ২/১০৯
[২] ইবনে মাজাহ : ২/৯০১, হাদীস নং ১৬২৫ আহমদ : ৫৮৫, ইবনে মাজাহ : ২/১০৯

৪. নামাজের গুরুত্ব; কারণ কালিমায়ে শাহাদাতের পরই এর স্থান। মুমুর্ষ মুহূর্তেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য অসীয়ত করেছেন।

৫. অধীনস্থ কর্মী ও দাস-দাসীদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকা। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যু মুহূর্তেও এর জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

৬. উসামা বিন যায়েদের ফজিলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেনা প্রধান বানিয়েছেন। যখন অনেক শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। অধিকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ হুকুম বাস্তবায়ন করার নিদের্শও প্রদান করেছেন।

৭. আবু বকর রা এর ফজিলত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেশ পালন করেছেন, উসামা বিন যায়েদের সৈন্য বাহিনীর লক্ষ্য পরিবর্তন করেননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের উচিত ফেতনা অথবা মর্মন্তুদ শাস্তির আক্রমন হতে সতর্ক থাকে।"

আঠাশতম পরিচ্ছেদ

মহান বন্ধুর সান্নিধ্য প্রত্যাশা

আয়েশা রা. বলেন, আমি শুনতাম, কোনো নবীকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া এবং আখেরাতের মাঝে কোনটা বেছে নিবে এটার স্বাধীনতা

দেয়ার আগ পর্যন্ত মৃত্যু দেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যখন রোগের তীব্রতা বেড়ে গেল, তখন তিনি বলতে ছিলেন,

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

"যে সকল নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গ, তারাই উত্তম বন্ধু।" আয়েশা রা. বলেন, তখনই আমার ধারণা হল, তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতের একটি বেছে নেয়ার নির্দেশ এসে গেছে।[১]

একটি বর্ণনায় আছে, আয়েশা রা. বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ অবস্থায় বলতেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের ঠিকানা দর্শন করিয়ে, দুনিয়া এবং আখেরাতের মাঝে একটি বেছে নেয়ার নির্দেশ না দেয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নবীর জান কবজ করা হয় না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলেন, তার মাথা আমার রানের উপর, কিছুক্ষণ বেহুশ হয়ে থেকে পুনরায় হুশ ফিরে পেলেন। ছাদের দিকে তার মাথা তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ! সবচেয়ে মহান বন্ধুর সান্নিধ্য কাম্য।' আমি ধারণা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আমাদের দিকে আর খেয়াল দিবেন না। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা হল তার সুস্থ অবস্থার বাণীর প্রতিফলন। তিনি সর্বশেষে বলেন, 'আল্লাহ ! সবেচেয় মহান বন্ধুর সান্নিধ্য কাম্য।' আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার গায়ে হেলান দেয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি,

اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى.

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৩৬, ৪৪৩৭, ৪৪৬৩, ৪৫৮৬,৬৩৪৮, ৬৫০৯ সহীহ মুসলিম ২৪৪৪

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো! আমার উপর রহম করো! উত্তম বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করো ।'[১]

তিনি আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য, তার নিকট রক্ষিত নেআমত এবং তার পছন্দের বস্তুগুলো খুব পছন্দ করতেন । যেমন একটি মেসওয়াক, এটি যেমন মুখ পরিস্কার রাখে তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টিরও কারণ । আয়েশা রা. বলেন, আমার উপর আল্লাহর বড় একটি নেআমত হচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে, আমার বাড়িতে এবং আমার গলা ও বক্ষের মাঝে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন । মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা তার মুখের লালা আর আমার মুখের লালা একত্র করেছেন । ঘটনাটির বিবরণঃ আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. হাতে মেসওয়াক নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে । তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে হেলান দিয়ে রেখেছি । আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি বার বার আব্দুর রহমানের হাতে রাখা মেসওয়াকের দিকে তাকাচ্ছেন । আমি বুঝলাম, তিনি মেসওয়াকটি পছন্দ করছেন । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার জন্য মেসওয়াকটি চাবো?' তিনি মাথার ইশারায় বললেন, 'হ্যাঁ ।' আমি মেসওয়াকটি নিয়ে তাকে দিলাম । মেসওয়াক করা তার জন্য দুস্কর হয়ে গেল । আমি বললাম, 'নরম করে দেই?' 'তিনি মাথার ইশারায় অনুমতি দিলেন । আমি নরম করে দিলাম, তিনি এর দ্বারা খুব সুন্দর করে মেসওয়াক করলেন । যেভাবে কখনো করতে দেখিনি । তার হাতে একটি ছোট পাত্রে পানি রাখা ছিল, তিনি হাত দিয়ে পানি তুলে মুখমণ্ডল মাছেহ করতে ছিলেন আর বলতে ছিলেন,

لا إله إلا الله إن للموت سكرات.

'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর কষ্ট আছে ।'

অতঃপর হাত খাড়া করে বললেন,

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৪০, ৫৬৬৪

اللهم في الرفيق الأعلى.

'হে আল্লাহ! সবচেয়ে মহান বন্ধুর সান্নিধ্য কাম্য ।'

এরপরই তার ইন্তেকাল হল, হাত দু'টি মাটিতে পরে গেল ।[১]

আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গলা ও বুকের মাঝে ইন্তেকাল করেছেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর আমি আর কারো মৃত্যু কষ্টকে অপছন্দ করি না ।

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. সর্বোত্তম বন্ধু হলেন তারা, আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿النساء:٦٩﴾

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর নেআমত প্রাপ্ত নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার লোকদের সাথে থাকবে । তারাই উত্তম বন্ধু ।"[২] উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যারা সর্বোচ্চ স্থানে বসবাস করেন, সে সকল নবী ও রাসূলগণই হচ্ছেন সর্বোত্তম বন্ধু ।[৩]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার মহব্বত এবং উত্তম বন্ধুদের মহব্বতে আখেরাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত প্রত্যাশা করে, আল্লাহর তার সাক্ষাত প্রত্যাশা করেন ।'[৪]

[১] সহীহ আল - বুখারী ৮৯০, সহীহ মুসলিম : ২৪৪৪
[২] সুরা আন-নিসা : ৬৯
[৩] ফাতহুল বারি : ৮/১৩৮ ইমাম নববীর ব্যাখা গ্রন্থ : ১৫/২১৯
[৪] সহীহ আল - বুখারী ৬৫০৭, সহীহ মুসলিম : ২৬৮৩

৩. আয়েশা রা. এর ফজিলত, তার থেকে আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। তিনি মৃত্যু মুহূর্তেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গলা এবং বুকের মাঝে রেখে সেবা প্রদান করেছেন। তিনি এটা আল্লাহর নেআমত মনে করতেন এবং খুব গর্ব করে এর আলোচনা করেতন।

৪. মেসওয়াকের ব্যাপারে রাসূলের গুরুত্বারোপ: মুমূর্ষ অবস্থায়ও তিনি মেসওয়াক করেছেন। কারণ, মেসওয়াক যেমন মুখ পরিস্কার করে, তেমন এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জিত হয়।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু যন্ত্রণাতেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যুর ভীষণ কষ্ট।' উচ্চারণ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান যে, মৃত্যুমুখে পতিত হলে বেশি বেশি এ কালেমাটি পড়া মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার শেষ বাক্য হবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যান্য নবীদের সঙ্গ গ্রহণের অধির আগ্রহ পোষণ করতেন এবং এর জন্য তিনি দুআ করেছেন। যার দ্বারা বুঝে আসে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত জান্নাতে নবীদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য দুআ করা এবং এর জন্য আগ্রহ রাখা। আল্লাহ! তোমার রহমতে আমাদের সকলকে তাদের সাথে মিলিত করো।

৭. মৃত্যু কষ্ট ও তার অসহ্য যন্ত্রনা। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অগ্র পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছিল। তা সত্বেও তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ ভোগ করেছেন। এ দিকটি বিবেচনায় আমাদের অবস্থা একটু ভেবে দেখা দরকার।

ঊনত্রিশতম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শহীদি ইন্তেকাল

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষবারের মত অসুস্থ হয়ে বলেন, 'আয়েশা! খায়বারে যে বিষ মাখা গোশ্‌ত ভক্ষণ করে ছিলাম, তার কষ্ট এখনো আমি অনুভব করছি। সে বিষ ক্রিয়ায় মনে হচ্ছে আমার রগ টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারে বিষ মাখা বকরীর গোশ্‌ত খেয়ে তিন বছর বেঁচে ছিলেন। ইন্তেকালের সময়ও সে বিষক্রিয়া বিদ্যমান ছিল।[২] বর্ণিত আছে : যে মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর বিষাক্ত গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে দিয়েছিল, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কে আপনাকে বলেছে, এতে বিষ আছে?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ বকরীই বলেছে।' অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু এ বিষক্রিয়ায় বাশার ইবনে বারা মৃত্যু বরণ করল। ফলে তাকে হত্যার করার অপরাধে মহিলাটিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, কেসাসের বিধান অনুসারে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলের মৃত্যুর কারণ ছিল বিষক্রিয়া। আবু সালামা বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীয়া বা উপহার গ্রহণ করতেন, সদকা খেতেন না। খায়বারে এক ইহুদী মহিলা বিষ প্রয়োগ করে একটি ভুনা বকরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীয়া হিসাবে পেশ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলেন, সাথে অন্যরাও খেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা হাত উঠিয়ে নাও। আমাকে এ বকরীই বলছে যে, এর গোশ্‌ত বিষাক্ত।' কিন্তু সে খানা খেয়ে রাসূলের সাহাবী বাশার বিন আল-বারা আনসারী মারা যান।

---

[১] সহীহ আল - বুখারী ৪৪২৮

[২] ফাহুল বারী : ৮/১৩১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী মহিলার নিকট খবর দিয়ে পাঠালেন. তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'কি কারণে তুমি এ কু কর্ম করেছ?' সে বলল, যদি আপনি নবী হন, তবে এর দ্বারা আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আর যদি বাদশাহ হতে চান, তাহলে মানুষকে আপনার প্রতারণা হতে মুক্ত করলাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে নিদের্শ জারি করেন। তাকে হত্যা করা হয় বাশার আনসারীকে হত্যার শাস্তি হিসাবে। তাই মৃত্যুর সময় বলেছেন, 'আমি এখনও খায়বরে ভক্ষণকৃত গোশ্‌তের বিষক্রিয়া অনুভব করছি। যার কারণে আমার রগ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।' বাশারের মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার শেষ অসুস্থ অবস্থায় বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কোন জিনিসকে দায়ী করেন? আমার ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি সে গোশ্‌তকেই দায়ী করি, যা আপনার সাথে খায়বরে খেয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমিও আমার মৃত্যুর ব্যাপারে সে গোশ্‌তকেই দায়ী করি। এ মুহূর্তে তো আমার রগ টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।'[১]

ইবনে কাসীর খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের সাথে মৃত্যু বরণ করেছেন।[২] তিনি উদ্ধৃত করেছেন, 'মুসলমানগণ মনে করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের মর্যাদার সাথে সাথে শহীদ হওয়ার মর্যাদা নিয়েও মৃত্যু বরণ করেছেন।'[৩] ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'নয় বার শপথ করে এ কথা বলা আমার নিকট অধিক শ্রেয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য হত্যার মতই হত্যা করা হয়েছে একবার শপথ করে এ কথা বলার চেয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়নি। কারণ, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যেমন তাকে

[১] আবু দাউদ : ৪৫১৩, সহীহ আবু দাউদ : ৩/৮৫৫
[২] আল-বেদায়া ও আল-নেহায়া : ৪/২১০, ২১১, ৪/২১০-২১২, ৫/২২৩-২৪৪
[৩] আল-বেদায়া ও আল-নেহায়া : ৪/২১১

নবুওয়তের মর্যাদা দিয়েছেন, তেমনি তাকে শাহাদাতের মর্যাদাও দিয়েছেন।'[১]

আনাস রা. বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ থাকাকালীন আবু বকর রা. তাদের নিয়ে নামাজ পড়তেন। সোমবার দিন ফজরের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ আয়েশা রা. র ঘরের পর্দা খুলে উঁকি দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. তখন জামাতে দাড়ানো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ানো ছিলেন, মনে হচ্ছিল তার চেহারা মুবারক কুরআনের একটি নির্মল পৃষ্ঠা। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা মুচকি হাসির ন্যায় হাসলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে তো সাহাবাদের নামাজ ছেড়ে দেয়ার অবস্থা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হচ্ছেন ভেবে আবু বকর রা. পিছনে সরে যেতে লাগলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ইশারা দিয়ে বলেন, তোমরা নামাজ পূর্ণ করো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার ঘরে প্রবেশ করেন এবং পর্দা টেনে দেন। সে দিনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

আরেকটি বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিন শেষে ইন্তেকাল করেন। আরেকটি বর্ণনায় আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত ঘর থেকে বের হননি। একদিন নামাজের একামত দেয়া হলে আবু বকর এগিয়ে গেলেন ইমামতি করার জন্য। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের পর্দা তুলে দাড়ালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চেহারা বের করে আমাদের দিকে তাকালেন, আমরা তার চেহারার প্রতি দৃষ্টি দিলাম; মনে হল রাসূলের এতো সুন্দর চেহারা আর কোনো দিন দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে সামনে বেড়ে নামাজ পড়ানোর নিদের্শ দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা

[১] আল- বেদায়া ও আল- নেহায়া : ৫/২২৭

টেনে ভিতরে চলে গেলেন। আর বের হতে পারেননি। সে বিছানাতেই ইন্তেকাল করেন।[১]

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। আল্লাহ তাকে নবুওয়ত এবং শাহাদাত দু'টিই দান করেছেন।

২. ইহুদীদের শত্রুতা ইসলামের শুরু যুগ থেকেই। তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের দুশমন।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না কখনো। বরং ক্ষমা করতেন, মাফ করে দিতেন। আলোচিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী মহিলাকে প্রথম মাফ করে দেন। পরবর্তীতে বাশারের হত্যার অপরাধে তাকে হত্যা করেন। যেহেতু সে তার দেয়া বিষযুক্ত খানা খেয়ে সে মৃত্যু বরণ করেছিলো।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জিযা। ভুনা বকরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছে, 'আমি বিষাক্ত।'

৫. বান্দার উপর আল্লাহর মেহেরবাণী। তিনি কোনো নবীকে তার দীন পূর্ণভাবে প্রচার করার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যু দেননি।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সাহাবাদের নিখাঁদ মহব্বত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার দিন সকাল বেলা যখন পর্দা উঠিয়ে তাদের দিকে তাকান, তখন তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যান। রাসূল

[১] সহীহ আল - বুখারী ৬০৮, ৬৮১, ৭৫৪, ১২০৫, ৪৪৪৮ সহীহ মুসলিম : ৪১৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের নামাজ এবং সারিবদ্ধ দৃশ্য দেখে আনন্দিত হন। পীড়া সত্বেও মুচকি হাসি দেন।

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

যে আল্লাহর ইবাদত করে সে জেনে রাখুক আল্লাহ জীবিত, মৃত্যবরণ করেন না

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ﴿الزمر: ٣٠﴾

"নিশচয় তুমি মৃত্যু বরণ করবে, তারাও মৃত্যু বরণ করবে।"[১]

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ ﴿الأنبياء: ٣٤﴾

"আমি তোমার আগেও কাউকে স্থায়ী নিবাস প্রদান করেনি। তুমি মারা গেলে তারা কি চিরঞ্জীব হতে পারবে?"[২]

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ ﴿آل عمران: ١٨٥﴾

"প্রতিটি আত্মা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। তবে তোমাদের যথাযথ প্রতিদান কেয়ামতের দিনই প্রদান করা হবে। যাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলতা অর্জন করবে। পার্থিব জীবন শুধু ধোকার সামগ্রী।"[৩]

[১] সুরা যুমার : ৩০
[২] সুরা আম্বিয়া : ৩৪
[৩] সূরা আলে ইমরান : ১৮৫

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿الرحمن:٢٧﴾

"দুনিয়ায় বিদ্যমান সব কিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র তোমার রবের চেহারাই বদ্যমূল থাকবে। তিনি অহংবোধ সম্পন্ন, সম্মানিত।"[১]

সকল নবী ও রাসূলদের মধ্যমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহধাম ত্যাগ করে গেলেন। আয়েশা রা. এর বর্ণনা, তিনি রাসূলের সর্বশেষ বাক্যের ব্যাপারে বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে পানি ভর্তি একটি ছোট পাত্র ছিল, তিনি তাতে হাত চুবিয়ে মুখ মণ্ডল মুছতে ছিলেন, আর বলতে ছিলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যুর রয়েছে ভীষণ কষ্ট।' অতঃপর হাত খাড়া করে বললেন, 'হে আল্লাহ! উত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যই কাম্য।' এরপর প্রাণ চলে গেলে, তার হাত ঢলে পড়ে যায়। তার সর্ব শেষ বাক্য ছিল[২]

اللهم في الرفيق الأعلى

'হে আল্লাহ! উত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যই কাম্য।'

আয়েশা রা. বলেন, 'যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তে কাল করেন, তখন আবু বকর রা. তার স্ত্রীর গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। খাজরাজ বংশীয় হারেস সন্তানদের বসতিতে। যা মদীনা হতে এক মাইল দূরে। উমার রা. দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাননি।' আয়েশা রা. বলেন, আমার অন্তরেও তাই বদ্ধমূল ছিল। আল্লাহ অবশ্যই তাকে পুনরায় জীবন দান করবেন। তিনি তার মৃত্যুর সংবাদ রটানো লোকদের হাত পা কর্তন করে দিবেন। এমন সময় আবু বকর রা. তার ঘোড়ায় চড়ে মসজিদের নববীতে প্রবেশ করলেন। কারো সাথে কোনো কথা না বলে সরাসরি আয়েশার ঘরে ঢুকলেন। রাসূলের কাছে চলে গেলেন, তার উপর একটি ইয়ামানী দামী চাদর রাখা ছিল। আবু বকর রা. চেহারা মুবারক হতে চাদর উঠালেন, চুমু খেলেন এবং কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'হে

[১] সূরা আর-রাহমান : ২৬-২৭

[২] সহীহ আল - বুখারী ৪৪৩৭, ৪৬৩ সহীহ মুসলিম : ২৪৪৪

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা, মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ। জীবিত, মৃত উভয় অবস্থায়ই আপনি প্রশংসিত ও সফল। আল্লাহর শপথ! আপনি আর দ্বিতীয়বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেন না। চিরন্তন নিয়মানুসারে একবার মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করে নিয়েছেন।' অতঃপর ঘর থেকে বের হলেন। তখনও উমার রা. তার সে কথাই বলে যাচ্ছিলেন। আবু বকর রা. বললেন, 'হে শপথ করে ভাষন দানকারী, বসে যাও!' উমার রা. বসলেন না। আবার বললেন, 'উমার বসে যাও!' তিনি বসলেন না। আবু বকর রা. সালাত ও সালামের পর লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য প্রদান করা শুরু করলে উমার রা. বসে পড়লেন। অন্যরাও উমারকে রেখে আবু বকরের কাছে জমায়েত হতে শুরু করল। আবু বকর রা. আল্লাহর প্রসংশা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাত পড়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মাদের ইবাদত করত, তাকে বলছি, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করত, তাকে বলছি, আল্লাহ চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿الزمر:٣٠﴾

"নিশ্চয় তুমি মৃত্যু বরণ করবে, তারাও মৃত্যু বরণ করবে"[১]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَّ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُّ الشَّاكِرِينَ ﴿آل عمران:١٤٤﴾

"মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল। তার পূর্বেও অনেক রাসূল অতীত হয়ে গেছে। যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে, সে

[১] সুরা যুমার : ৩০

আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ বান্দাদের অতি সত্বর প্রতিদান দিবেন।”[১]

আল্লাহর শপথ! আবু বকরের তেলাওয়াতের আগে মনে হচ্ছিল, মানুষ এ আয়াত সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তার মুখ হতে সবাই এ আয়াত গ্রহণ করল, সকলের মুখে মুখে এ আয়াতের গুঞ্জণ ছিল। সায়ীদ ইবেন মুসাইয়েব বলেন, ‘আবু বকরের মুখে এ আয়াত শুনে উমার রা. বললেন, আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার পা শরীরের বোঝা সইতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল মাটিতে পড়ে যাবো। আবু বকরের মুখে এ আয়াত শুনে আমার বিশ্বাস হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করেছেন। মানুষের মাঝে কান্নার রোল পড়ে গেল। এ দিকে আনসারী সাহাবায়ে কেরাম রা. সাকিফা বনী সায়েদাতে সাদ বিন উবাদাকে নিয়ে জড়ো হল। তারা বলল, ‘আমাদের আনসারদের পক্ষ হতে একজন আমীর হবে এবং তোমাদের মুহাজিরদের পক্ষ হতে একজন আমীর হবে।’ আবু বকর রা. উমার রা. এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা. একত্র হয়ে সেখানে গেলেন। উমার রা. আগে কথা বলতে চাইলে আবু বকর রা. তাকে থামিয়ে দেন। উমার রা. বলেন, আমি মনে মনে এমন কতগুলো সুন্দর সুন্দর কথা সাজিয়ে ছিলাম, আমার আশংকা ছিল, আবু বকর সে রকম কথা বলতে পারবে না। অতঃপর আবু বকর রা. কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তার বক্তব্যে মনে হচ্ছিল, তিনি আরবের সবচেয়ে সুসাহিত্যিক, সুবক্তা। আবু বকর বললেন, ‘আমাদের পক্ষ হতে আমীর হবে, আর তোমাদের পক্ষ থেকে উজীর হবে।’ হিব্বাব বিন মুনজির বললেন, ‘না, এটা হবে না। আমাদের মধ্যে থেকেও আমীর হবে, তোমাদের মধ্যে থেকেও আমীর হবে।’ আবু বকর রা. পুনরায় বললেন, ‘না, আমাদের মধ্য থেকে আমীর হবে, আর তোমাদের মধ্য থেকে উজীর হবে। কারণ, আরব বলতে মূলত কুরাইশগণ-ই, তাদের বংশই প্রাচীন আরব। তোমরা উমারের হাতে কিংবা আবু উবাইদার হাতে বায়আত গ্রহণ করো। উমার রা. বললেন,

[১] সুরা আলে ইমরান : ১৪৪

‘না, বরং আমরা আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করব। আপনি আমাদের নেতা, আপনি আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং আপনিই ছিলেন রাসূলের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়।’ এ বলে উমার রা. তার হাত ধরে বায়আত করলেন। অতঃপর সমস্ত মানুষ তার হাতে বায়আত করল। কেউ কেউ বলল, তোমরা সাদ বিন উবাদাকে হত্যা করলে। উমার রা. বললেন, ‘আল্লাহ-ই তাকে হত্যা করেছে।’[১]

আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর দিন আল্লাহ তাআলা উমর রা. এবং আবু বকর রা. এর খুতবার মাধ্যমে বিশাল অনুগ্রহ করেছেন। উমার রা. মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যার ফলে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। তারা ভয় পেয়ে যায়। এর পর আবু বকর রা. এর খুতবার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সঠিক বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন। সকলেই বলতে বলতে চলে গেল :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿آل عمران:١٤٤﴾

“মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল-ই। তার পূর্বেও অনেক রাসূল অতীত হয়ে গেছে। যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। আর যে ব্যক্তি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ বান্দাদের অতি সত্বর প্রতিদান দিবেন।”[২]

মঙ্গলবার দিন উমার রা. প্রথমে এবং পরে আবু বকর রা. ভাষণ প্রদান করেন। এর দ্বারাও মুসলিম উম্মাহ খুব উপকৃত হয়ে ছিল।

[১] সহীহ আল - বুখারী ১১৪১, ১৪২, ৩/১১৩, ৩৬৬৭, ৩৬৬৮, ৭/১৯, ৪৪৫২, ৪৪৫৩,৪৪৫৪, ৮/১৪৫

[২] সুরা আলে ইমরান : ১৪৪

আনাস বিন মালেক রা. বলেন, বনী সাকিফাতে আবু বকরের হাতে বায়আত গ্রহণ সমাপ্তির পরের দিন আবু বকর মিম্বারে উঠে বসলেন, উমার রা. খুতবা দিতে দাড়ালেন। তিনি আবু বকরের পূর্বে খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রসংশা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পড়লেন। অতঃপর বললেন, উপস্থিত জনগণ! আমি গতকাল একটি কথা বলে ছিলাম, যার ভিত্তি আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমাকে সে ব্যাপারে কোনো নিদের্শনা দেননি। তবে আমার ধারণা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিষয়টি চুরান্ত করে আমাদের পরেই ইন্তেকাল করবেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে তার কিতাব বিদ্যমান রেখেছেন। যদি তোমরা এর অনুসরণ কর, তবে তোমরাও সঠিক পথ পাবে। যেমন এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও সঠিক পথ পেয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের নেতৃত্বের বিষয়টি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করেছেন। যিনি ছিলেন সাউর গুহায় রাসূলের সাথি। তোমরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ কর। সাকিফাতে বায়আতের পর এখানে তার হাতে সকলে সাধারণভাবে বায়আত গ্রহণ করলো। অতঃপর আবু বকর রা. উঠে দাড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পড়ে বললেন, ‘উপস্থিত মানবমন্ডলী! আমাকে তোমাদের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি ভাল কাজ করি, তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি খারাপ কাজ করি, তোমরা আমাকে সোজা করে দেবে। সত্যবাদীতা হল আমানত, আর মিথ্যা হল খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দূর্বল, সে আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তার দূর্বলতা দূর করে দেব। তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী সে আমার নিকট দূর্বল, যতক্ষণ না আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তার থেকে অধিকার আদায় করে দেব। যে জাতি জিহাদ ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যে জাতি অশ্লীলতার প্রসার করবে, আল্লাহ তাদের মধ্যে বিপদ-মুসীবত ব্যাপক করে দিবেন। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এবং

তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আমি যদি আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাফরমানী করি, তাহলে তোমাদের দায়িত্বে আমার কোনো আনুগত্য নেই। তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুতি নাও। আল্লাহ সবার উপর রহম করুন।’ অতঃপর আবু বকর রা. এর খেলাফত চলতে থাকল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় নুবওয়ত প্রদান করা হয়েছে। তিনি মক্কায় তের বছর ছিলেন। তার কাছে অহী আসতো। তিনি মানব জাতিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাতেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে তিনি দশ বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে কাসীর রহ. বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে সর্বশেষ জোহরের নামাজ পড়েন, বৃহস্পতিবার। অতঃপর জুমাবার, শনিবার এবং রবিবার পূর্ণ তিন দিন সাহাবাদের থেকে অনুপস্থিত থাকেন। অবশেষে সোমবার দিন তিনি ইন্তেকাল করেন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর আবু বকর রা. বক্তব্য প্রদান করেন এবং লোকজন বনি সায়েদার সাকিফাতে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। সোমবারের অবশিষ্ট দিন এবং মঙ্গলবারের পুরো দিন মানুষ আবু বকরের হাতে বায়আত গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফন দাফন এর ব্যবস্থা করা হয়। কাপড়ের উপরেই তাকে গোসল দেয়া হয়। সাদা তিনটি কাপড় তাকে পরিধান করানো হয়। সেখানে জামা এবং পাগড়ী দেয়া হয়নি। কেউ তার জানাজার ইমামতি করেনি। সকলেই তার উপর একা একা নামাজ পড়েছে। প্রথমে পুরুষ, অতঃপর বাচ্চারা, অতঃপর নারী, অতঃপর গোলাম এবং বাদীগণ। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি সোমবার দিন ইন্তেকাল করেন এবং বৃহস্পতিবার তাকে দাফন করা হয়। লাহাদ পদ্ধতিতে তার কবর খনন করা হয়েছে। তার পাশে ইটের গাঁথুনি দেয়া হয়েছে। আধা হাত উচু এবং উটের চুটির ন্যায় করে দেয়া হয়েছে। আয়েশা রা. এর ঘরে,

মসজিদের পূর্ব পাশে এবং তার ঘরের পশ্চিম কোনায় তাকে দাফন করা হয়। ৮৬ হিজরিতে আব্দুল মালিক বিন অলীদ মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তখন মদীনার গর্ভনর ছিল উমার ইবনে আব্দুল আজীজ রহ.। তিনি তাকে মসজিদ সম্প্রসারণ করার নিদের্শ দেন। তিনি পূর্ব পাশসহ মসজিদ সম্প্রসারণ করেন, যার কারণে আয়েশা রা. এর ঘর- যার ভেতর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরও রয়েছে- মসজিদের মধ্যে পড়ে যায়।

এ পরিচ্ছেদের সারকথা ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. নবী এবং রাসূলগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তা সত্ত্বেও তারা মৃত্যবরণ করেছেন। কারণ, এ দুনিয়া কারো জন্য স্থায়ীত্বের স্থান নয়। দুনিয়ার সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, তার ভোগ বিলাস ধোকার বস্তু। আল্লাহর জন্য যা ব্যয় করা হয়, তা ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সব কিছুই ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন 'রাফিকে আলার জন্য' এর দ্বারা বুঝা যায়, নবী, রাসূল এবং নেককার লোকদের এ স্থানটি খুব মর্যাদার।

৩. মৃতের চোখ বন্ধ করে, দাড়ি বেধে দিয়ে, লাশ ঢেকে রাখতে হয়।

৪. মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করা। কারণ, এ দুআতে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। এ জন্যই আবু বকর বলেছেন, জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায় আপনি তাইয়্যেব (ভাল)।

৫. কোনো মুসলমান বিপদ-মুসীবতে পতিত হলে বলবে :

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها

৬. চোখের পানি এবং অন্তরের ব্যথা নির্গত করে কাঁদার বৈধতা।

৭. চিল্লা-চিৎকার করা, কাপড় চোপড় ছেড়া, বুক চাপড়ানো ইত্যাদি শরীয়তের অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ।

৮. মানুষ বড় হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে কিছু কিছু জিনিস ছুটে যাওয়া স্বাভাবিক। কখনো ভুল হতে পারে, কখনো সে ভুলে যেতে পারে।

৯. আবু বকর রা. এর ফজিলত, তার ইলম এবং জ্ঞানের ব্যাপকতা। তিনি খুব দৃঢ়চেতা কণ্ঠে বলেছেন, যে মুহাম্মদের ইবাদত করত, তার জানা উচিত মুহাম্মাদ মারা গেছে। যে আল্লাহর ইবাদত করে, তার জানা উচিত, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মারা যাবেন না।

১০. উমার রা. এর আদব, শিষ্টাচার এবং উত্তম চরিত্রের প্রমাণ। আবু বকরের খুতবার সময় তিনি বাধার সৃষ্টি করেননি। বরং অন্যান্য সাহাবাদের সাথে তিনিও বসে গেছেন খুতবা শুনতে।

১১. বনি সাকিফাতের বিতর্ক নিরসনে উমার রা. এর প্রজ্ঞা লক্ষণীয়। তিনি সর্ব প্রথম আবু বকর রা. এর হাতে বায়আত করেন। অতঃপর অন্যান্য লোক বায়আত শুরু করে। এভাবেই বিরোধের মিমাংসা হয়ে যায়। আল্লাহ সকল প্রশংসার মালিক।

১২. আবু বকর রা. এর ভাষা পাণ্ডিত্য। তিনি সাকিফাতে খুতবা দিয়েছেন। যার ব্যাপারে উমার রা. বলেছেন, সে কথা বলায় সকলের চাইতে বিশুদ্ধভাষী ছিল।

১৩. উমার রা. এর খুতবার দ্বারা মুনাফেকদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। অতঃপর আবু বকর রা. এর খুতবার দ্বারা আল্লাহ সত্য স্পষ্ট করে দিলেন।

১৪. আবু বকর রা. এর প্রগাড় রাজনৈতিক দূর-দর্শিতা প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন, সত্যবাদীতা হল আমানত, মিথ্যা হল খেয়ানত। দূর্বল তার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না তিনি তার অধিকার বুঝিয়ে দিবেন। শক্তিশালী তার নিকট দূর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে অধিকার বুঝে নিবেন। যে পর্যন্ত তিনি আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করবেন, সে পর্যন্ত তার অনুসরণের আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহর নাফরমানী এবং তার অবাধ্যতায় কোনো অনুসরণ করা যাবে না।

১৫. উমার রা. এর প্রজ্ঞা এবং তার আত্মিক ও বুৎপত্তিগত সাহস। তিনি আবু বকর রা. এর পূর্বে ভাষণ দিয়েছেন এবং তার গতকালের কথা প্রত্যাহার করেছেন, ভুল স্বীকার করেছেন। আবু বকর রা. এর অবস্থানকে মজবুত করেছেন। আরো বলেছেন, আবু বকর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একান্ত বন্ধু। সাউর গুহায় রাসূলুল্লার সঙ্গী ছিলেন।

১৬. কাফনের জন্য সাদা কাপড় মুস্তাহাব। তিন কাপড়ে কাফন দেয়া মুস্তাহাব, যাতে পাগড়ি কিংবা জামা থাকবে না। লাহাদ পদ্ধতি কবর খনন করা, তার উপর ইট বিছিয়ে দেয়া এবং উটের চুটির মত করে আধা হাতের ন্যায় উচু করা।